মহাপ্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর

সুধা সেন, এম. এ.

জিজ্ঞাসা
কলিকাতা-৯ ॥ কলিকাতা-২৯

[redacted] সংস্করণ : শ্রীগুরুপূর্ণিমা, ১৩৭২

প্রকাশক

শ্রী শ্রীশকুমার কুণ্ড

জি জ্ঞা সা

১এ ও ৩৩ কলেজ রো, কলিকাতা-৯

১৩৩এ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-২৯

মুদ্রাকর

শ্রীএককড়ি ভড়

নিউ শক্তি প্রেস

১০, রাজেন্দ্রনাথ সেন লেন, কলিকাতা-৬

পরম স্নেহের সন্তোষ,

শ্রীমন্মহাপ্রভুর পূত জীবন প্রণালী লিখিয়া বর্ণনা করিয়া তোমার হৃদয় যেমন আনন্দ ও শান্তি পাইয়াছে তেমনি পাঠকের হউক।

স্বামী বিশুদ্ধানন্দ

শিলং

১১।৪।৫৭ ইং

উৎসর্গ

রাধারসতরঙ্গিত শ্যামসুনীল সিন্ধুর গৌরতটপ্রান্তে তুমিই আমাকে লইয়া আসিয়াছিলে। সেই শুভ্র সৈকতে দুইজনে একই সঙ্গে মাথা ঠেকাইয়াছিলাম, লীলাতরঙ্গে অভিষিক্ত হইবার আশায়।

কিন্তু দেহ-মন প্রাণ অভিসিঞ্চিত, স্নিগ্ধ হইল না, অকস্মাৎ কাহার আহ্বানে তুমি কোথায় চলিয়া গেলে, কে জানে?

তোমার সহজ সুন্দর প্রেমে, গম্ভীর নীরব আত্মত্যাগে কেবল আমাকেই তুমি মেলিয়া ধরিতেছিলে, আর সেই ভালোবাসার অহঙ্কারে আমি তোমাকে মর্ত্যের সীমার বন্ধনে বাঁধিতে চাহিয়াছিলাম—তাই তোমাকে হারাইলাম।

আজ চোখের জলে আমার সেই অহঙ্কার ধুইয়া গিয়াছে—আর আমি তোমাকে হারাইব না।

আমি জানি, তুমি আছ শাশ্বত আনন্দলোকে, আমার জীবনের এই অপূর্ণ অর্ঘ্য তুমিই পূর্ণ করিয়া লইয়া প্রভুর চরণে নিবেদন করিও আর আমার দিবসান্তে আমাকেও ডাকিয়া লইও প্রভুর চরণপ্রান্তে।

সুধা

ভূমিকা

জয় জগদ্বন্ধু হরি

মানুষ নামক কতগুলি জীব আমরা। বাস করি ধরণীর পৃষ্ঠে। থাকিতে চাই সুখে স্বচ্ছন্দে। কিন্তু সুখ মিলে না। ঘুরি সুখের আশায়, শান্তির লালসায়। চাই স্বচ্ছন্দে থাকিতে, স্বকীয় ছন্দের তালে চলিতে; তাহা হয় না। নিজের তালে নিজের ছন্দে চলিতে পারি না। পদে পদেই আসে অন্যের বাধা।

সীমাই বাধা। সসীমতাই আবদ্ধতা। চৌদ্দপোয়া দেহটা সীমাবদ্ধ। ইন্দ্রিয়াধীন মনটা সীমাবদ্ধ। কর্মাধীন সংসারটা সীমাবদ্ধ। মায়াধীন জীবনটা সীমাবদ্ধ। তাই ছন্দপাত হয় প্রতি পদক্ষেপে। স্বচ্ছন্দে চলা হয় না। সসীমতার বাধা অনেক। ক্ষুদ্রতায় বিপত্তি বহু।

যে বস্তু সীমাহীন তাহাই পরম সুখস্বরূপ। যিনি অসীম, স্বকীয় ছন্দে তিনিই নৃত্যপর নিত্যকাল। যিনি স্বরাট্ যিনি স্বতন্ত্র, তিনিই ভূমা, তিনিই ভগবান্। আমাদের সকল কামনার তিনি কাম্য। সকল সাধনার তিনিই সাধ্য। এই সাধ্য বস্তুর সঙ্গে মিলিত হইতেই হইবে। না হওয়া পর্যন্ত গতাগতির বিরতি নাই।

একমাত্র পূর্ণতার প্রাপ্তিতেই জীবনে প্রশান্তি আসে। তাই বহু বাধাবিঘ্ন-সত্বেও ছাড়ে নাই মানুষ পূর্ণতাকে লাভ করিবার প্রচেষ্টা। কারণ, একমাত্র এই প্রচেষ্টাতেই জীবনের সার্থকতা।

কিন্তু, শুধু চেষ্টায় পূর্ণতা মিলিবার নয়। চেষ্টার পরিপূর্তি চাই কৃপায়। প্রচেষ্টার ইষ্টলাভ, প্রসাদে। জীবের প্রয়াসের সঙ্গে যদি না আসে ঈশ্বরের প্রসাদ, জীবের আগ্রহের সঙ্গে যদি না আসে ঈশ্বরের অনুগ্রহ, তবে পৌঁছিতে পারে না জীব সেই পরম সাধ্যবস্তুতে। জীবের সাধনা পূর্ণ হয় ভগবানের করুণায়। তপস্যায় মানুষ উঠে, কিন্তু পৌঁছিতে পারে না লক্ষ্যে। লক্ষ্য স্বয়ং নামিয়া আসেন অশেষ অনুকম্পায়। তখন মিলন ঘটে।

যাইতে পারে না ক্ষুদ্র জীব তাঁর কাছে। তাই নামিয়া আসেন ভূমা পুরুষ তার সান্নিধ্যে। করুণাঘন পূর্ণ-পুরুষ আসেন অপূর্ণ জগতের মধ্যে। অসীমের পূতস্পর্শে পবিত্র হয় সসীম ধরণী। ইহার নাম অবতার। পঙ্কিল জীবজগৎকে উজ্জ্বল করিতে করুণার ভাস্কর অবতরণ করেন। তাঁর ভাস্বরতায় নশ্বরতা প্রদীপ্ত হইয়া উঠে শাশ্বত মহিমায়।

ইহা এক অঘটন। তবু ঘটিয়াছে ইহা কয়েকবার। সেই সংবাদ পরিবেশন করিয়াছেন পুরাণ-শাস্ত্রকার। শ্রীরামচন্দ্ররূপে, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্ররূপে পুরাণ-পুরুষ আসিয়াছিলেন শঙ্কিত জীবগণকে শান্তির সন্ধান দিতে, পূর্ণতার আদর্শ দেখাইয়া শিখাইয়া অপূর্ণকে স্বর্গীয় আলোকে প্রোজ্জ্বল করিতে। মানুষের সমাজ ও জীবন সমৃদ্ধতর হইয়াছিল তাঁহাদের অবতরণে। ধন্য হইয়াছিল তাঁহাদেব প্রচারণে ও মহা-বিতরণে।

সেই সব পুরাণের কথা যেন পুরাতন হইয়া গিয়াছিল। অবিশ্বাসের মেঘ জীবেব অন্তরাকাশে ঘনায়িত হইয়াছিল। ক্ষুদ্র সংকীর্ণতার রাজ্যবিস্তারে মানুষ হইতে মনুষ্যত্ব দূরে চলিয়া গিয়াছিল। একজন পূর্ণ পুরুষের মহা-প্রকাশের জন্য সমগ্র মানবসমাজ আকুলি-বিকুলি করিতেছিল। সকলের বেদনা বুকে লইয়া সকলেব অশ্রুধারা সুরধুনীতে ঢালিয়াছিলেন শান্তিপুরের একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ। ব্যথাহত মানবসংহতির নিদারুণ আকুতি আকর্ষণ করিয়াছিল প্রেমপুরুষোত্তমকে নবদ্বীপেব বিদ্যাচর্চার প্রাঙ্গণতলে। অপূর্ণ জীবের সকল প্রয়াস সার্থক হইয়াছিল তাঁহার অমিত প্রসাদে। কৃপার প্লাবনে তিনি ডুবাইয়াছিলেন বিশ্বমানবকে তথা বাংলাব নরনারীকে।

'বাঙ্গালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া' ; সকলের অন্তর-নিঙড়ানো আর্তির মূর্তি প্রকট হইয়াছিল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে। ভূমা আসিয়াছিলেন ভূমিকে কৃতার্থ করিতে। গোলোকের পূর্ণতা অবতরণ করিয়াছিল মর্ত্যের অপূর্ণতাকে আলিঙ্গন করিতে। অমৃতময় আসিয়াছিলেন মৃত্যু-ঘেরা জীবনিবহকে পরামৃতের সন্ধান দিতে। হইয়াছিল অসীমে-সসীমে মাখামাখি, নবদ্বীপের রাজপথে। যাহা হয় নাই কখনও।

বিশ্বমানবকে উদাত্তকণ্ঠে আহ্বান করিয়া বলিবার মত এ এক কাহিনী বটে। ছন্দহীন ছন্নছাড়া মানবকুলের মধ্যে আনন্দ-লাল নন্দদুলাল ছন্দদুলাল হইয়া মনোহর নৃত্যছন্দে নাচিয়া গিয়াছেন। আজ প্রায় পাঁচশত বৎসর ধরিয়া সেই মহানর্তকের নটনলীলার কাহিনী কত সুধী সাধুসজ্জন গাহিয়াছেন। যাঁর যেমন সামর্থ্য, বলিয়াছেন। কত কথা বলা হইয়াছে। কত অ-বলা আছে। যতটুকু বলা হইয়াছে তাহাও অন্তর দিয়া বুঝা হয় নাই। যেটুকু বুঝা হইয়াছে তাহাও জীবন দিয়া গ্রহণ করা হয় নাই। তাঁহাকে গ্রহণ করিলে আমাদের সকল সন্তাপ দূর হইয়া যাইত।

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুসুন্দর লিখিয়াছেন—

"জয় নবদ্বীপ
ভারতপ্রদীপ।"

ভারতের তথা সমগ্র বিশ্বের প্রদীপ জ্বলিয়াছিল নবদ্বীপে। সেই দীপটিকে তুলিয়া ধরিতে আমরা পারি নাই। আজ মানবতার নিদারুণ লাঞ্ছনার দিনে নদীয়ার অপ্রাকৃত প্রেম-প্রদীপটির প্রয়োজন সর্বাপেক্ষা সমধিক। ভক্তিরূপ স্নেহসম্পদ যাহাদের প্রচুর, ঐ রসবর্তিকা তুলিয়া ধরিবার অধিকার তাহাদেরই হস্তে ন্যস্ত।

এই গ্রন্থে আছে সেই প্রেমঘন বিগ্রহের অকৈতব কাহিনী, অনবদ্য ভাষায়।

লেখিকা কুমিল্লার সুধা সেন। তাঁহাকে চিনি। অনেকেই চিনেন। ঘরের বধূ, সন্তানের জননী, স্কুলের শিক্ষয়িত্রী, সমাজসেবিকা, সুধাকণ্ঠী গায়িকা; সবচেয়ে বড় পরিচয় গৌরপ্রেমে প্রাণগলা। উচ্চশিক্ষা সার্থক হইয়াছে নদীয়ার মানব-দরদীকে ভালবাসিয়া।

গৌরপ্রীতিতে নয়নের নূতন দৃষ্টি খুলিয়াছে। লেখনীতে নবীনতা আসিয়াছে। ভাষায় সরসতা ফুটিয়াছে। প্রাণস্পর্শ করিবার মত দক্ষতা দেখা দিয়াছে। এক অভিনব দৃষ্টিভঙ্গিতে ব্যক্ত হইয়াছে সর্বপূর্ণতার প্রতিমূর্তি নদীয়া-বিনোদিয়ার রূপ-গুণ-লীলা-মাধুর্যের সংবাদ।

এতদিন 'উদ্বোধনের' পাঠকেরা নিবন্ধাকারে পাঠ করিয়াছেন। আজ গ্রন্থাকারে সকলে পাইয়া উদ্বুদ্ধ হউন। অপূর্ণ জীব, অন্ধ সমাজ নদীয়ার আলোতে নবীন প্রেরণা লাভ করুক। আমি জীবাধম এ গ্রন্থ পাঠে মুগ্ধ হইয়াছি। ঐ সুধালেখনী হইতে আরও কত পাব এই আশায় লোলুপ দৃষ্টি পাতিয়া রহিয়াছি। জয় গৌর হরি। জয় জগদ্বন্ধু হরি।

শ্রীমহানামব্রত ব্রহ্মচারী
[ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, এম. এ
পিএইচ. ডি. (সিকাগো), ডি. লিট.]

নিবেদন

করুণাঘন গৌরসুন্দরের করুণা ও আমার পরমারাধ্যতম গুরুদেব নিত্যপদাশ্রিত শ্রীমৎ শ্যামসুন্দরানন্দ অবধূত মহারাজের কৃপার ভরসায় আজ 'মহাপ্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর' প্রকাশ করিতে সাহসী হইলাম।

জীবনে বৈষ্ণব ভাবধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ ঘটে নাই: শুধু বৈষ্ণব-সাহিত্য পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছি, শ্রবণ-মন সেই পদাবলীর রস ও ধ্বনি-মাধুর্যে সিক্ত হইয়াছে, কিন্তু অপূর্ব সেই বিরহ-মিলনের কোনও চিত্র দর্শন করিবার সৌভাগ্য তো হয় নাই! অনর্পিত, উন্নত, উজ্জ্বল ব্রজরস অর্পণ করিবার জন্য করুণায় যিনি এই ধুলার ধরণীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন তাঁহার দুই রাতুল শীতল চরণের চিহ্নে তো মাথা ঠেকাইতে পারি নাই! মহাপ্রভুর অগাধ অতল লীলাসিন্ধুরই বা কতটুকু দর্শন করিলাম, স্পর্শ তো দূরের কথা?

গ্রন্থের বহু ত্রুটি, বহু বিচ্যুতি রহিল, আমার অজ্ঞানতা-জনিত ত্রুটি ও মুদ্রাকর-প্রমাদ, বহু চেষ্টা সত্ত্বেও কিছু রহিয়া গেল। কি করিব? আমি অক্ষম, নিরুপায়। তাই ভক্তগণের চরণে ক্ষমা প্রার্থনা করা ছাড়া আমার আর কোনও পথ নাই।

জ্ঞান নাই, ভক্তি নাই, প্রেম নাই, অনির্দিষ্ট, বিভ্রান্ত জীবন। তবে, শৈশবে ও কৈশোরে আমাদের সত্যনিষ্ঠ, আদর্শনিষ্ঠ পিতামাতার ধ্যানগম্ভীর জীবন হইতে হয়ত বা অলক্ষ্যেই পাইয়াছি শাশ্বত শান্তির কিছুটা আভাস, সত্য-শিব-সুন্দরের কিছু বা ইঙ্গিত!

কিন্তু তারপরে কয়েকটি বৎসর কাটিয়াছে এক দুঃসহ যন্ত্রণা ও সংকটের মধ্যে। ভারাক্রান্ত, ব্যাধিগ্রস্ত দেহ-মন লইয়া মৃত্যুর দিন গণিয়াছি। তারপরে সত্যই যেদিন মৃত্যু শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইল, সেইদিন কাহার করুণায় কেমন করিয়া বাঁচিয়া উঠিলাম তাহা বলিবার ক্ষমতা আমার নাই। অযাচিত কৃপা লাভ করিলাম গৌররসসিক্ত ভক্ত 'বিধুদা'র কাছ হইতে এবং তাঁহার অনুগ্রহেই সংযোগ ঘটিল কুমিল্লার গৌরভক্তগোষ্ঠীর সঙ্গে।

রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের অধ্যক্ষ (তৎকালীন সহাধ্যক্ষ) মহারাজ বিশুদ্ধানন্দজীর অহৈতুকী স্নেহ ও আশীর্বাদ মৃত্যুপথযাত্রিণীর জীবনে মৃত্যুঞ্জয়ী পরশ বুলাইয়া গেল—নবজীবনে লাভ হইল নবতর আনন্দ!

'মহাপ্রভুর নীলাচলে' গম্ভীরায় তিনিই পাঠাইলেন, সঙ্গে গেলেন স্বামী। আজ তাঁহারা কেহই এই পৃথিবীতে নাই, কিন্তু আনন্দ-অমৃতলোক হইতে মহারাজের আশীর্বাদ নিশ্চিতই ঝরিয়া পড়িতেছে আমাদের মাথায়। গ্রন্থের আরম্ভেই আছে তাঁহার আশীর্বাদ।

'মহাপ্রভুর নীলাচল' অধ্যায়টিই গ্রন্থের সূচনা। নীলাচল দর্শনের পরেই ইহা লেখা, অন্যান্য সমস্ত অধ্যায়ই পরে লিখিত। 'উদ্বোধনে' এই লেখাটি প্রথমে প্রকাশিত হয়, আজ কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইল।

যাঁহার সাহচর্য, বৈদগ্ধ্য, রসগ্রাহিতা আমাকে গভীর প্রেরণা দিতেছিল, কয়েকটি অধ্যায় প্রকাশিত হওয়ার পর হইতেই যিনি ভবিষ্যৎ গ্রন্থের একটি মনোরম চিত্র পরিকল্পনা করিতেছিলেন, তিনি অকস্মাৎ পৃথিবী হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন আমার নাগালের বাহিরে। যাঁহার শিক্ষা ও আদর্শ জীবনের চরমতম বেদনাকে অতিক্রম করিয়া পরমতম প্রেয়ের দিকে পরিচালিত হইবার প্রেরণা দিতেছিল, আমাদের সেই ঋষিতুল্য পিতাও, এই গ্রন্থ যখন যন্ত্রস্থ তখন ইহলোক ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন অমৃতধামে।

আমি আজ একা ; কিছুই জানি না, কিছুই বুঝি না, তবুও অগ্রসর হইলাম। অর্ঘ্য রচিত হইল, কিন্তু পূর্ণ আহুতি দিতে পারিলাম না।

পরমভাগবত, পরমরসবেত্তা, দেশবরেণ্য পণ্ডিত ডক্টর মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজী কৃপা করিয়া ভূমিকা লিখিয়া দিয়া এই গ্রন্থের কতখানি যে মূল্য দিয়াছেন তাহা বিদগ্ধ ভক্তমাত্রেই অনুধাবন করিবেন, আমি আর কি বলিব ? তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা জানাইবার ভাষা বা সাধ্য আমার নাই। শুধু ভূমিকা নহে, তাঁহার ভাষণে, তাঁহার রচনায়, তাঁহার সান্নিধ্য হইতে কত যে সঞ্চয় হইয়াছে জীবনে তাহা তিনি জানেন না, জানি আমি। স্নেহ, করুণা—কিছুই তাঁহার কাছ হইতে আমার অপ্রাপ্য নহে।

পরম শ্রদ্ধেয়, পণ্ডিতপ্রবর, ভক্ত শ্রীযুক্ত রাসমোহন চক্রবর্তী মহাশয় এই গ্রন্থের অধিকাংশ অধ্যায়ই দেখিয়াছেন এবং যখনই কোনও সমস্যায় পড়িয়াছি, তাঁহার অব্যাহত নিরলস জ্ঞানসাধনার মধ্যেও প্রসন্ন মুখে তিনি সমস্ত সমস্যার সমাধান করিয়া দিয়াছেন।

বৈষ্ণবশিরোমণি শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ মহাশয়ের সম্পাদিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থই আমার মতো অনধিকারীর প্রধান পথনির্দেশক। প্রত্যক্ষ ভাবেও তাঁহার কাছ হইতে অনেক নির্দেশ পাইয়াছি। আমার স্বামী তাঁহার ছাত্র এবং পরে তাঁহার

সহকর্মিরূপে দীর্ঘকাল একই কলেজে অধ্যাপনা করিয়াছেন, সেই সূত্রে আমিও তাঁহার স্নেহের পাত্রী।

আমি ইঁহাদের সকলেরই কন্যাতুল্য। তাই কৃতজ্ঞতা নয়, সকলকেই জানাই আমার প্রণাম ও অন্তরের অকুণ্ঠ ভক্তি।

শ্রীমৎ বিশুদ্ধানন্দজীর কৃপাতেই 'উদ্বোধনে'র মতো বিখ্যাত মাসিক পত্রিকায় আমার মত অখ্যাত লেখিকারও স্থান মিলিয়াছে, গ্রন্থের অধিকাংশ অধ্যায়ই উদ্বোধনে প্রকাশিত হইয়াছে, স্বামী শ্রদ্ধানন্দ মহারাজ ও স্বামী নিরাময়ানন্দ মহারাজের অনুপ্রেরণা ও সহানুভূতিও আমাকে কম উদ্বুদ্ধ করে নাই। তাঁহাদের প্রণাম জানাই। 'উজ্জীবন' ও 'দেবযান' পত্রিকায়ও বিভিন্ন অধ্যায় প্রকাশিত হইয়াছে। উভয় পত্রিকার সম্পাদকই (শ্রীশ্রীসীতারাম দাস ওঙ্কারনাথ ও শ্রীযতীন্দ্ররামানুজ দাস) পরম সাধক, পরম পূজ্য, তাঁহাদেরও প্রণাম জানাই।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও সমালোচক শ্রীমান নারায়ণ চৌধুরীর সহায়তা না পাইলে 'জিজ্ঞাসা'র মতো প্রকাশক এবং ব্রাহ্মমিশন প্রেসের মাধ্যমে এই গ্রন্থ প্রকাশ করা আমার সাধ্য হইত না। 'জিজ্ঞাসা' প্রকাশনের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত শ্রীশকুমার কুণ্ড মহাশয় শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি, তাঁহার আন্তরিক সহায়তার জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ ও শ্রদ্ধা জানাইতেছি। প্রুফ দেখার কাজে তাঁহাদের সাহায্য না পাইলে আমার পক্ষে অগ্রসর হওয়া কঠিন হইত।

শ্রীমান্ নারায়ণ চৌধুরী আমার অনুজপ্রতিম। তিনিও প্রুফ দেখিয়া দিয়া তাঁহার অমূল্য সময় অনেক নষ্ট করিয়াছেন। তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাইবার সম্পর্ক আমার নয়। তাঁহার জন্য রহিল আমার প্রীতি ও শুভকামনা।

যাঁহারা আমার প্রত্যেকটি লেখা পড়িয়া শুনিয়া এবং সমালোচনা করিয়া আমাকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করিয়াছেন—কুমিল্লা মহিলা-সমিতির সেইসমস্ত সভ্যা এবং অন্যান্য অনুরাগী ভক্ত বন্ধুগণকে জানাই শুভেচ্ছা।

আমার কয়েকটি ছাত্রী, বিশেষতঃ শ্রীমতী অণিমা লেখাগুলির নকল করিতে গিয়া যে নিষ্ঠা ও ধৈর্যের পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে আনন্দিত হইয়াছি। তাঁহাদের জানাইতেছি আশীর্বাদ।

সর্বশেষে আমার কনিষ্ঠ সহোদর মেজর এস. কে. দেব ও সুপ্রিয়, সুনন্দা প্রভৃতি ঘনিষ্ঠতমগণ যাহারাই অকুণ্ঠচিত্তে গ্রন্থ-প্রকাশে সহায়তা করিয়াছে, সকলের জন্যই রহিল আমার ভালোবাসা ও শুভকামনা।

বিভিন্ন পত্রিকায় বিভিন্ন সময়ে লেখাগুলি বাহির হইয়াছে, সেইজন্যই দুই-একটি ঘটনা প্রাসঙ্গিকভাবে পুনরুক্ত হইয়াছে। অধ্যায়ের অঙ্গহানি আশঙ্কায় ইহার অন্যথা করা গেল না। পাঠকপাঠিকার কাছে এইজন্য মার্জনা চাহিতেছি।

মহাপ্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর এবং 'হইয়াছেন ও হইবেন যত গৌরভক্তবৃন্দ', সকলের চরণে প্রণতি জানাইয়া আমার নিবেদন শেষ করিলাম।

'তোমার নিত্যদাস মুঞি, তোমা পাসরিয়া,
পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হৈয়া।
কৃপা করি কর মোরে, পদধূলি-সম,
তোমার সেবক, করো তোমার সেবন।'

সুধা সেন

"অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে
মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদালোককাতরং
দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥"

"অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥"

অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে

মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।

হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং

দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্‌॥

শ্রীকৃষ্ণবিরহে কাতরা শ্রীমতী রাধিকা বৃন্দাবনের বনে বনে কাঁদিয়া ফিরিতেছেন—হে দীনদয়ার্দ্র নাথ, হে মথুরানাথ! কবে আমি তোমার দর্শন পাইব প্রভু! হে দয়িত! তোমার দর্শন বিনা যে হৃদয় আমার অধীর হইয়া পড়িতেছে, ওগো আমি কি করিব বলো?

দীর্ঘকাল পরে বিরহিনী ব্রজ-বধূর সে ক্রন্দন ধ্বনিত হইয়াছিল শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর বক্ষে; অন্তিমের ব্যাকুল আর্তনাদে এই শ্লোক উচ্চারণ করিতে করিতেই পুরীগোস্বামী তাঁহার প্রিয়তমের উদ্দেশ্যে মহাপ্রয়াণ করিয়াছিলেন।

এই শ্লোক কহিয়াছে রাধাঠাকুরাণী।

তাঁর কৃপায় স্ফুরিয়াছে মাধবেন্দ্র-বাণী॥

কিবা গৌরচন্দ্র ইহা করে আস্বাদন।

ইহা আস্বাদিতে আর নাহি চৌঠজন॥

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীতে যে প্রেম অঙ্কুরিত হইয়াছিল মহাপ্রভুতে তাহারই মূর্ত প্রকাশ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সেই প্রেমেরই ভাবঘন বিগ্রহ।

শ্রীগৌরাঙ্গ শুধু এই শ্লোক আস্বাদনই করেন নাই। রাধিকার যে এই কৃষ্ণবিরহ, জীবের যে এই ভগবৎবিরহব্যথার কান্না, ইহাই তাঁহার জীবনের মূল সুর—ইহাই তাঁহার জীবন।

শ্রীরাধিকা আর কৃষ্ণ, ভক্ত আর ভগবান। দুইয়ে মিলিয়াই প্রেম, দুইয়ে মিলিয়াই পূর্ণতা। একজনের বাঁশীর সুর ডাকিয়া ফিরে 'আয়, আয়'; আর একজন সেই বাঁশীর সুরে পাগল হইয়া পথ খোঁজে, সেই চিরন্তন খোঁজার সমাপ্তি ঘটে বৃন্দাবনের কুঞ্জে; সেই রসের নিমজ্জন হয় রাসনৃত্যে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য এই রাধাকৃষ্ণের মিলিতবিগ্রহ, ভক্ত-ভগবানের আলিঙ্গন।

কিন্তু এই অমূর্ত প্রকাশ ধরা দিত শুধু অন্তরঙ্গ দুই-চারিজন ভক্তের চোখে, গম্ভীরার গোপন প্রকোষ্ঠে হইত এই প্রেমের রসাস্বাদন।

সাধারণ বহিরঙ্গ জন ও স্থাবর-জঙ্গমের জন্য ছিল নামসঙ্কীর্তন—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

কলিতে হরিনাম ছাড়া জীবের গতি নাই, গতি নাই, গতি নাই। বাস্তবিকই কলিহত দুর্বল, জীবের গতি নাই, গতি ছিল না—তাই স্বয়ং নামরূপী ভগবান নিজে নাম করিয়া নামের রসে জগৎকে ডুবাইয়া গেলেন।

আবির্ভাব ও বাল্যলীলা

১৪০৭ শকের ফাল্গুনী পূর্ণিমার স্নিগ্ধোজ্জ্বল জ্যোৎস্নাধারায় অবগাহন করিয়া সকলের চিত্ত যখন শুচিস্নাত, পবিত্র হইয়া উঠিল, চন্দ্রগ্রহণের উপলক্ষে যখন লক্ষ রসনায় হরিনাম ধ্বনিত হইয়া উঠিল এবং সেই ধ্বনি গিরি, নদী, বনে-উপবনে প্রতিধ্বনিত হইয়া গম্‌গম্ করিয়া উঠিল, সেই শুভক্ষণে নবদ্বীপে দরিদ্র শ্রীজগন্নাথ মিশ্র ও শচীদেবীর গৃহে পরমপুরুষ আবির্ভূত হইলেন।

মাতা শচীর বক্ষ দুলিয়া উঠিল—অপলক নেত্রে চাহিয়া রহিলেন নয়নরঞ্জন লাবণ্যঘন গৌরশিশুর মুখের দিকে, আর চাহিয়া রহিলেন মহাবৈষ্ণব শ্রীঅদ্বৈতাচার্য। গোলোক হইতে যাঁহাকে আহ্বান করিয়া এই ধরাধামে আবির্ভূত করাইবেন, এই কি সেই? হৃদয়-মন কাড়িয়া লয় দিগম্বর গৌর শিশুটি, কে সে?

শচীর কোল হইতে একে একে আটটি কন্যা মৃত্যুর কোলে চলিয়া যাওয়ার পর জন্মগ্রহণ করিলেন বিশ্বরূপ। কিন্তু সংসার বা মাতা শচী শতবাহু মেলিয়াও তাঁহাকে আকর্ষণ করিতে পারিলেন না,—ষোড়শবর্ষীয় সুন্দর কিশোর ব্রহ্ম-বিদ্যারসে মগ্ন হইয়া রহিলেন।

সমগ্র নবদ্বীপ যখন অসার পাণ্ডিত্যগর্বে স্ফীত উদ্ধত হইয়া উঠিয়াছে, তখন অদ্বৈত-সভায় মুষ্টিমেয় কয়েকজন ভক্তমাত্র একত্রিত হন—গোপনে কাঁদিয়া কাঁদিয়া কৃষ্ণকে ডাকেন, 'জগতে ভক্তি নাই, ওগো বৃন্দাবনধন, তুমি আসিয়া জগতে তোমার ভক্তি বিলাও।' শ্রীঅদ্বৈত হুঙ্কার করিয়া বলেন, 'তাঁহাকে আনিব আমি, জগতে তাঁহাকে অবতীর্ণ হইতে হইবে।'

বিশ্বরূপ দিবসের অধিকাংশ সময় এই সভাতেই অতিবাহিত করেন। দ্বিপ্রহর বহিয়া যায়—বিশ্বরূপের গৃহ মনে পড়ে না। মাতা বালক নিমাইকে পাঠাইয়া দেন, 'যাও তো বাবা, দাদাকে ডাকিয়া আনো।'

আনন্দোজ্জ্বল স্মিতমুখে ধূলায় ধূসর দিগম্বর গৌর আসিয়া দাদার হাত ধরে। অদ্বৈত চাহিয়া থাকেন শিশুর দিকে—'আমার চিত্ত সবলে কাড়িয়া লয়—এই শিশু কে!'

নিমাই বলে, 'ঘরে চলো দাদা, আহারের সময় হইয়াছে।' আত্মভোলা বিশ্বরূপের বক্ষে জাগে বাৎসল্যের দোলা, ধুলা ঝাড়িয়া ভাইকে কোলে লন।

মধ্যাহ্নের রৌদ্রতপ্ত পথ দিয়া গৃহের পানে চলিয়াছেন দুটি ভাই—ছোট্ট নরম মুঠিখানি হাতে ধরিয়া বিশ্বরূপ বলেন, 'নিমাই, তুমি সারাদিন দুষ্টামি কর, স্নানের ঘাটে লোককে বিরক্ত কর, লোকে কত কথা বলে। আমি বলি—তাই কি হয়, নিমাই আমার কত লক্ষ্মী ছেলে, সে তো দুষ্টামি করিতে পারে না।'

অভিমানে রাঙ্গা ওষ্ঠাধার দুইটি ফুলিয়া ওঠে, নয়নে আসে অশ্রু, বলে ছোট ভাই, 'দেখ তো দাদা, আমি কিছুই করি না তবুও লোকে আমারই খালি দোষ দেয়।' দুইটি কমলনয়ন হইতে অশ্রু ঝরিয়া পড়ে। দাদা তাড়াতাড়ি মুখচুম্বন করিয়া ভাইকে বক্ষে তুলিয়া লন।

'লেখাপড়া করিস নিমাই, খুব ভালো হয়ে চলিস, মা বাবার সেবা করিস; আমার তো আর কিছুই হোল না', বলেন বিশ্বরূপ। নিমাইয়ের ছোট বুকখানিতে বিস্ময় জাগে—দাদা এই সমস্ত বড় বড় কথা আমাকে বলেন কেন? আমি তো শুধু কোলে কোলে থাকিব—মা-বাবার সেবা করার কথা আমি কি জানি!

গৃহ বেশী দূর নয়। পৌঁছিতে কতক্ষণই বা লাগে। দ্বারে আসিয়া বিশ্বরূপ ডাকেন, 'কই গো মা! আসিয়া ভাত দাও।' দুই ভাই পাশাপাশিই বসেন, সম্মুখে অন্নের থালা ধরিয়া দিয়া জননী বিশ্বরূপের দিকে পরম স্নেহে তাকাইয়া থাকেন; সে-দেখায় যেন তৃপ্তি হয় না। কতক্ষণই বা গৃহে থাকে সুন্দর, কিশোর পুত্র তাঁহার; জ্ঞান-পাগল এখনই তো আবার চলিয়া যাইবে অদ্বৈত-গৃহে।

দাদার সঙ্গে অনর্গল কথা কহিতেছে নিমাই, লক্ষ্মী ছেলের মতো কথা। মা একটুখানি মুখ টিপিয়া হাসিয়া বলিলেন, 'এখন তো নিমাই বড়ো লক্ষ্মী, বড়ো ভালো, কিন্তু ইহাকে লইয়া আর তো আমি পারি না। নিমাই গঙ্গার ঘাটে স্নানে যায়, আর ফিরিবার নাম করে না; বৃদ্ধ, ব্রাহ্মণ, তপস্বী কাহাকেও রেহাই দেয় না, সকলকে জ্বালাতন করে, আর তাঁহারা আসিয়া নালিশ করেন আমাদের কাছে।'

নিমাইয়ের মুখ লাল হইয়া উঠিতেছে, ক্রোধে ভয়ে লজ্জায় রক্তবিম্বাধর ফুলিয়া উঠিতেছে, মুখখানি নত হইয়া গিয়াছে—দাদার কাছে এইসব বলা! আড় নয়ন-দুইটি একবার বজ্রসম্ভাবনা লইয়া চকিত চমকের মতো মায়ের মুখের উপর দিয়া

খেলিয়া গেল—'আচ্ছা দেখাই যাইবে এই বিশ্বাসঘাতিকা মায়ের আজ কি দশা হয়। এই মুহূর্তেই কি সব শেষ ?' মাতা মনে মনে হাসিয়া মৌন হইলেন।

বিশ্বরূপ আবার আদর করেন ভাইকে। 'না গো না, নিমাই আর এমন কাজ করিবে না।'

স্নানের ঘাটে অত্যাচার তো নানারকমের—ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত, সকাম পূজার্থীর উপরেই বেশী। এর গায়ে জল ছিটানো, তার বস্ত্র একে দেওয়া, কোশাকুশি ফেলিয়া দেওয়া, নৈবেদ্য লইয়া পলায়ন, সে সব তো আছেই—আজ কিন্তু দৌরাত্ম্য সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছিল।

সহ্য করিতে না পারিয়া অভিযোগকারিণীরা তাই দল বাঁধিয়া আসিয়াছে শচীমায়ের কাছে, নবদ্বীপের বালিকাগণ। বলে, 'গায়ে জল ছিটায়, কেশে কেশে বাঁধিয়া রাখে, ঘন কেশজালের মধ্যে ওক্ড়ার বীচি ফেলিয়া দেয়—আমরা কিছু বলি না, কিন্তু তাই বলিয়া পূজার নৈবেদ্যও কাড়িয়া খাইবে মা! না দিলে আবার অভিশাপ দেয়।'

শচী-মাতা বিস্মিতা ও ক্রুদ্ধা হইলেন। আসামী অনুপস্থিত, তাই জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি অভিশাপ দেয় মা ?'

ক্ষুদ্র বালিকার দল কলরব করিয়া উঠিল, 'নৈবেদ্য না দিলে কি বলে জানো মা ? বলে—বুড়া ভর্তা হইবে আর চার-চার সতিনী।' ক্ষুদ্র বালিকার ক্ষুদ্রতম বক্ষেও বৃদ্ধ স্বামী আর সতীনের আশঙ্কা জাগে। মাতা বলিয়া উঠেন, 'ষাট্ ষাট্ তাই কি হয় গা ? ঐ পাগলের কথার কোন মানে আছে মা ? আমি আশীর্বাদ করি, রাঙা টুকটুকে বর হোক তোমাদের।'

বালিকার দল হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচে। কিন্তু একটির মুখে এখনও হাসি ফোটে নাই, চোখে অপমানের অশ্রু-ছায়া। মা কাছে গেলেন—মাথায় গায়ে হাত বুলাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কি তাহার অভিযোগ। অভিযোগ সামান্য নয়, প্রতিকার করিতেই হইবে, এই অপমানের কথা বলিতে গিয়া লজ্জাও হয়। কিন্তু না—এই কি লজ্জার সময় ? মেয়েটি কাঁদিয়া ফেলিল—বলিল, 'তোমার নিমাই মোরে চাহে বিভা করিবারে।' বিবাহ করিতে চাহে তাঁহার নিমাই! এখনই ? বিবাহযোগ্য পাত্রই বটে! মাতার বক্ষ হইতে হাস্যধারা ফোয়ারার মতো বাহির হইয়া আসিতে চায়, কিন্তু বাদিনীর সম্মুখে সে হাসি নিরুদ্ধ করিতেই হয়। অভিমানিনীকে কাছে টানিয়া আনিলেন মা, আশ্বাস দিলেন তাহাকে—এই দুর্ঘটনা কিছুতেই ঘটিতে দিবেন না।

কিশোর বিশ্বরূপ চলিয়াছেন বিশ্বের পানে, গৃহের সঙ্কীর্ণ সীমার টান ত্যাগ করিয়া। গৃহ তাঁহাকে কঠোর বন্ধনে বন্দী করিতে চাহিয়াছিল, পিতা বিবাহের ব্যবস্থা করিতেছেন শুনিয়াই বিশ্বরূপ গোপনে গৃহত্যাগ করিলেন।

নবদ্বীপের আকাশে সূর্যালোকিত প্রভাত উদিত হইল, কিন্তু জগন্নাথ আর শচী দেখিলেন তাঁহাদের গৃহ ঘনান্ধকারে আবৃত, আলো নাই। মূর্ছিতা শচীর পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন শোকাহত মিশ্র জগন্নাথ, বলিলেন, 'আশীর্বাদ কর তোমার বিশ্বরূপ যেন ব্রতভঙ্গ করিয়া, সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়া গৃহে ফিরিয়া না আসে, সন্ন্যাসধর্ম যেন অক্ষুণ্ণ থাকে।'

কিন্তু শচী মা,—তাঁহার অন্তর মাতৃধর্ম ছাড়া অপর কোনও ধর্মকে জানে না, অজস্রধারায় অশ্রু বহিয়া পড়িতে লাগিল গৃহতলে।

বালক নিমাই দেখিল দাদা নাই, যে দাদা তাহার সকলের চেয়ে প্রিয়, সকলের চেয়ে সুন্দর, মধুর। নিমাই দাদার শোকে একান্ত অধীর হইয়া পড়িল। জননী আপনাকে সংযত করিয়া জীবনের একমাত্র অবলম্বন নিমাইকে ক্রোড়ে তুলিয়া লইলেন।

মিশ্র বলিলেন, 'পড়িয়া শুনিয়া বিশ্বরূপ বুঝিয়াছিল জগৎ মিথ্যা ; তাই নিমাইয়ের আর পড়িয়া কাজ নাই।' 'মূর্খ হইয়া ঘরে মোর থাকুক নিমাঞি।' নিমাইয়ের পাঠ বন্ধ হইল। নবতর দৌরাত্ম্যও বাড়িতে লাগিল দিন দিন। শচীর পাগল হওয়ার উপক্রম।

একদিন অশুচিস্থানে 'বর্জ্য' হাঁড়ির উপর বসিয়া আছে নিমাই। দূর হইতে দেখিয়াই মাতা ছুটিয়া আসিলেন। বলিলেন, 'ব্রাহ্মণের ছেলে হইয়া তুই কি জানিস না এইসব অশুচি ছুঁইতে নাই? শীগগির নামিয়া আয়, স্নান করিয়া শুচি হ।'

বালক নিমাই প্রবীণ জ্ঞানীর মতো বলিয়া উঠিল, 'শুচি-অশুচি আবার কি? আমি তো সবই এক দেখি, সর্বত্র আমার এক অদ্বিতীয় জ্ঞান।' মাতা পলকবিহীন বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিলেন পুত্রের দিকে, 'কে এই বালক? ও কি আমার?' চোখের উপর শঙ্কার ছায়া ঘনাইয়া আসিল।

'না না,—ও যে আমার—আমারই।' মুহূর্তে ঐশ্বর্যের মোহ কাটিয়া গেল, বাৎসল্যে ভরিয়া উঠিল হৃদয়—'পাগল ছেলে, কোথায় বা শুনিয়াছে তাই বুঝি মনে রাখিয়াছে গাঁথিয়া, নবদ্বীপে পণ্ডিতের অভাব আছে নাকি কিছু?'

জননী আবার তাড়া দিলেন, হাসিতে হাসিতে দুরন্ত নিমাই নামিয়া আসিল, শুচিস্নাত হইয়া বসিল মায়ের কোলে। ঘুমে দুই চোখ ভারী হইয়া আসিয়াছে—

তাহারই ঘনপল্লবের ফাঁকে ফাঁকে বুঝি উঁকি দিতেছেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ! নিমাইয়ের দৌরাত্ম্য বাড়িয়াই চলিল, পড়াশুনা নাই, মায়ের ভৎ´সনায় বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নাই ! আবার একদিন গিয়া বসিল সেই অশুচি 'বর্জ্য' হাঁড়ির উপরে। ক্রুদ্ধা মাতা আবার ডাকিলেন—'তোর কি শুচি-অশুচি, ভদ্রাভদ্র কোনও জ্ঞানই নাই নিমাই ?'

নিমাই এতটুকু বিচলিত হইল না, বলিল, 'লেখাপড়া শিখি নাই—কি শুচি আর কি অশুচি আমি জানিব কেমন করিয়া ?' মায়ের কাছ হইতে পুনরায় পাঠের প্রতিশ্রুতি আদায় করিয়া উচ্ছিষ্ট-স্থান হইতে নিমাই উঠিয়া আসিল। মিশ্রও অগত্যা রাজী হইলেন। নিমাইয়ের পাঠ পূর্ণোদ্যমে চলিতে লাগিল, চাঞ্চল্যও ক্রমে শান্ত হইয়া আসিল।

মিশ্র জগন্নাথের অন্তিমকাল উপস্থিত। গঙ্গাতীরে দেহত্যাগ করিতেছেন পরম সৌভাগ্যবান ঈশ্বরপিতা, ঐশ্বর্য-জ্ঞান যাঁহাকে পিতৃধর্ম হইতে বিন্দুমাত্র বিচ্যুত করিতে পারে নাই। গৃহ ভরিয়া বালগোপালের পদচিহ্ন-দর্শন, পুত্রেব চরণে অদৃশ্যনূপুর-ধ্বনি, পুত্রেব দেহে ভগবৎপ্রকাশ—কতো অলৌকিক, অসম্ভব ঘটনা মিশ্র চোখে দেখিয়াছেন, তথাপি পুত্রকে ঈশ্বরজ্ঞানে স্তুতি করেন নাই একদিনও, অধিকন্তু পাঠে অমনোযোগিতা বা চাঞ্চল্যের জন্য ভৎ´সনা, এমনকি, প্রহারও করিয়াছেন।

যেদিন প্রহার করিলেন সেই রাত্রে স্বপ্নে তাঁহাব সম্মুখে এক ব্রাহ্মণ আসিয়া বলিলেন, 'জগন্নাথ ! তুমি নির্বোধ, জান না আজ কাহার অঙ্গে প্রহার করিয়াছ, তোমার পুত্র সামান্য মনুষ্য মাত্র নয় ! মিশ্র বলিলেন, 'পুত্র যে হোক সে হোক আমি জানি না, আমি পিতা তাই পিতৃধর্মই আমি পালন করিয়াছি, পুত্র নারায়ণ হোক না কেন, তবুও আমাব কর্তব্য আমি পালন করিবই।' ব্রাহ্মণ পরাভূত হইয়া অন্তর্ধান করিলেন।

হরেকৃষ্ণ-নাম জপ করিতে করিতে এবং স্বয়ং নামরূপী নরবিগ্রহ, পুত্ররূপী নিমাইয়ের মুখের দিকে অপলক নেত্রে চাহিয়াই মিশ্র দেহত্যাগ করিলেন। নিমাইয়ের কাছে, ভবিষ্যৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কাছে একটি মিনতি শুধু রাখিয়া গেলেন —'আমাকে ভুলিস না নিমাই।'

জগন্নাথ মহাপ্রয়াণ করিলেন। মাতা-পুত্রের ক্রন্দনে বাতাস ভারী হইয়া উঠিল—পাষাণ গলিল। অবশেষে পুত্রের আর্তি দর্শনে মাতাই ক্রমে শান্ত হইয়া উঠিলেন।

কৈশোর ও যৌবন-লীলা

পিতৃহীন দরিদ্র অসহায় বালকের হাত ধরিয়া মাতা শচী পণ্ডিতমণ্ডলীর দ্বারে উপস্থিত হইলেন—নিমাইয়ের ভার যেন তাঁহারা গ্রহণ করেন। পণ্ডিতমণ্ডলী বলিলেন, 'কোনও চিন্তা নাই মা আপনার, আমাদের সমস্ত বিদ্যা ইহার মতো প্রতিভাবান শিষ্যকে অর্পণ করিয়া আমরাই ধন্য হইব।'

নিমাই বিদ্যারসে মগ্ন হইল। পুঁথি আর শাস্ত্রের আলোচনায় দিবস-রাত্রির কতো প্রহর যে উত্তীর্ণ হইয়া যায় তাহার আর হিসাব থাকে না।

বালক কিশোর হইল, কিশোর হইলেন তরুণ। অপূর্ব রূপলাবণ্যের প্রভার সঙ্গে আসিয়া মিশ্রিত হইল বিদ্যার প্রতিভা। নবদ্বীপের পথ ধরিয়া যখন এই অপূর্ব সুন্দর জ্ঞানদীপ্ত তরুণ চলিতে থাকেন তখন নগরীর নয়ন তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইয়া থাকে।

মুখে প্রসন্ন-সুন্দর হাস্য, তাহার সঙ্গে আছে খানিকটা বিদ্যার ঔদ্ধত্যের আভা, পশ্চাতে শত পড়ুয়া। গঙ্গার ঘাটে-পথে যেখানেই অপর পড়ুয়া দেখেন তাঁহাকেই ন্যায়ের ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিয়া বিব্রত করিয়া তোলেন, কিন্তু প্রবীণ পণ্ডিতেরাও অব্যাহতি পান না।

আক্রোশটি যেন প্রবীণ বৈদ্য মুরারি গুপ্তের উপরেই অধিক। প্রবীণ হইলেও মুরারি গুপ্ত নিমাইয়ের সঙ্গে একই টোলে অধ্যয়ন করেন, কিন্তু কোনও দিন ভুলক্রমেও নিমাইয়ের কাছ হইতে কোন পাঠ বুঝিয়া নেন না—নিমাই পণ্ডিতের ক্রোধ সেইখানেই। মুরারি গুপ্ত মহাশয়কে দেখিয়া প্রায়ই বলিতে থাকেন—

> …বৈদ্য তুমি ইহা কেনে পড় ?
> লতাপাতা নিয়া গিয়া রোগী কর দড়।
> ব্যাকরণ-শাস্ত্র এই বিষম অবধি ;
> কফ পিত্ত অজীর্ণ ব্যবস্থা নাই ইথি।

গুপ্ত চুপ করিয়াই থাকেন। ইহাও নিমাইয়ের সহ্য হয় না। অবশেষে গুপ্তের সহ্যের সীমা ছাড়াইল ; একদিন বলিলেন, 'সকলের সঙ্গে তর্ক করিয়া তোমার গর্ব কিছু অধিক বর্ধিত হইয়াছে, নিমাই পণ্ডিত! আমাকে প্রশ্ন করিয়া আগে পরাজিত কর, শেষে গর্ব করিও।'

আরম্ভ হইল দুই অসমবয়সী পণ্ডিতের মধ্যে প্রশ্ন, উত্তর, সংশয়-নিরসন। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তর্কজাল বিস্তৃত হইয়াই চলিল। কেহ কাহাকেও পরাজিত করিতে পারিলেন না। নিমাইপণ্ডিত পরম শ্রদ্ধায় আলিঙ্গন করিলেন মুরারিকে। মুরারির অঙ্গ সুশীতল হইয়া গেল। শুধু মুরারিই নয়—শ্রীবাস, মুকুন্দ কাহারও অব্যাহতি নাই এই গর্বিতের কাছ হইতে।

শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীবাস নিমাইয়ের দিকে দূর হইতে মুগ্ধদৃষ্টিতে তাকাইয়া থাকেন; এমন সৌন্দর্য, এমন পাণ্ডিত্য কৃষ্ণ-ভক্তিবিহীন হইয়া বৃথাই নষ্ট হইতে চলিল। শ্রীবাস এই দুঃখ আর ধারণ করিতে না পারিয়া একদিন পথে নিমাইকে বলিলেন, 'কোথায় চলিয়াছ উদ্ধতের শিরোমণি? বৃথা পাণ্ডিত্যের অহংকারে মত্ত না হইয়া একটু কৃষ্ণ-ভক্তির চর্চা কর না?'

প্রগল্ভ হাসি হাসিয়া নিমাই বলিলেন, 'কৃষ্ণভক্তির কথা আমাকে তুমি কি বুঝাও শ্রীবাসঠাকুর! দেখিও এমন বৈষ্ণব আমি হইব যে অজ ভবও আসিয়া আমার কাছে ভক্তি শিক্ষা করিবেন।'

অর্বাচীন তরুণের বাক্‌বিলাস-শ্রবণে দ্বিতীয় কথাটি না কহিয়া শ্রীবাস চলিয়া গেলেন।

শ্রীহট্টের লোক যদি পথে দেখেন তবে নিমাইয়ের বিদ্রূপ সীমা ছাড়ায়, তাঁহাদের অনুকরণে শ্রীহট্টের ভাষায় কথা বলিতে থাকেন। শ্রীহট্টিয়াগণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন, স্বদেশীয় সহজ ভাষায় বলেন, 'হয় হয় হয়। তুমি কোন্ দেশি তাহা কহ ত নিশ্চয়! বলি ওহে, তোমার পিতা-মাতা কাহার না জন্মস্থান শ্রীহট্টে··· ?' বস্তুতঃ প্রভুর পিতৃপুরুষের জন্মস্থান শ্রীহট্টেরই ঢাকা-দক্ষিণ গ্রামে*—মিশ্র জগন্নাথই আসিয়া বাস করেন নবদ্বীপে। কিন্তু নিমাইয়ের তাহাতে বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই, নদীয়া শান্তিপুরের ভাষায় মিষ্ট সুরটুকু সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়াছেন, তাই স্বদেশীয়গণের ভাষা লইয়া বিদ্রূপ করেন অক্লেশে। শেষপর্যন্ত শ্রীহট্টিয়াগণ যখন 'লগুড় লইয়া খেদারিয়া' যাইতেন তখন বিদ্যুদ্বেগে স্থানত্যাগ করিতেন নিমাই।

নবদ্বীপের এক গ্রামে দরিদ্র ব্রাহ্মণ শ্রীধর থোড়-কলা বিক্রয়লব্ধ সামান্য অর্থ লইয়াই সন্তুষ্ট। এক-কথার মানুষ, জিনিসের দাম যাহা নির্দিষ্ট করিয়া দেন, কোনও মতে তাহার একচুল ব্যতিক্রম হইবার উপায় নাই। তাঁহার বেসাতির দাম কম, কিন্তু কথার দাম বেশী। কিন্তু দর যাচাই করিয়া লওয়া ভগবানের

* মহাপ্রভুর পিতৃপুরুষ প্রথমতঃ শ্রীহট্টের বুড়িঙ্গা গ্রামে ছিলেন—পরে ঢাকা-দক্ষিণ আসেন।

স্বভাব। নিমাই দরদস্তুর করেন, শ্রীধর কুপিত হন। নিমাই বলেন, 'তোমার ঘরে পোঁতা কতো ধন, তাহা তো আমি এখন চাই না, এই সামান্য জিনিস কেন কম মূল্যে আমাকে দিবে না?' শ্রীধর নিমাইয়ের হাত হইতে কলা-মূলা টানিয়া আনেন, জানেন না তাঁহারই পায়ে আপনাকে উজাড় করিয়া দিবেন একদিন। অবশেষে রফা হয়। সুন্দর চঞ্চল মুখখানির দিকে চাহিয়া শ্রীধরের হৃদয় দ্রব হয়, বলেন, 'বিনামূল্যে প্রতিদিন একখণ্ড থো'ড়-খোলা পাইবে তুমি, তবুও দোহাই তোমার কাড়াকাড়ি, দরাদরি করিও না।'

নিমাই ঋণ করিলেন—বিনামূল্যের ধন লইয়া বহুমূল্য দিবেন বলিয়া।

তরুণ নিমাই যুবক হইলেন, চাঞ্চল্য অনেক কমিল। গঙ্গার ঘাটে একদিন শ্রীবল্লভাচার্যের কন্যা লক্ষ্মীকে দেখিলেন। মনে হইল যেন যুগান্তরের চেনা। লক্ষ্মীও চাহিলেন প্রভুর দিকে—দুইটি হৃদয়ে জাগিল আনন্দের ছোঁওয়া।

স্নানান্তে পথ বাহিয়া চলিয়াছেন নিমাই। পথে ঘটক বনমালী বিপ্রের সঙ্গে দেখা, বিষণ্ণ মুখে বিপ্র চলিয়াছেন। নিমাই কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বিপ্র বলিলেন, 'আজ শ্রীমতী লক্ষ্মীর সঙ্গে তোমার বিবাহের প্রস্তাব করিয়া বড়ো আশায় জননী শচীদেবীর কাছে গেলাম, কিন্তু আমার আশায় জলাঞ্জলি। মাতা বলিলেন, মানুষ হোক নিমাই; আগে তো বাঁচুক, পরে বিবাহের কথা।'

উৎফুল্লমুখে গৃহে আসিলেন নিমাই, মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বনমালী আচার্যকে কি বলিয়াছ মা? তাঁহাকে বড় বিষণ্ণ যেন দেখিলাম।

পুত্রের ইঙ্গিত বুঝিতে কল্যাণময়ী মাতার এতটুকু দেরী হইল না—পরদিনই বিবাহসম্বন্ধ স্থির হইয়া গেল।

পিতৃহীন দরিদ্র নিমাইয়ের বিবাহ-বাসর বর-কন্যার রূপের প্রভায় ঝলমল করিতে লাগিল। আনন্দের অশ্রু মুছিয়া লক্ষ্মীকে দেবদুর্লভ বরের হস্তে সম্প্রদান করিলেন বল্লভাচার্য। শচীমাতা লক্ষ্মী-নারায়ণকে আপন অঙ্কে ধারণ করিয়া ধন্যা হইলেন।

বিবাহের কিছুদিন পরে দেবী লক্ষ্মীর হস্তে গৃহ ও মাতৃসেবার ভার অর্পণ করিয়া পণ্ডিত বিশ্বম্ভর পূর্ববঙ্গে আসিলেন। দ্বাপরে যমুনার ও কলিতে গঙ্গার সৌভাগ্যবার্তা শুনিয়া অবধি পদ্মার চিত্ত গভীর দুঃখে আলোড়িত হইতেছিল—পরমপুরুষের পদরজ কি আমি কোনও দিন বক্ষে ধারণ করিতে পাইব না?

বিশ্বম্ভর পূর্ববঙ্গে আসিয়াছেন। দলে দলে ছাত্ররা পণ্ডিতের কাছে পাঠ নিতে আসিল। বলিল, 'আমাদের ভাগ্যে যদি এই পাণ্ডব-বর্জিত দেশে আপনার

আগমন হইয়াছে, তবে আমরা আপনাকে ছাড়িয়া দিব না। আপনার টীকা-টিপ্পনীই আমরা পড়ি।

উদ্দেশে আমরা সব তোমার টিপ্পনী,
লই পড়ি পড়াই শুনহ দ্বিজমণি।

প্রভু, আপনার খ্যাতি এ দেশেও আসিয়া পৌঁছিয়াছে, আপনি দয়া করিয়া আমাদিগকে শিষ্যের অধিকার দিন।'

অল্পদিনেই অনেক শিষ্য পাণ্ডিত্য ও উপাধিলাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইলেন। পূর্ববঙ্গের ভাগ্যের সীমা রহিল না। শুধু বিদ্যা নয়, ভক্তিরসও পূর্ববঙ্গেই প্রথম প্রবাহিত করিয়া গেলেন গৌরহরি, তখনও নবদ্বীপ তাঁহাকে চিনিতে পারে নাই। কিছুকাল পূর্ববঙ্গে থাকার পর প্রভু নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তনের জন্য উদ্যোগী হইলেন। একদিন তপন মিশ্র নামক এক ভক্ত ব্রাহ্মণ আসিয়া প্রভুর চরণে পতিত হইলেন। ব্রাহ্মণ সর্বদাই গভীর ভক্তির সঙ্গে ইষ্টনাম জপ করেন, কিন্তু মন ভরে না। সাধ্যসাধন-তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লইবেন এমন কেহ নাই। বিপ্র অস্থির-চিত্তে কালযাপন করিতেছেন, অকস্মাৎ স্বপ্নে দেখিলেন এক দেবসদৃশ ব্রাহ্মণ আসিয়া তপন মিশ্রকে বলিতেছেন, 'সাধ্যসাধন-তত্ত্ব শিক্ষা করিতে হইলে নিমাই পণ্ডিতের কাছে যাও, তিনি সাধারণ মনুষ্য মাত্র নহেন, তিনি নর-নারায়ণ।'

প্রভুর নবদ্বীপ যাত্রার প্রাক্কালে মিশ্র আসিয়া দেখেন এই সেই নিমাই পণ্ডিত স্বপ্নদৃষ্ট পরম মনোহর নর-নারায়ণ।

প্রভু বলিলেন, 'ব্রাহ্মণ! কৃষ্ণভজনের জন্য তোমার চিত্ত উন্মুখ হইয়াছে, ইহা অতি শুভ লক্ষণ। কয়জনের ভাগ্যে ইহা ঘটে? তুমি যুগধর্ম পালন কর। কলিযুগে নাম-যজ্ঞই সার। দিবা-রাত্র সর্ব-অবস্থায় নাম গ্রহণ কর, নামই তোমার চিত্তে সাধ্যসাধন-তত্ত্ব ও ইষ্টস্ফূর্তি করাইবেন।' নবদ্বীপের বিদ্যা-দীপ্ত উদ্ধত নিমাই পণ্ডিত পূর্ববাংলায় আসিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভূমিকার এক খণ্ডাংশ প্রকাশ করিয়া গেলেন—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরের এই মহামন্ত্র লাভ করিয়া মিশ্র আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইলেন। প্রভুর পদতলে পড়িয়া তপন মিশ্র তাঁহার সঙ্গে গমনের প্রার্থনা ব্যক্ত করিলেন। প্রভু বলিলেন, 'না, তুমি বারাণসী যাও, সেখানেই তোমার সঙ্গে আমার মিলন হইবে।'

সত্যই মিলন হইয়াছিল দশবৎসর পরে। বারাণসীর গঙ্গার ঘাটে তপন মিশ্র স্নান করিতেছেন—বৃন্দাবনের পথে সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আসিয়া সেই ঘাটেই দাঁড়াইলেন। স্বর্ণোজ্জ্বল সেই বরকান্তি, অরুণ-রাঙা বহির্বাসে মাত্র কটিদেশ আবৃত, মাথায় নাই সেই ভুবনমোহন চাঁচর কেশদাম, মুখে নাই পাণ্ডিত্যের এতটুকু ছায়া, দুই পদ্মপলাশনয়নে আছে শুধু কৃষ্ণবিরহের অশ্রু,—তবু তপন মিশ্র চিনিলেন সেই দশ বৎসর পূর্বের দেখা ইষ্টকে।

নবদ্বীপ যাত্রার সময় আসন্ন। অশ্রুমতী পদ্মার তীরে অশ্রুভাবাক্রান্ত হৃদয়ে প্রণত সহস্র শিষ্য ও দর্শনার্থী। পদ্মার বক্ষে সজ্জিত তরণী, শিষ্যগণ-প্রদত্ত রজত সুবর্ণ প্রভৃতি বহুবিধ উপহারে পূর্ণ। প্রভু নবদ্বীপ যাত্রা করিলেন। দীর্ঘকাল প্রবাসান্তে প্রভু নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিলেন। রাশি রাশি উপহারসহ পুত্র মাতার চরণে প্রণত হইলেন; কিন্তু শচী মাতা কেন নিবিড় বিহ্বল আলিঙ্গনে পুত্রকে হৃদয়ে ধারণ করিলেন না? নিমাই দেখিলেন মাতা যেন কষ্টে উদ্গত অশ্রু গোপন করিতেছেন। ব্যাকুল নিমাই জননীর হাত দুইটি ধরিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হইয়াছে মাগো? তোমার মুখ কেন মলিন?'

মাতা চরম সংবাদ শুনাইলেন, 'লক্ষ্মী নাই, প্রভুর বিরহ-সর্পের দংশনে গৃহলক্ষ্মী শচীর গৃহত্যাগ করিয়া অমৃতলোকে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন।

নিমাইয়ের উজ্জ্বল মুখ নিমেষে ম্লান হইয়া গেল। চোখে আসিল অশ্রু, মৌন গভীর ব্যথায় মূক হইয়া রহিলেন কতক্ষণ! শচীর এতদিনের নিরুদ্ধ শোকাবেগ বহু স্রোতোধারায় উৎসারিত হইল, শেষে নিমাই-ই শান্ত করিলেন মাতাকে।

আবার বিদ্যারসে মগ্ন হইলেন বিশ্বম্ভর। শূন্য গৃহতলে হাহাকার করিয়া বৃদ্ধা জননী শচীদেবীর দিন কাটিতে লাগিল। পুত্রকে পুনরায় বিবাহ করাইয়া সংসারী করিবার গোপন অভিলাষটি ব্যক্ত করিতেও যেন সাহস পান না।

পুত্র মায়ের ব্যথা বুঝিলেন। স্বামী নাই, আটটি কন্যা নাই, নিষ্ঠুর বিশ্বরূপ নাই, পুত্র অবশেষে বিবাহে সম্মতি দিলেন।

এবার গৃহে আসিলেন দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, ধনী রাজ-পণ্ডিত সনাতন মিশ্রের কন্যা। গঙ্গার ঘাটে কত বালিকাই তো স্নান করিতে আসে; কিন্তু কিশোরী লজ্জাবনতমুখী বিষ্ণুপ্রিয়া কেন শচীর হৃদয় আকর্ষণ করে, শচী তাহা বুঝিতে পারেন না। লক্ষ্মী মেয়েটি কাছে আসিয়া দাঁড়ায়, ভক্তিনম্র একটি প্রণাম রাখিয়া যায় শচীর পায়ে, শচী মাথায় হাত দিয়া আশীর্বাদ করেন। মনের কোণে একটি গোপন অভিলাষও উঁকি দেয়।

মাতা নিমাইয়ের সম্মতি না লইয়াই কাশীনাথ পণ্ডিতকে দিয়া আপন অভিলাষটি সনাতন পণ্ডিতকে জানাইলেন। পণ্ডিত অতি আনন্দের সহিত এমন দুর্লভ পাত্রের হস্তে কন্যাদান করিতে সম্মত হইলেন।

বিবাহের সজ্জা ও আয়োজনে সনাতন পণ্ডিত ও তাঁহার স্ত্রী মাতিয়া আছেন, কাল অধিবাস হইবে ; এমন সময় তাঁহাদের পরিচিত গণকঠাকুর আসিয়া বলিলেন, 'পথে এইমাত্র আমার নিমাই পণ্ডিতের সঙ্গে দেখা, আনন্দ করিয়া সুখবরটি বলিলাম, কি পণ্ডিত! তোমার তো কাল বিবাহের অধিবাস! নিমাই পণ্ডিত যেন আকাশ হইতে পড়িলেন, 'বিবাহ? কাহার? কে বর, কে কন্যা? কই আমি তো কিছুই জানি না।' কাজেই গণক মন্তব্য করিলেন, 'এ বিবাহে নিমাইয়ের ইচ্ছা নাই বলিয়াই মনে হইল।'

সনাতন পণ্ডিতের গৃহে বিষাদের ছায়া ঘনাইয়া আসিল, মঙ্গল অধিবাসের সজ্জায় সজ্জিতা চন্দনচর্চিতা বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখখানিও ম্লান হইয়া গেল। মাতা রোদন সম্বরণ করিয়া পণ্ডিত সনাতনকে প্রবোধ দিলেন, 'বিশ্বম্ভর স্বতন্ত্র, স্বেচ্ছাময় ; তিনি যদি স্বেচ্ছায় তোমার কন্যাকে গ্রহণ না করেন তবে তুমি দুঃখ করিয়া কি করিবে?'

নিমাইয়ের কানে এই খবর পৌঁছাইতে দেরী হইল না, তিনি লজ্জিত হইলেন, নিছক কৌতুকের কথাটিতে যে এইরূপ দুঃখকর পরিণাম হইবে তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। গোপনে একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুকে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন, 'তুমি সনাতন পণ্ডিতের গৃহে যাও, আমার নাম করিও না যেন, বলিও, মাতা যাহা স্থির করিয়াছেন তাহাতে নিমাইয়ের আপত্তির কোনও কথাই থাকিতে পারে না।'

মিশ্রগৃহে আবার আনন্দের সাড়া পড়িল। শ্রীমুকুন্দ, সঞ্জয় ও বুদ্ধিমন্ত খান এইবার বিবাহের সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করিলেন। বিবাহটি যাহাতে 'বামনাই' না হইয়া রাজপুত্রজনোচিত হয় বুদ্ধিমন্ত খান সেই ব্যবস্থাই করিলেন। উজ্জ্বল-দীপালোকিত বিবাহ-বাসরে রত্ন-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত মনোহর বর-বধূ দর্শনে সমগ্র নবদ্বীপবাসী আনন্দ-সাগরে ভাসিল।

কুশণ্ডিকা, সপ্তপদী গমন, শুভদৃষ্টি সমাপ্ত হইল। গাঁটছড়া-বাঁধা বরের সঙ্গে বধূ চলিলেন বাসর-গৃহের দিকে। অবগুণ্ঠিতা কিশোরী বধূর চকিত মুগ্ধ নয়ন-দুইটি ভুবনমোহন নয়নরঞ্জন স্বামীর মুখে লগ্ন হইতে চায়। চোখে আসে আনন্দের অশ্রু—'পরমসুন্দর তরুণ, ইনি আমার বর! এই বিরাট বিশ্বতলে ইনি কেবলই আমার?' গর্বে, আনন্দে, সৌভাগ্যে বিষ্ণুপ্রিয়ার ক্ষুদ্র বক্ষখানি ভরিয়া উঠে।

বাসর-যাত্রার প্রথম পদক্ষেপ করিলেন বর-বধূ, অমনি হঠাৎ হোঁচট খাইয়া বিষ্ণুপ্রিয়া অস্ফুট আর্তধ্বনি করিয়া উঠিলেন, ক্ষণমাত্র পূর্বের আনন্দানুভূতি মুহূর্তে আশঙ্কায় পরিণত হইল। শুভযাত্রার পথে বাধা কেন? বিষ্ণুপ্রিয়া কম্পিতা হইলেন। নূতন বরের কানে সেই ক্ষীণ আর্তধ্বনি প্রবেশ করিল. সকলের অলক্ষ্যে বর একটুখানি গোপনস্পর্শ রাখিলেন বিষ্ণুপ্রিয়ার পায়ে। সেই পরম স্পর্শ-শিহরিতা পুলকিতা ও আতঙ্কে কম্পিতা বধূটিকে জানাইয়া দিল 'ওরে ভীরু, আমিই তো আছি, ভয় কি?

বধূ চকিতনেত্রে একবার চাহিয়া দেখিলেন সেই স্নেহকোমল প্রশান্তসুন্দর মুখের দিকে, কিন্তু তবুও বক্ষের কম্পন গেল না।

হায়। দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, তোমার দীর্ঘ জীবনের চলার পথ যে কুসুমাস্তীর্ণ হইবে না, কঠিন বৈরাগ্যের অশ্রুধারার পিচ্ছিল পথেই যে তোমার যাত্রা, যাঁহার দুই অভয় বলিষ্ঠ করে দুইটি কোমল করতলের সঙ্গে আপন কিশোর হৃদয়খানি পরম নির্ভরতায় সঁপিয়া দিয়াছিলে সেই ক্ষণকাল আগেমাত্র পাওয়া পরম প্রিয় পরম আপনাকেই যে চরম পর করিয়া নিঃশেষ বিলাইয়া দিতে হইবে, তাহা কি তখনই বুঝিয়াছিলে, মা?

মাতা শচীর আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়াছে—তাঁহার গৃহে আসিয়াছে আনন্দরূপিণী বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া। গৃহদেবতার সেবার কাজ, শচীর গৃহ ও গৃহপ্রাঙ্গণ সুন্দর শুচিশুভ্র হইয়া উঠিল—শ্বশ্রূর সকল কাজের ভার হাতে লইলেন বিষ্ণুপ্রিয়া।

পুত্রের মুখে আনন্দের আভাস দেখিয়া জননীর হৃদয় মধুময় হইয়া উঠিল জননীর হৃদয় বুঝিয়া মাঝে মাঝে বধূকে লইয়া কৌতুকও করেন গৌর।

একদিন আহারে বসিয়াছেন গৌর, দ্বারের বাহিরে দু-চারিজন অন্তরঙ্গ। মাতা বলিলেন, 'কাল রাত্রে অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখিলাম—আমার গৃহদেবতা যেন দুইটি সুন্দর ছেলে হইয়া আমার নিবেদিত ভোগ গ্রহণ করিতেছেন—সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বলরাম।

গৌর বলিলেন, খুব ভাল স্বপ্ন দেখিয়াছ, মা। সত্যই তোমার গৃহদেবতা জাগ্রত। তুমি কাহাকেও বলিও না, জান মা, আমিও যখন ভোগ নিবেদন করিয়া বাহিরে আসি, প্রায়ই গিয়া দেখি অর্ধেক নৈবেদ্য যেন কে ভোজন করিয়া গিয়াছে। দ্বারান্তরালবর্তিনীর দিকে একবার কটাক্ষে চাহিয়া গৌর বলিলেন, 'আমার মনে হইত, তোমার বধূরই বুঝি ঐ কাজ। লজ্জায় এতদিন কাহাকেও বলি নাই আজ বুঝিলাম বধূ তো নয়, গৃহদেবতাই অন্ন গ্রহণ করেন।'

অন্তরাল হইতে কিশোরী বধূ তৃষিত নয়নে চাহিয়া ছিলেন সুদুর্লভ সুন্দর স্বামীর মুখের দিকে। স্বামীর এই কথা শুনিয়া লজ্জায় তাঁহার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, তবুও বক্ষ ভরিয়া উঠিল সুধারসে।

কিছুকাল হইতে নবদ্বীপে নিমাই পণ্ডিত নিজেই একটি টোল খুলিয়া বসিয়াছেন। তাঁহার অধ্যাপনার যশঃসৌরভ নবদ্বীপ অতিক্রম করিয়া বহুদূর বিস্তৃত হইল, দূরদেশ হইতেও বহু ছাত্র এই নবীন অধ্যাপকের টোলে পড়িতে আসিলেন। খ্যাতি আরও সুদূরপ্রসারী হইল, যখন নিমাই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত কেশব কাশ্মীরীকে পরাজিত করিলেন।

এক জ্যোৎস্নার রজতশুভ্র-ধারাস্নাত রজনীতে গঙ্গাতীরে সশিষ্য নিমাই পণ্ডিত বসিয়া আছেন, এমন সময় অভ্রংলিহ দাম্ভিকতা লইয়া দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আসিলেন, অবজ্ঞাভরে বলিলেন, 'নিমাই পণ্ডিত, শিশুশাস্ত্র ব্যাকরণ পড়াইয়া তোমার খুব নাম হইয়াছে, আজ তো শিষ্যগণের সঙ্গে তোমার সংলাপ শুনিলাম।'

সসম্ভ্রমে নিমাই বলিলেন, 'হায়, কোথায় আপনি সর্বশাস্ত্রবিশারদ পরমপ্রবীণ পণ্ডিতোত্তম, আর কোথায় বালক আমি। যেমন আমার অধ্যাপনা তেমনই আমার শিষ্যগণ। আমিও বুঝি না কি পড়াই, তাহারাও বুঝে না কি পড়ে।' নিমাই দিগ্বিজয়ীকে গঙ্গার মাহাত্ম্যসূচক একটি স্তব রচনা করিয়া শুনাইবার জন্য মিনতি জানাইলেন। খুশী হইলেন দিগ্বিজয়ী—গর্বভরে তৎক্ষণাৎ ঝঞ্ঝাবাতের মতো শত শ্লোক রচনা করিয়া বলিয়া যাইতে লাগিলেন। শিষ্যগণ বিস্মিত হইল, প্রভুও সহর্ষে বলিয়া উঠিলেন, 'সাধু! সাধু! এইরূপ কবিত্বশক্তি মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়।'

বিনীত নম্রসুরে প্রভু একটি শ্লোকের অর্থ শুনাইবার জন্য কেশব কাশ্মীরীকে অনুরোধ জানাইলেন। পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোন্ শ্লোকের অর্থ করিব বলো!' সঙ্গে সঙ্গেই নিমাই দিগ্বিজয়ীর রচিত শ্লোকগুলির মধ্য হইতে একটি শ্লোক নির্বাচিত করিলেন। এবার বিস্মিত হইবার পালা পণ্ডিতের—'সে কি, এত দ্রুত-উচ্চারিত শত শ্লোকের মধ্যে তুমি কেমন করিয়া এই শ্লোক মনে রাখিলে?' প্রভু বলিলেন, 'ইহাতে আমার কোনো গুণই নাই—দেবতার প্রসাদেই আমি শ্রুতিধর হইয়াছি। দেবতার আশীর্বাদে আপনি যেমন স্মৃতিধর আমিও তেমনি শ্রুতিধর।'

দিগ্বিজয়ী শ্লোকের অর্থ বিচার করিতে আরম্ভ করিলে, নিমাই আবার বিনীতভাবে এই শ্লোকের দোষগুণ শুনিতে চাহিলেন। ব্যাকরণী বালকের স্পর্ধায় দিগ্বিজয়ী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, 'ইহা ব্যাকরণশাস্ত্র নয়, ইহা অনেক উচ্চস্তরের অলঙ্কারশাস্ত্র, তুমি যাহা পড় নাই তাহার কি বুঝিবে?' নিমাই বলিলেন, 'সত্যই

আমি অলঙ্কারশাস্ত্র পড়ি নাই, কিন্তু পণ্ডিতের মুখে যাহা শুনিয়াছি তাহাতে আমার কাছেই ইহার কিছু দোষ ধরা পড়িয়াছে।' বিরুদ্ধমতি, ভগ্নক্রম, পুনরুক্তবদাভাস প্রভৃতি অলঙ্কারশাস্ত্র-বিরুদ্ধ বহু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভ্রম দেখাইতে লাগিলেন নিমাই। বলিলেন, 'শ্লোকে আছে একটি শব্দ, ভবানী-ভর্তৃ—ভবানী শিবের পত্নী, তাঁহার ভর্তা বলিলে বুঝায় যেন শিবপত্নীর দ্বিতীয় ভর্তা—ইহা শ্রুতিকটু; শ্রী আর লক্ষ্মী এক শব্দ—শ্রী-ই তো লক্ষ্মী, তবে আবার লক্ষ্মী কেন? ইহা পুনরুক্তি।—

তৎপরে আছে—'বিষ্ণুপদকমলে গঙ্গার জন্ম'. ইহা তো বিরোধাভাস—গঙ্গাতেই কমলের জন্ম হয়—কমলে গঙ্গার জন্ম অসম্ভব।' অনুপ্রাস প্রভৃতি অলঙ্কারেরও অনেক ত্রুটি দেখাইলেন নিমাই।* দিগ্বিজয়ী স্তব্ধ হইয়া গেলেন—মানুষের পক্ষে এইরূপ গভীর জ্ঞান কি সম্ভব?

সরস্বতীর প্রসাদ-লালিত পণ্ডিত অভিমানে সরস্বতীকে আহ্বান করিলেন—'কেন মা আমার প্রতি আজ অপ্রসন্না হইলে?' রাত্রে স্বপ্নে দেখিলেন পণ্ডিত—শ্বেতবসনা ব্রহ্মবিদ্যারূপিণী সরস্বতী আবির্ভূতা হইয়া বলিলেন, 'পণ্ডিত আজ তুমি যাঁহার কাছে পরাজিত হইয়াছ তিনি আমার কান্ত। পরাজয়ে ক্ষোভ করিও না—তুমি তাঁহার চরণতলে গিয়া আশ্রয় লও, তোমারই জয় হইবে—তুমি পরমধন লাভ করিবে।'

পাণ্ডিত্যের সকল গৌরব, জয়ের সমস্ত ঐশ্বর্য ত্যাগ করিয়া কেশব কাশ্মীরী প্রভুর পদে শরণ লইলেন—প্রভুর বিজয়মাল্য তাঁহার শিরে আসিয়া পড়িল, তিনি তীর্থে চলিয়া গেলেন।

পরাজয়েই জয়মাল্য মিলে প্রভুর কাছে। নিমাই যখন টোলে পড়িতেন তখন ন্যায়শাস্ত্রবিশারদ রঘুনাথ তাঁহার সমাধ্যায়ী ছিলেন। ন্যায়ের টিপ্পনী লিখিয়া ভারতবিখ্যাত হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় রঘুনাথ বহু শ্রমে, বহু সাধনায় একটি টিপ্পনী প্রস্তুত করিলেন; শুনিলেন নিমাইও একখানি লিখিয়াছেন। উদ্বিগ্ন রঘুনাথের অনুরোধে এক অপরাহ্ণে গঙ্গার বক্ষে নৌকায় দুই সতীর্থ বসিলেন। নিমাই স্বরচিত গ্রন্থ পাঠ করিতে লাগিলেন—রঘুনাথের মুখ ম্লান হইতে লাগিল। নিমাই হঠাৎ চাহিয়া দেখেন রঘুনাথের চোখে জল। ব্যাকুল হইয়া নিমাই কারণ জানিতে চাহিলে রঘুনাথ কান্নায় ভাঙ্গিয়া পড়িলেন—নিমাইয়ের অদ্ভুত পাণ্ডিত্যের কাছে তাঁহার পাণ্ডিত্য কোথায় যাইবে ভাসিয়া, যে সূত্র ব্যাখ্যা করিতে তাঁহার লাগিয়াছে দশপৃষ্ঠা, নিমাইয়ের সেখানে লাগিয়াছে কয়েক পংক্তি; এত পরিশ্রমের, এত সাধনার ধন রঘুনাথের বৃথা হইয়া গেল—তাঁহার এই গ্রন্থের মূল্য কেহই দিবে না।

তরুণ নিমাই হাসিয়া উঠিলেন, 'এই কথা? কি হইবে এই অফলা শাস্ত্রের চর্চা করিয়া?' মুহূর্তে রত্নগর্ভ ঐ টিপ্পনী গঙ্গার জলে নিক্ষিপ্ত হইয়া গেল—রঘুনাথ হায় হায় করিয়া উঠিলেন।

রঘুনাথের গ্রন্থ জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিল, কিন্তু অবহেলিত যেই-গ্রন্থ গঙ্গার জলে নিক্ষিপ্ত হইল তাহা যদি আজ দুর্লভ না হইত?

জগন্নাথ মিশ্র লোকান্তর গমন করিয়াছেন, কিন্তু আজও গয়ায় তাঁহার পারলৌকিক কার্য সমাপ্ত হয় নাই। নিমাই জননীর চরণবন্দনা করিয়া, বিষ্ণুপ্রিয়াকে বহু প্রবোধ দিয়া, কয়েকজন সঙ্গী লইয়া গয়াধামে যাত্রা করিলেন। পথে জ্বর হইল—ব্রাহ্মণের পাদোদক পানে জ্বরের বিরামও হইল। গয়ার সকল তীর্থে পিণ্ডদান প্রভৃতি সমাধা করিয়া আসিলেন চক্রবেড়ের মধ্যে। বিষ্ণুপদচিহ্নের চারিদিকে ঘিরিয়া আছেন দর্শনার্থী ও ভক্ত, পাণ্ডাগণ ডাকিয়া বলিতেছেন, 'এই সেই লক্ষ্মীসেবিত চরণকমল, ব্রহ্মা যে চরণের ধ্যান করেন, মহাদেব যেই চরণস্পর্শে পাগল হইয়া আছেন—এই সেই বিষ্ণুপদচিহ্ন, দর্শন করিয়া সার্থক হও।'

বিষ্ণুপদচিহ্নে মাথা ঠেকাইলেন ভক্তরূপী স্বয়ং ভগবান, আরম্ভ হইল মহাপ্রকাশ, স্বেদকম্পপুলকে অঙ্গ ভরিয়া উঠিল, নয়ন হইতে অজস্রধারায় অশ্রু নির্গত হইয়া বিষ্ণুপদতল অভিষিক্ত করিতে লাগিল। ঠিক সেই সময়ে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য প্রভুপাদ ঈশ্বর পুরীও সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন। নিমাইয়ের আর্তি দেখিয়া মনে পড়িল বিরহিণী রাধিকার বিরহ-ব্যথার দহনে দগ্ধ গুরু মাধবেন্দ্র পুরীর অন্তিমের আর্তনাদ—'অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে, অয়ি মথুরানাথ! আমার হৃদয় তোমার বিরহে বিদীর্ণ হইতেছে—ওগো বলো কি করিব আমি?

ঈশ্বর পুরী নিমেষবিহীন নেত্রে চাহিয়া রহিলেন নিমাইয়ের দিকে। অশ্রু-ভারাক্রান্ত পদ্মনয়ন দুইটি ঊর্ধ্বে মেলিয়া নিমাইও দেখিলেন শ্রীপাদ পুরীকে। নিমাই তাঁহার পদতলে লুণ্ঠিত হইলেন, 'আমাকে আপনি কৃপা করিয়া দীক্ষা দান করুন, আমি এই দেহ-মন আপনার পদতলে সমর্পণ করিলাম।'

শুভ দিনে নিমাই দশাক্ষরী মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। ঈশ্বর পুরীকে প্রদক্ষিণ করিয়া বলিলেন, 'আশীর্বাদ করুন, আমি যেন কৃষ্ণপ্রেম-সমুদ্রে ভাসি।'

অশ্রুজলের ধারার মধ্যে বিদায় গ্রহণ করিলেন ঈশ্বর পুরী, হৃদয়ে অঙ্কিত করিয়া লইলেন গৌর-কিশোর মূর্তিখানি।

মহাপ্রকাশ

প্রভু আপন রসের সন্ধান পাইলেন। সার্থক হইল গয়ায় আগমন, সার্থক হইল পৃথিবীতে অবতীর্ণ হওয়া। সঙ্গীদের বলিলেন, 'তোমরা ফিরিয়া যাও, আমি আর গৃহে ফিরিব না।' গৌর বৃন্দাবনের দিকে ধাবিত হইলেন। বহু চেষ্টায়, বহু সাধ্যসাধনায় সঙ্গিগণ গৌরসুন্দরকে নবদ্বীপে ফিরাইয়া আনিলেন। হর্ষোৎফুল্লা শচীর পায়ে প্রণত হইলেন নিমাই, কিন্তু মাতা দেখিলেন—পুত্র নহে, গয়া হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদ এক বৈরাগী। বধূ বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল। দীর্ঘপ্রবাস-প্রত্যাগত স্বামী একবার প্রতীক্ষারতা তাঁহাকে ডাকিলেন না।

অধ্যাপক ফিরিয়া আসিয়াছেন। শিষ্যগণ অপার আনন্দে হরি' বলিয়া পুঁথির ডোর খুলিলেন। কিন্তু এতদিনে পুঁথির পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় ধাতু, শব্দরূপ প্রকৃতি-প্রত্যয়ের পরিবর্তন ঘটিয়া গিয়াছে অনেক। সেই নবঘন শ্যামসুন্দরের রূপের চেয়ে মনোহর আর কি আছে? শব্দ—হরিনাম মন্ত্র—কৃষ্ণভক্তি। অশ্রুজলের মধ্য দিয়া এইরূপ ব্যাখ্যাই করিতে লাগিলেন নিমাইপণ্ডিত। ছাত্রগণ নিরুত্তর হইয়া বসিয়া রহিল। দিনের পর দিন চলিতে লাগিল এইপ্রকার অধ্যাপনা। ছাত্রগণ গুরুর গুরু পণ্ডিত গঙ্গাদাসের কাছে গেল। সমস্ত শুনিয়া পণ্ডিত প্রাক্তন শিষ্য নিমাইকে ডাকিয়া অনেক উপদেশ দিলেন। নতশিরে নিমাই গুরুবাক্য মানিয়া লইলেন। কাল হইতে তিনি ঠিকমত অধ্যাপনা করিবেন।

পরদিন পাঠ আরম্ভ হইল। বহুকষ্টে বাহ্যচেতনা আনিয়া নিমাই জিজ্ঞাসা করিলেন 'বল দেখি ভাই, এতদিন কি পাঠ শিখিলে তোমরা?' অধোমুখে ছাত্রগণ নূতন পাঠের কথা জানাইল, 'আপনি এই কয়েকদিন শুধু কৃষ্ণনামই করিয়াছেন, অন্য পাঠ আমরা পাই নাই।

কৃষ্ণনাম কানে গেল অমোর অবাধ্য অশ্রু আসিল নয়নে। বিহ্বল নিমাই বলিলেন, 'কি করিব বলো ভাই আমি তো পাঠ দিতেই চাই, কিন্তু এক কৃষ্ণবর্ণ বালক আসিয়া মুরলী বাজায়, আর আমি স্থির থাকিতে পারি না।'

বহু কষ্টে আপনাকে সংযত করিয়া নিমাইপণ্ডিত পরমপ্রিয় শিষ্যগণের মস্তকে কম্পিত হস্ত রাখিয়া আশীর্বাদ করিলেন, জনে জনে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, 'আমাকে ক্ষমা করো তোমরা, আমি স্বচ্ছন্দে অনুমতি দিতেছি, তোমরা অপর কোনও অধ্যাপকের কাছে গিয়া পাঠ গ্রহণ করিয়া বিদ্যালাভ কর।

শিষ্যগণ কাঁদিয়া উঠিল—'আপনার মত এমন পরমপ্রিয়, পরমগুরুকে ছাড়িয়া আর কাহার কাছে যাইব আমরা ?'

চোখের জলে গুরুশিষ্যে বিদায়গ্রহণ করিলেন। পাঠ সমাপ্ত হইল। নিমাই কৃষ্ণপ্রেমে সম্পূর্ণ উন্মাদ হইয়া উঠিলেন। শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীবাস, মুরারি, মুকুন্দের আনন্দের সীমা রহিল না, সকলেই বুঝিলেন নিমাইয়ের অপূর্বসুন্দর দেহে কৃষ্ণের অধিষ্ঠান হইয়াছে।

শ্রীবাসের রুদ্ধদ্বার আঙ্গিনায় নিশীথরাত্রে আরম্ভ হইল শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, শুধু কয়েকজন অন্তরঙ্গ ভক্ত-সঙ্গে। ক্রমেই ভক্তসংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল—'প্রেমে শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়।' শান্তিপুর নদীয়ায় প্রেমের বন্যা বহিল, আর অভাগিনী শচী ও বিষ্ণুপ্রিয়ার চক্ষে নামিল নিরাশার অশ্রুর বন্যা। কিশোরী বধূর মুখের দিকে চাহিয়া শিহরিত হইয়া উঠেন মাতা শচী। সঙ্গিনীদের ডাকিয়া আনাইয়া কত মনোহর বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত করিয়া বধূকে পাঠাইয়া দেন পুত্রের গৃহে, প্রতীক্ষার দীর্ঘরজনী গভীর উৎকণ্ঠার মধ্যে দিয়া কাটিয়া যায়, প্রভাতে ব্যর্থ-সজ্জার লজ্জায় মুখ ঢাকেন বিষ্ণুপ্রিয়া, কচিৎ কোনও দিন যদি নিমাই গৃহে আসেন, বৃদ্ধা জননী অবগুণ্ঠিতা বিষ্ণুপ্রিয়াকে আনিয়া নিমাইয়ের কাছে বসান, বধূর কত গুণের কথা বর্ণনা করেন, শেষে এক ফাঁকে সরিয়া যান সেখান হইতে। নিমাই 'হা কৃষ্ণ' বলিয়া ঊর্ধ্ব নয়নে অঝোর ধারায় কাঁদিতে থাকেন—পায়ের কাছে অবস্থিতা বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রিয়বিরহের ব্যথা তাঁহার বুকে বাজে না।

প্রভু শ্রীবাসের অঙ্গনে প্রতিদিন দাস্যভাবেই নৃত্য করেন, মাঝে মাঝে দেহে ভগবত্তা ও ঐশ্বর্যের লক্ষণ প্রকাশ পায়, তখন বলিতে থাকেন, 'আমিই সেই, আমি এক, অদ্বয়, আমার দ্বিতীয় নাই'; কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার জনে জনে ভক্তের চরণ ধরিয়া রোদন করিতে থাকেন—'তোমরা আমাকে কৃষ্ণপ্রেম মহাধন দান কর।'

একদিন দাস্য নয়, প্রথমে আসিয়াই শ্রীবাসের মন্দিরে গিয়া বিষ্ণু-খট্টায় প্রভু উপবেশন করিলেন, ঐশ্বর্যের প্রকাশে ও ভগবৎ-আবেশে কাঁচাসোনার অঙ্গ যেন অধিকতর জ্যোতির্ময় হইয়া উঠিল—আরক্তবদনে করুণা ও গাম্ভীর্য। বলিলেন, 'আমার অভিষেক কর'—প্রতিদিবসের দেখা গৌর অন্তর্হিত হইলেন, ভক্তগণ বিহ্বল হইয়া গেলেন। কুলবধূগণ শত শত কলসে অভিষেক-বারি আনিতে লাগিলেন, মঙ্গল আরতি ও স্তুতিতে মন্দির গম গম করিতে লাগিল, সুগন্ধে বাতাস হইয়া উঠিল মধুময়, ভক্তগণ গঙ্গাবারির সঙ্গে অশ্রুবারি মিশাইয়া প্রভুর অভিষেক

করিলেন—চন্দন, কুমকুম্, অগুরু ও পুষ্পের সঙ্গে ভক্তগণের হৃদয়ও প্রভুর পায়ে অর্ঘ্যস্বরূপ নিবেদিত হইল। প্রভু 'মুঞি সেই' বলিয়া মস্তক ঢুলাইতে লাগিলেন, স্ত্রী পুরুষ সকলকে বলিলেন, 'আমাতে তোমাদের চিত্ত অর্পিত হোক্।'

শ্রীঅদ্বৈত বহুদিন ধরিয়া সংশয়ের দোলায় দুলিতেছিলেন, 'সত্যই কি আমার আহ্বানে গোলোকপতি পৃথিবীতে আসিয়াছেন? ইনি কি সেই?'

আজ সংশয় ঘুচিল—প্রভু ডাকিলেন, 'ওরে নাড়া তোর আহ্বানেই আমার অবতার, তুই প্রার্থনা কর।' অদ্বৈত 'নমো ব্রহ্মণ্য দেবায়' বলিয়া তুলসী গঙ্গাজলে শ্রীচরণ পূজা করিলেন। আচণ্ডালে ভক্তি অর্পণ করার প্রতিশ্রুতি দিলেন প্রভু।

শ্রীবাস মুরারি সকলকে আহ্বান করিলেন—প্রসন্ন দক্ষিণ হস্তে দিতে চাহিলেন বর, সকলেই শ্রদ্ধাভক্তি কামনা করিলেন আর কিছু নয়।

তারপর যবন হরিদাসকে ডাকিলেন—'হরিদাস তোমার মতো কেহ আর প্রিয় আমার নাই। দুষ্ট রাজাগণ যখন তোমার অঙ্গে বেত্রাঘাত করে তখন, এই দেখ, পৃষ্ঠ পাতিয়া আমি যে তোমার আঘাত গ্রহণ করিয়াছি, এই তাহার চিহ্ন। এসো হরিদাস, যাহা চাও সব তুমি নাও তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নাই।' হরিদাস কাঁদিয়া উঠিলেন—প্রভুগো, তোমার ভক্তের প্রসাদ শুধু আমাকে দিও আর কিছু নয়।'

সকল ভক্তের প্রতি অজস্রধারায় করুণা বর্ষিত হইতে লাগিল, কিন্তু মুকুন্দেরই শুধু দর্শন করিবার অধিকার রহিল না। শ্রীবাসাদি ভক্তের মিনতি ব্যর্থ হইল। প্রভু বলিলেন, না যে শুষ্ক জ্ঞানচর্চা করে মায়ার অধীন জীবের সঙ্গে মায়ার অধীশ্বর ভগবানকে অভেদ মনে করে, সে আমার দর্শনের অধিকারী নয়।'

প্রভুর সঙ্কীর্তনের প্রধান গায়ক, প্রভুর পরমপ্রিয় মুকুন্দ বাহিরে দাঁড়াইয়া প্রভুর দণ্ড শুনিয়া সেইদিনই দেহত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন, শুধু শ্রীবাসের মাধ্যমে একটি কথা জানিতে চাহিলেন—কোনও দিন, কোনও জন্ম-জন্মান্তরেও মুকুন্দ প্রভুর দর্শন কি পাইবে না? প্রভু বলিয়া উঠিলেন, 'কোটিজন্ম পরে সে আমার দর্শন পাইবে।

শুনিল নিশ্চিত প্রাপ্তি প্রভুর শ্রীমুখে।
মুকুন্দ সিঞ্চিত হইল পরানন্দ সুখে॥

'পাইব পাইব বলিয়া মুকুন্দ নৃত্য করিতে লাগিলেন। কোটি জন্ম? তা হোক তবুও তো একদিন পাইব।'

ভক্তবৎসল প্রভু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, তাঁহাকে ডাকাইয়া কাছে

আনিলেন—অভয় দক্ষিণামূর্তি দর্শনে মুকুন্দ লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন প্রভুর পদতলে, মুহূর্তেই মুকুন্দের জন্মান্তর ঘটিয়া গেল।

দীনের ভগবান ঐশ্বর্যে অধিষ্ঠিত হইয়াও দীনকে ভোলেন নাই; বলিলেন, 'খোলাবেচা শ্রীধরকে শীঘ্র এখানে আনো।' কম্পিতকলেবরে দীনহীন শ্রীধর আসিয়া প্রণত হইলেন সেই ব্রাহ্মণের পদতলে, যিনি তাঁহার কলামুলা কাড়িয়া লইতেন. কিন্তু কোথায় সেই সুন্দর সুকুমার ব্রাহ্মণযুবক, ইনি তো সহস্র সূর্য অপেক্ষাও দীপ্ত, ষড়ৈশ্বর্যময় পরমপুরুষ। জ্যোতিরুদ্ভাসিত বদনে ঈষৎ হাসিয়া প্রভু বলিলেন. 'শ্রীধর আমার স্তব কর।

অশ্রুজলে চরণকমল দুইটি সিক্ত করিয়া শ্রীধর বলিলেন, 'দীনহীন মুর্খ, অধম আমি, তোমার কি স্তব করিব, আমি যে কিছুই জানি না প্রভু!'

প্রভু বলিলেন, 'তোমার বাক্যই হইবে আমার স্তুতি।'

শ্রীধর আর্তস্বরে বলিতে লাগিলেন, 'ওগো দয়াল! আমি তোমাকে জানি নাই, অতি মূর্খ আমি, আমি তোমাকে কিছুই দিই নাই, কিন্তু তুমি স্ব-ইচ্ছায় আজ আমাকে এই অমূল্যধন দান করিলে? জানি তুমি দীনের ভগবান, অধমের নাথ. তাই বিদুরের খুদ, শ্রীধরের থোড় তুমি আপনি চাহিয়া লইলে।'

প্রভু প্রসন্ন হইলেন, বলিলেন. 'বর চাও শ্রীধর, পৃথিবীর সাম্রাজ্য, অষ্টসিদ্ধি যাহা চাও আজ তাহাই পাইবে তুমি।'

ভক্তবর শ্রীধর বলিলেন, 'প্রভু একবার ভাঁড়াইয়াছ বলিয়া কি আরও ভাঁড়াইতে পারিবে? আমি আর ভুল করিব না—তোমার সাম্রাজ্য, অষ্টসিদ্ধি তোমারই থাকুক—আমি তাহা চাই না।'

প্রভু বলিলেন, 'কিছু প্রার্থনা কর শ্রীধর, আমার দর্শন তো ব্যর্থ হইতে পারে না।'

তখন অশ্রুধারায় প্রভুর রাঙ্গাচরণ দুইটি অভিষিক্ত করিয়া বর চাহিলেন শ্রীধর—

যে ব্রাহ্মণ কাড়ি নিল মোর খোলাপাত
সে ব্রাহ্মণ হউক মোর জন্ম জন্ম নাথ।
যে ব্রাহ্মণ মোর সঙ্গে করিল কন্দল,
মোর প্রভু হউক তাঁর চরণ যুগল।

প্রভু পরম স্নেহে ডাকিলেন—'শ্রীধর, আমার পরম ঐশ্বর্য তুমি দর্শন করিলে সাম্রাজ্য, এমনকি, অষ্টসিদ্ধি তোমাকে দিতে চাহিলাম, কিন্তু তোমার মতিভ্রম হইল না, কিছুই নিলে না তুমি—আমি কেমন করিয়া তোমার ঋণ শোধ করিব?

তবুও তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক. বেদ যে-ভক্তির সন্ধান পায় নাই, সেই ভক্তি আমি তোমাকে অর্পণ করিলাম।'

বৈষ্ণবগণ হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। সাতপ্রহর পর্যন্ত স্বানুভাবানন্দে ও অদ্বৈত-অনুভূতিতে প্রভু অধিষ্ঠিত রহিলেন। ঐশ্বর্যের প্রখর জ্যোতি ও দুরত্ব ভক্তগণ আর যেন সহ্য করিতে পারিলেন না, কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, 'এবার সম্বরণ করো তোমার ঐশ্বর্য, আমরা তোমার মধুর রূপ আবার দর্শন করিতে চাই, কৃপা কর, আমাদের গৌরচন্দ্র হইয়া তুমি আমাদের কাছে উদিত হও।'

এ ঐশ্বর্যের অন্তর্ধান হইল—গৌরসুন্দরের চেতনাহীন দেহ ভূমিতে লুণ্ঠিত হইয়া পড়িল, দেহে মৃত্যুর লক্ষণ, প্রাণের কোনও স্পন্দন নাই। দীর্ঘ সন্তর্পণ ও বহুক্ষণ নাম সঙ্কীর্তনের পরে যেন সদ্য নিদ্রা হইতে উত্থিত হইলেন নিমাই, ক্ষীণ ক্লিষ্টস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন ভক্তদের, 'একি এতক্ষণ কোথায় ছিলাম আমি, হায় হায়! বৃথা সময় বহিয়া গেল, আমি কৃষ্ণস্মরণ করিলাম না?'

দাস্যভাবে কাতর কণ্ঠে 'হা কৃষ্ণ' বলিয়া রোদন করিতে লাগিলেন গৌর, কিন্তু শ্রীবাসের মন্দির ভরিয়া বহিল অপার্থিব আনন্দে।

নবদ্বীপে অন্তরঙ্গ-লীলা

এক নিশীথে শ্রীবাসের আঙ্গিনায় প্রভু ঈশ্বর-আবেশে বসিয়া আছেন, কোনও ভক্ত সঙ্কীর্তন করিতেছেন, কেহ বা নৃত্যরত। দরিদ্র ভিক্ষুক শুক্লাম্বর ব্রহ্মচারী, নবদ্বীপের দ্বারে দ্বারে কৃষ্ণনাম কীর্তন করিয়া ফিরেন—দুই মুষ্টি ক্ষুদ-তণ্ডুল যাহাই ঝুলিতে অযাচিতভাবে আসিয়া পড়ে, সন্তুষ্টচিত্তে তাহা লইয়াই দীন কুটীরে ফিরিয়া আসেন। দৈন্য বাহিরে—অন্তরে নয়। প্রভুর পরম স্নেহ এই দীনের প্রতি। কাঁধে-ঝুলি শুক্লাম্বর প্রভুর সম্মুখে নৃত্য করিতেছেন, প্রভু হঠাৎ তাঁহার কাঁধের ঝুলি হইতে দুই মুষ্টি ক্ষুদকণা লইয়া পরমানন্দে মুখে দিতে লাগিলেন।

'কর কি কর কি সর্বনাশ, এ তণ্ডুলে ক্ষুদকণ বহুত প্রকাশ'—আর্ত শুক্লাম্বর প্রভুর হাত ধরিতে গেলেন। প্রভু বলিলেন, 'কেন ভুলিয়া যাও শুক্লাম্বর! তোমার কি মনে পড়ে না আর একবার দ্বারকায় তোমার হাত হইতেই তো কাড়িয়া ক্ষুদ খাইয়াছিলাম, সে অমৃতস্বাদ আজও যে আবার পাইলাম।'

দ্বারকায় রাজাধিরাজ রাজচক্রবর্তী শ্রীকৃষ্ণ আর মথুরায় দরিদ্র ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ শ্রীদাম—বাল্যের দুই সখা, সমাধ্যায়ী। শ্রীদামের সম্বল ভিক্ষান্ন,—এক দিবসান্তে

তাহাও মিলে নাই ; পতিব্রতা ব্রাহ্মণী স্বামীকে একমুষ্টি অন্ন দিতে না পারিয়া দুঃখে অভিভূতা হইয়া গেলেন, স্বামীকে বলিলেন, 'একবার দ্বারকায় যাও। ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, শুনিয়াছি তোমার বন্ধুর ভাণ্ডারে কিছুরই অভাব নাই ; তোমাকে দেখিলে সামান্য উদরান্নের সংস্থান শ্রীকৃষ্ণ নিশ্চয়ই করিয়া দিবেন।'

পত্নীর বারংবার অনুরোধে—অন্ততঃ 'অয়ং হি পরমো লাভ উত্তমশ্লোক-দর্শনঃ' —মহাভাগ শ্রীকৃষ্ণের দর্শন প্রাপ্ত হইব ইহাই পরম লাভ—এই মনে করিয়া শ্রীদাম সম্মত হইলেন। পত্নীকে বলিলেন কিছু উপহার সংগ্রহ করিয়া দিতে। স্ত্রী প্রতিবেশীর কাছ হইতে চার মুষ্টি 'পৃথুক তণ্ডুল' (চিঁড়ার ক্ষুদ) সংগ্রহ করিয়া আনিয়া দিলেন।

দীর্ঘপথকষ্ট অগ্রাহ্য করিয়া হৃষ্টচিত্তে শ্রীদাম চলিয়াছেন দ্বারকায়, কৃষ্ণদর্শন-লালসায়।

দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন। রাজপ্রাসাদের ঐশ্বর্য ও সমারোহ-দর্শনে বিহ্বল ব্রাহ্মণ দ্বারের পর দ্বার অতিক্রম করিয়া অন্তঃপুরে প্রধান গৃহের দ্বারে উপস্থিত হইলেন—মণিমুক্তাখচিত সুবর্ণ আসনে উপবিষ্ট তাঁহার বাল্যসখা, মহারানী রুক্মিণী ব্যজনে নিযুক্তা। দ্বারান্তরালবর্তী ভিক্ষুক ব্রাহ্মণকে দেখামাত্র রাজাধিরাজ ছুটিয়া দ্বারে আসিলেন, দৃঢ়-আলিঙ্গনবদ্ধ করিয়া নিয়া বসাইলেন সিংহাসনে, রুক্মিণী সুবর্ণ ভৃঙ্গার হইতে জল ঢালিয়া দিলেন, শ্রীকৃষ্ণ স্বহস্তে কুণ্ঠিত দীর্ণ শ্রীহীন সখার দুই পদ ধোয়াইয়া সেই জল মাথায় ধারণ করিলেন। অন্তঃপুরস্থ জনেরা বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া রহিলেন—'ইহলোকে নিন্দিত, অধম, মলিনবেশা এই ব্রাহ্মণ এমন কি পুণ্যানুষ্ঠান করিয়াছিলেন ?'

সেবা, পরিচর্যায় পথের ক্লান্তি দূর হইল। শ্রীদামকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের চোখের উপর ভাসিয়া উঠিতে লাগিল সুদূর অতীতের কতো ছায়াচিত্র। আনন্দ-স্মৃতিতে উজ্জ্বল শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন 'মনে কি পড়ে সখা, সেই যে গুরুপত্নীর আদেশে কাষ্ঠসংগ্রহের জন্য আমরা এক দিন বনে গিয়াছিলাম, কাষ্ঠের সন্ধানে দিবস অতিবাহিত হইয়া কখন সন্ধ্যা আসিল বুঝিতে পারি নাই, গহন অরণ্যে পথ হারাইলাম। এদিকে আবার আরম্ভ হইল প্রবল ধারাবর্ষণ, সঙ্গে ঝড় ও বজ্রপাত—সেই গভীর ঘন অন্ধকার নিশীথে আমরা দুইটি ভীত বালক দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া পরস্পরের হাত ধরিয়া পরিভ্রমণ করিতে লাগিলাম—রাত্রি আর যেন শেষ হয় না ! অবশেষে প্রভাতে অরুণোদয় হওয়ার পূর্বেই গুরু সান্দিপণী আসিয়া আমাদের উদ্ধার করিলেন। তাঁহার অকৃপণ আশীর্বাদ অজস্রধারায় আমাদের শিরে বর্ষিত হইল।'

শ্রীদাম ভুলিয়া গেলেন তিনি ভিখারী—শৈশবের নির্মল অনুরাগে রাজ-সখাকে উদ্ভাসিত হইতে দেখিয়া ভুলিয়া গেলেন পারিপার্শ্বিকতা ; ঐশ্বর্য আর তাঁহাকে দূরে ঠেলিয়া দিতে পারিল না, সখ্যমাধুর্যে ডুবিয়া শ্রীদাম পুলকিতাঙ্গ হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ সহাস্যে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'সখা! নিশ্চয়ই গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাগত হইয়া তুমি সদৃশী ভার্যা গ্রহণ করিয়াছ? তুমি যেমন জিতেন্দ্রিয় ও নির্লোভ, আমার সখীও নিশ্চয়ই তেমনি?' চকিত কটাক্ষ একবার রুক্মিণী, একবার সত্যভামার মুখে চতুর স্পর্শ বুলাইয়া গেল! শ্রীদামের স্মিত মুখে সলাজ, কুণ্ঠিত দৃষ্টি দেখিয়া চতুর সখা বুঝিলেন, বন্ধুপত্নী সত্যই কল্যাণী। পত্নীর কথায় শ্রীদামের তাঁহার প্রদত্ত উপহারের কথা মনে পড়িল ; কি করিবেন, কোথায় তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঐ বস্তু গোপন করিবেন ভাবিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। কিন্তু 'বিশ্বতোচক্ষু' সখার দৃষ্টি এড়ানো গেল না। কৃষ্ণ হাসিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'আমার জন্য সখী কি উপহার পাঠাইয়াছেন, কই আমাকে তো তুমি দিলে না সখা! দেখি দেখি, লুকাইও না—ঐ চাদরের তলায় কি?' শ্রীদাম বক্ষের নীচে চেলখণ্ডবদ্ধ 'পৃথুক তণ্ডুল' লুকাইতেছেন আর সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিতেছেন, 'না, না, এ কিছুই নয়।' শ্রীকৃষ্ণ কাড়িয়া লইলেন সেই ক্ষুদ, পরমানন্দে মুখে তুলিয়া দিলেন এক গ্রাস ; দ্বিতীয় গ্রাসের সময় মহালক্ষ্মী রুক্মিণী ভগবানের হস্তধারণ করিয়া বলিলেন, 'হে বিশ্বাত্মন্! তোমার তৃপ্তি ও সন্তোষের পক্ষে ঐ এক মুষ্টিই যথেষ্ট।'

শ্রীদাম সারারাত্রি বন্ধুর সঙ্গে এক রাজশয্যায় কাটাইলেন, প্রভাতে বন্ধুর পথ কিছুদূর অনুগমন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ ফিরিলেন ; শ্রীদাম যাত্রা করিলেন গৃহের পানে। অর্থ ভিক্ষা করা হইল না—অর্থপ্রাপ্তিও হইল না, কিন্তু যাহা পাইলেন তাহাই রহিল হৃদয়-মন পূর্ণ করিয়া। ভাবিলেন, ঐশ্বর্য পাইলে পাছে তাঁহাকে ভুলিয়া যাই, তাই করুণাময় তিনি ঐশ্বর্য আমাকে দেন নাই।

গ্রামে ফিরিয়া আপন জীর্ণ কুটিরখানি না দেখিয়া ব্রাহ্মণ বিস্মিত হইলেন - চোখ-দুইটি মার্জনা করিয়া দেখেন, অলঙ্কার ও রূপের প্রভায় বিকশিতা হইয়া তাঁহারই পত্নী এক রাজহর্ম্যের দ্বারে স্বামী-প্রতীক্ষারতা।

দরিদ্র ব্রাহ্মণ ঐশ্বর্যে বিভ্রান্ত হইলেন না—ইহার চেয়ে পরমধনের সন্ধান যে লাভ করিয়া আসিয়াছেন!

> ইত্থং ব্যবসিতো বুদ্ধ্যা ভক্তোঽতীব জনার্দনে—
>
> বিষয়ান্ জায়য়া ত্যক্ষ্যন্ বুভুজে নাতিলম্পটঃ

—তিনি স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা নিশ্চিতমানস হইয়া জনার্দন-উদ্দেশ্যে বিষয়-সকল

ত্যাগ অভ্যাস করিয়া অনতিলম্পট অর্থাৎ অনাসক্ত হইয়া পত্নীর সহিত বিষয় ভোগ করিয়াছিলেন।

প্রভু গৌরসুন্দর বলিলেন, 'শুক্লাম্বর! তোমার হৃদয়ে, তোমার সঙ্গে আমি তো সকল সময়েই আছি। "তোমার ভোজনে হয় আমার ভোজন।" '

আর একদিন প্রভু শুক্লাম্বরকে বলিলেন, 'তোমার অন্ন ভোজন করার একান্ত অভিলাষ আমার হইয়াছে, যাও রন্ধন কর গিয়া।' শুক্লাম্বর কাকুতি মিনতি করিতে লাগিলেন—'প্রভু' দয়া করুন, আমাকে এই আজ্ঞা করিবেন না, আমি পতিত, অধম!' প্রভুর ইচ্ছার কাছে শুক্লাম্বরের সমস্ত মিনতিই ব্যর্থ হইল। অবশেষে শুক্লাম্বর শুদ্ধ স্নাত হইয়া সুবাসিত তপ্ত জলে সংগৃহীত কিছু সুগন্ধি তণ্ডুল ও একটি গর্ভথোড় আলগোছে ফেলিয়া দিয়া যুক্তকরে বসিয়া রহিলেন।

মধ্যাহ্নে সিক্তবস্ত্রে শুক্লাম্বরের গৃহে প্রভু আসিলেন, সঙ্গে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ও অপর কয়েকজন ভক্ত। বস্ত্র পরিবর্তন করিয়া স্বহস্তে অন্ন লইলেন প্রভু, বিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া যখন প্রসাদ গ্রহণ করিতে বসিলেন তখন অন্নের সুগন্ধে বাতাস ভরিয়া উঠিল। প্রভু বলিলেন, 'জীবনে আমি এইরূপ সুস্বাদু অন্ন গ্রহণ করি নাই।' ভক্তগণ প্রসাদ পাইয়া কৃতার্থ হইলেন।

কতক্ষণ কৃষ্ণপ্রসঙ্গ করিয়া ভক্তসঙ্গে ভগবান শুক্লাম্বরের জীর্ণ কুটির আলো করিয়া শয়ন করিলেন। ভক্তগণ শীঘ্রই নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। জাগিয়া আছেন শুধু প্রভু, আর তাঁহার পাশেই শায়িত 'আখরিয়া' বিজয় দাস। প্রভুর বহু পুঁথি তিনি লিখিয়া দিয়াছেন—তাঁহার হস্ত প্রভুর বহু সেবায় লাগিয়াছে, প্রভু তাই আপন শ্রীহস্তখানি সন্তর্পণে একবার বিজয়ের অঙ্গে রাখিলেন। বিজয় চাহিয়া দেখেন—সুবলিত হেমবাহু রত্নখচিত অলঙ্কারে দীপ্যমান, জ্যোতির্ময়; আর সেই জ্যোতিতে যেন সমস্ত ভুবন উদ্ভাসিত। বিহ্বল বিজয় সকলকে ডাকিবার উদ্যোগ করামাত্র প্রভু বিজয়ের ওষ্ঠে হস্ত দিয়া নিবারণ করিলেন—'যত দিন আমি এখানে আছি, কাহারও কাছেই এই কথা প্রকাশ করিবে না।' বিজয় আনন্দ চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না; তাঁহার হুঙ্কার ও আনন্দাবেগে ভক্তগণ জাগ্রত হইলেন। প্রভুও যেন সঙ্গে সঙ্গেই জাগ্রত হইয়া বিস্ময়ের সুরে ভক্তগণকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, 'আজ বিজয়ের আবার কি হইল, বড় দেখি উল্লাস! এ কি ভক্ত শুক্লাম্বর গৃহের মহিমা—না কি গঙ্গাদেবীর আশীর্বাদ?'

ভক্তগণ পরস্পরের দিকে গূঢ়দৃষ্টিতে তাকাইলেন, বিজয় মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন।

পরে বহু সন্তর্পণে চৈতন্য লাভ করিলেন, কিন্তু সাতদিন ধরিয়া আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া উন্মত্তের মতো নবদ্বীপের পথে পথে ঘুরিলেন।

ভক্তগণ জানিলেন না, কি দেখিলেন বিজয়।! কিন্তু শ্রীবাসের মনে পড়িল যবন-দরজীর কথা। শ্রীবাসের গৃহে একদিন শুধু প্রভুকে দেখিলেন সেই পরম সুকৃতিবান যবন—কি দেখিলেন কে জানে, কিন্তু 'দেখিনু, দেখিনু' বলিয়া হর্ষভরে নৃত্য করিতে করিতে বাহির হইয়া গেলেন—বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া পাইতে লাগিল কয়েক দিন।

শ্রীবাস দরিদ্র, কিন্তু তাঁহার গৃহের অঙ্গনতলের ধূলিকণাও পরমপুরুষের পদরেণুস্পর্শে যেন স্বর্ণকণা হইতেও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছিল।

তাহার গৃহের দাসী দুঃখী—প্রভুর অভিষেকের জল শত শত কলসে বহিয়া আনে। প্রভু একদিন চাহিয়া দেখিলেন, শ্রীবাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ও কে শ্রীবাস? পণ্ডিত বলিলেন, ও দুঃখী—'

প্রভু বলিলেন, 'না না ও তো দুঃখী নয়, ও যে পরমসুখী, প্রভু কৃপাদৃষ্টিতে চাহিলেন—দুঃখীর জীবনে আসিল সুখ, আসিল আনন্দের জোয়ার।

নবদ্বীপে কাজী 'কীর্তন মানা করিয়াছেন—ভক্তগণ দুঃখিত, শ্রীবাসও চিন্তিত। প্রভু তাহা বুঝিলেন—ভগবৎশক্তির কাছে রাজশক্তি যে কত তুচ্ছ তাহাই বুঝাইয়া দিতে একদিন ডাকিলেন—'নারায়ণী। কৃষ্ণকথা বল।' নারায়ণী পণ্ডিতের সপ্তমবর্ষীয়া ভ্রাতুষ্পুত্রী, প্রভুর আহ্বানমাত্র পুলক-রোমাঞ্চে বালিকার দেহ পূর্ণ হইল, অঝোরঝরা অশ্রুধারায় সিক্ত হইয়া নারায়ণী কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। প্রভুর প্রসাদ ও অবশেষপাত্র পাইয়া নারায়ণী ধন্য হইলেন। শ্রীবাস বুঝিলেন যাঁহার কৃপায় 'মূকং করোতি বাচালং' তাঁহার কাছে রাজশক্তির রক্তচক্ষু কতো তুচ্ছ। শেষটাই কাজীর ক্রোধ রূপান্তরিত হইয়াছিল গৌরপ্রেমে। গৌরপদে আপনাকে নিঃশেষে উজাড় করিয়া দিয়া কাজী ধন্য হইয়াছিলেন।

প্রবীণ মুরারি গুপ্ত প্রভুর স্বদেশী, সমাধ্যায়ী। অধ্যয়নকালে মুরারিকে জব্দ করাতেই ছিল প্রভুর আনন্দ। মুরারি পথে চলিবার সময়ে যখন শুষ্ক জ্ঞানের আলোচনা করিতেন, বালক নিমাই হাত নাড়িয়া মুখ নাড়িয়া তাঁহাকে দেখাইয়াই তাঁহার অনুকরণ করিতেন। মুরারি বিরক্ত হইতেন। তথাপি যুবক নিমাই যখন পাণ্ডিত্যের গর্বে নবদ্বীপকে উপেক্ষা করিয়া চলিতে থাকিতেন; মুরারি তন্ময় হইয়া চাহিয়া থাকিতেন সেই উদ্ধত সুন্দরের দিকে। একদিন বলিয়া ফেলিলেন, 'উদ্ধতের শিরোমণি! একটু কৃষ্ণ-ভজন কর না কেন? নিমাই প্রগল্‌ভ হাস্যে

বলিলেন, 'ওহে কবিরাজ, ব্যস্ত হইও না—এমন কৃষ্ণ-ভজন করিব, দেখিয়া লইও সকলে কৃষ্ণভক্তি আমার কাছে শিখিয়া লইবেন।

আজ মুরারি দেখিতেছেন—কৃষ্ণভক্তির নবরূপায়ণ। আনন্দে অধীর মুরারি দেহ, গৃহ ভুলিয়া গেলেন। রাত্রিতে ভোজনে বসিয়া ঘৃতসিক্ত সুগন্ধ অন্ন খাও খাও', বলিয়া ভূমিতে ফেলিতেছেন আর হাসিতেছেন। পতিব্রতা স্ত্রী বিস্মিত হইয়া কেবলই অন্ন যোগাইতেছেন। মুরারি আচমন করিয়া উঠিলেন ঘৃতান্নে গৃহতল সিক্ত হইয়া উঠিল।

প্রভাতে প্রভু আসিয়া উপস্থিত হইলেন মুরারির গৃহে। পরম সম্ভ্রমে প্রভুকে আসনে বসাইয়া মুরারি জিজ্ঞাসা করিলেন—

প্রভু! কেনে হইল আগমন।

প্রভু বলে আইলাম চিকিৎসা কারণ।—

'আমার অত্যন্ত অজীর্ণ হইয়াছে, গুপ্ত তুমি ঔষধ দাও।' গুপ্ত ব্যস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি কি দ্রব্য প্রভু কাল রাত্রিতে ভোজন করিয়াছিলেন?'.

প্রভু বলিলেন আর জিজ্ঞাসা করিও না মুরারি, তোমার স্ত্রী জানেন তুমি কি করিয়াছ, খাও, খাও বলিয়া এতগুলি ঘৃতান্নের গ্রাস যখন ভূমিতে ফেলিলে তখন বুঝি তোমার চিন্তা হয় নাই? দাও, এখন জল দিয়া অসুখ আরোগ্য কর। মুরারির জলপাত্র লইয়া প্রভু জলপান করিতে লাগিলেন—মুরারির কোনও বারণই মানিলেন না।

মুরারি শ্রীরামভক্ত, প্রভুর অনুরোধে 'রসের ভজন করিতে চেষ্টা করিলেন। নবদূর্বাদলশ্যাম রামকে হৃদয়াসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন—নবঘন-শ্যামকে আর কিছুতেই সেখানে স্থান দিতে পারিতেছেন না। বিনিদ্র রজনী অসহ্য যন্ত্রণায় অতিবাহিত করিয়া প্রভাতে আরক্তনেত্রে আসিয়া পড়িলেন প্রভুর পদতলে—

'রঘুনাথের পায়ে মুঞি বেচিয়াছো মাথা'—প্রভু সেই মাথা যে আর ফিরাইয়া আনিতে পারি না? তোমার আজ্ঞা লঙ্ঘন, অথবা আমার ইষ্ট বর্জন কোনটাই আমি করিতে পারিব না—আমার প্রাণ বিসর্জনই শ্রেয়।

প্রভু গাঢ় অনুরাগে মুরারিকে বক্ষে ধরিলেন—'সাধু মুরারি! ইহাই তো ইষ্টনিষ্ঠা। মুরারির ললাটে স্বহস্তে প্রভু লিখিয়া দিলেন. 'রামদাস।

এমনি শত সহস্র করুণাধারা বর্ষিত হইতে লাগিল, মুরারি আপনাকে একেবারে হারাইয়া ফেলিলেন। ভাবিলেন, ঈশ্বরের লীলা বুঝি না—এইমাত্র সৃজন করিয়া এইমাত্রই সংহার করেন। সীতা উদ্ধারের জন্য রাবণ বধ করিলেন, কিন্তু সীতাকেই

করিলেন ত্যাগ। সম্মুখে যাদবকুল ধ্বংস হইয়া গেল, নির্মম নিরাসক্ত শ্রীকৃ একটি কথা বলিলেন না। তাই মুরারি ভাবিলেন, এইবার লীলা-অবসানের পূর্বে তিনি দেহত্যাগ করিবেন সুতীক্ষ্ণ একটি ক্ষুর আনিয়া গৃহে লুকাইয়া রাখিলে রাত্রিতে গোপনে দেহত্যাগ করিবেন। অধিকক্ষণ গেল না, প্রভু মুরারির গৃ আসিলেন, কিছুক্ষণ কৃষ্ণকথার পরে হঠাৎ প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মুরারি, আম একটি কথা রাখিবে?' মুরারি বলিলেন, 'প্রভু, এই দেহ তোমার, যাহা করাই তাহাই করিব।

প্রভু তখন মুরারির কানের কাছে মুখ নিয়া বলিলেন, তবে সেই-'কাতি-(ক্ষুর খানি আমাকে দাও।' মুরারি ভীত চমকিত হইলেন—'কোথায়, কিসের কাতি কে তোমাকে কি মিথ্যা সংবাদ দিল?

সর্বজ্ঞ প্রভু ঘরের গোপন স্থান হইতে ক্ষুরখানি লইয়া আসিলেন—মুরারি মাথা নত হইল। মুরারির হাত ধরিয়া ব্যগ্র ব্যাকুল স্বরে প্রভু বলিলেন, 'এ তোমার ভালবাসা মুরারি! নিজের মাথায় মুরারির কম্পিত হাত তু নিয়া রাখিলেন বলিলেন—

মোর মাথা খাও গুপ্ত মোর মাথা খাও,
যদি আরবার দেহ ছাড়িবারে চাও।

মুরারি ভাবিলেন—তাহাই হউক প্রভু তাহাই হউক—তুমি নিষ্ঠুর লী দেখাইবে তাহা জানি তবুও তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।

মহাশক্তির আবেশে নৃত্য

একদিন মহাপ্রভু সদাশিব, বুদ্ধিমন্ত খানকে ডাকিয়া বলিলেন,—'আজ আ বন্ধনে নৃত্য করিব, (নৃত্যাভিনয়) অলঙ্কার ও সজ্জা প্রস্তুত কর। অভিনয়ে কোন অংশ গ্রহণ করিবেন তাহাও একপ্রকার স্থির হইল—প্রভু নিজে প্রকৃতিস্বরূপ হইয়া নৃত্য করিবেন, বলিলেন, যিনি জিতেন্দ্রিয় কেবল তাঁহারই আমার নৃ দেখিবার অধিকার থাকিবে। অভিনয়ের প্রস্তাবে বৈষ্ণবগণ পরমানন্দি হইয়াছিলেন, কিন্তু শেষ কথা শুনিয়া শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীবাস, একে একে সকলেই বলি লাগিলেন, 'তবে আর আমার ভাগ্যে আজ নৃত্য-দর্শন হইবে না।'

প্রভু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, তোমরাই যদি না গেলে তবে আমার নৃ

াহাকে লইয়া ? তোমরা চিন্তা করিও না. আমাকে দেখিয়া কেহই মোহ প্রাপ্ত ইবে না, ঈশ্বরপ্রসাদে আজ তোমরা মহাযোগেশ্বর হইবে।'

অভিনয়ের স্থান শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্যের গৃহ—সময় সন্ধ্যা, দর্শক সস্ত্রীক বৈষ্ণববৃন্দ বধূসহ শচীমাতা। যবনিকা উঠিল। প্রথম অঙ্কে মুখে মহা দুই গোঁফ াগাইয়া হরিদাস প্রবেশ করিলেন—তিনি বৈকুণ্ঠের কোটাল ; বৈকুণ্ঠেশ্বর আজ বদ্বীপে নৃত্য করিবেন, দ্বাররক্ষক হরিদাস ! নারদের সাজে আসিলেন শ্রীবাস— কুণ্ঠে যাঁহার অকুণ্ঠ অধিকার। পত্নী মালিনী পর্যন্ত স্বামীর অপরূপ সাজে বিস্মিতা ইয়া গেলেন।

এদিকে সাজঘরে মহাপ্রভু কাঁচুলি, শাড়ী ও অলঙ্কার পরিয়া বসিয়া আছেন— নে নাই তিনি নিমাই, মনে নাই তিনি অভিনয় করিবেন রঙ্গমঞ্চে ! মনে পড়িয়াছে মারী রুক্মিণীর কথা—সেই ভাবে বিভোর হইয়া মনে মনে পত্ররচনা করিতেছেন 'বকায় কৃষ্ণের কাছে পাঠাইবেন বলিয়া, 'শ্রুত্বা গুণান্ ভুবনসুন্দর—' হে বনমোহন পুরুষোত্তম। তোমার গুণ-শ্রবণে দাসী তোমার পদে আত্মসমর্পণ রিয়াছে—তুমি আসিয়া তাহাকে গ্রহণ কর।

দ্বিতীয় অঙ্ক—গদাধরের প্রবেশ গোপিকাবেশে, পশ্চাতে বড়াইবুড়ী-বেশে হ্মানন্দ। কিশোর সুন্দর গদাধরের গোপীনৃত্যে বৈষ্ণবকুল মুগ্ধ হইয়া রহিলেন— মন সময় আদ্যাশক্তিবেশধারী প্রভু রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করিলেন, পশ্চাতে বড়াইবেশী ভু নিত্যানন্দ।

বৈষ্ণবগণ এমনকি জননী পর্যন্ত বিস্মিত মুগ্ধ নেত্রে চাহিয়া রহিলেন. নিতে পারিলেন না—কেবল শ্রীনিত্যানন্দ পশ্চাতে থাকিয়া বুঝাইয়া দিলেন নি কে ?

অচিন্ত্য অব্যক্ত কিবা মহা যোগেশ্বরী,
ভক্তির স্বরূপা হইল আপনি শ্রীহরি,
মহামহেশ্বর হর যে রূপ দেখিয়া
মহা মোহ পাইলেন পার্বতী লইয়া।

প্রভু জগজ্জননী রূপে ও ভাবে তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া মনোহর নৃত্য করিতে গিলেন। মহাশক্তির নৃত্য হইতে লাগিল, কিন্তু ভক্তগণ বুঝিতে পারিলেন না, ান কোন স্বরূপে—রুক্মিণী, রাধা, গঙ্গা, চণ্ডী—এই প্রকাশ ! যখন প্রেমাশ্রুনীরে সিতে থাকেন তখন মনে হয় শ্রীমতী রাধিকা আবার যখন অট্ট অট্ট হাস্য রুদ্র ত্য করিতে থাকেন তখন মনে হয় মহাকালী—চণ্ডী।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত নিজ শক্তি আছে
সকল প্রকাশে প্রভু রুক্মিণীর কাছে।

প্রভু জগতে ধর্মের সমন্বয় করিতে আসিয়াছেন শক্তি ও শক্তিমানে অভেদ দেখাইতে আসিয়াছেন, তাই দেখাইলেন—কোথাও কোন ভেদ নাই, যিনি গৌর তিনি কৃষ্ণ যিনি কৃষ্ণ তিনি শক্তি যিনি শ্রীমতী তিনিই চণ্ডী এই মহাবিশ্বে অনাদি অনন্ত মহাশক্তির খেলা চলিতেছে দ্বিতীয় প্রহরের লীলায় প্রভু তাহারই এক খণ্ডাংশ অভিনয় করিলেন।

মূর্তিমতী ভক্তিস্বরূপিণী হইয়া প্রভু নৃত্য করিতেছেন—শ্রীমান পণ্ডিত দেউটি ধরিয়া সেই অপূর্ব মাতৃসুধামণ্ডিত মুখ আরও দীপ্তিমান করিতেছেন প্রভুর রূপ মাধুর্য ও ভাবের গাম্ভীর্য আর সহ্য করিতে না পারিয়া শ্রীনিত্যানন্দ মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন, ভক্তগণ স্তম্ভিত বাক্যহারা।

বধূ কোলে লইয়া জননী শচীদেবী তাঁহার নিমাইয়ের নৃত্য দেখিতে আসিয়াছিলেন—কিন্তু ইনি কে? এই কি সেই নিমাই শিশুকালে যাহার দৌরাত্ম্যে জননী অস্থির হইয়া উঠিতেন? ছবির মত ঘটনার পর ঘটনা বুঝি জননীর চোখে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল।

একদিন কোথা হইতে কুড়াইয়া আনিয়া এক কুকুরশাবক গৃহে লইয়া খেলা করিতেছে নিমাই সঙ্গে আরও কয়েকটি বালক—সকলেরই লোভ এইটির উপর কলহ লাগিয়া গেল—পরাজিত এক বালক দৌড়াইয়া গিয়া জননীকে ডাকিয়া আনিল—দেখ আসিয়া তোমার নিমাই কুকুর কোলে লইয়া কি করিতেছে। ছুটিয়া আসিয়া জননী দেখিলেন সব ঘৃণায় নাসিকা কুঞ্চিত হইল, বলিলেন, ছি ছিঃ নিমাই, ব্রাহ্মণ হইয়াও তোর এতটুকু ঘৃণা নাই—শীগগির ইহাকে ছাড়িয়া দিয়া আয়।' নিমাই সস্নেহে কুকুরশাবককে বক্ষে জড়াইয়া ধরিল ছাড়িবার কোনই লক্ষণই দেখাইল না। মাতা অগত্যা নিরস্ত হইলেন। বহু সাধ্য-সাধনায় পুত্র স্নান করিতে গেল, ফিরিয়া ফিরিয়া মায়ের দিকে চাহিয়া বলিয়া গেল, যদি কুকুর ছাড়িয়া দেওয়া হয় মায়ের আজ রক্ষা নাই।

মা সুযোগ বুঝিয়া বহুদূরে কুকুরটি ছাড়িয়া দিয়া আসিলেন—সংবাদ নিমাইয়ের কর্ণগোচর হইতে দেরী হইল না। দ্রুত স্নানান্তে পুত্র ফিরিয়া আসিল, বিশ্বাসহন্ত্রী মাতার কাণ্ড দেখিয়া আর্তচীৎকারে ধুলায় গড়াইয়া মাথা খুঁড়িতে লাগিল, শেষে বহু কষ্টে, কল্পিত দুষ্ট বালকের স্কন্ধে কুকুর চুরির অপবাদ অর্পণ করিয়া, পুনরায় কুকুর শাবকের উদ্ধারের প্রতিশ্রুতি দিয়া জননী পুত্রকে শান্ত করিলেন। ধুলায় ধূসর

গৗরকে কোলে করিয়া জননী চুমায় চুমায় ভরিয়া দিলেন। এই তাঁহার পুত্র, শুচি-াশুচি-জ্ঞানহীন পাগল। অশুচি বর্জ্জ্য হাঁড়ির উপর গিয়া বসিয়াছে কত দিন, সানার মুখখানি ভরিয়া খাইয়াছে কত মাটি, বলিতে গেলে আবার জ্ঞানীর মতো লিয়াছে, 'সর্বত্র আমার এক-অদ্বিতীয় জ্ঞান, অথবা, 'সবই তো মাটির বিকাব।' নেনী ভাবিলেন, 'তখন তো বুঝি নাই ও যে পাগল নয়?

জগন্নাথ মিশ্র তখন বাঁচিয়া, নিষ্ঠুর বিশ্বরূপ তখনও গৃহে—গঙ্গার ঘাটে পুত্রের বন্তপনার জ্বালায় অস্থির হইয়া সজ্জন ব্যক্তিরা আসিয়া মিশ্রের কাছে অভিযোগ রিলেন। কুপিত হইয়া মিশ্র ঘাটে চলিলেন, সঙ্গী এক বালক ছুটিয়া গিয়া নমাইকে জানাইল, 'লাঠি হাতে মিশ্র আসিতেছেন'। দ্রুতগতিতে জল হইতে উঠিয়া নিমাই বিদ্যুতের মত অন্তর্হিত হইল, বালক-বালিকাদেব বলিয়া গেল, পিতাকে বলিও নিমাই আজ এখনও ঘাটেই আসে নাই।' ক্রুদ্ধ মিশ্র আসিয়া দখিলেন নিমাই ঘাটে নাই, শুনিলেন আজ সে এই পথেই পা বাড়ায় নাই। তাঁহার রুদ্রমূর্তি দেখিয়া অভিযোগকারীবাই তাঁহাকে শান্ত কবিলেন, বলিলেন, মিশ্র, তুমি মহাভাগ্যবান, ঐ পুত্রকে প্রহাব করিও না, শুধু একটু দেখিয়া াখিও।'

কুণ্ঠিত মিশ্র কিছু বা কৌতূহলী হইয়া গৃহে ফিরিয়া দেখেন—

আরপথে ঘবে গেলা প্রভু বিশ্বম্ভব,
হাতেতে মোহন পুঁথি যেন শশধর।
লিখন কালির বিন্দু শোভে গৌব অঙ্গ,
চম্পকে লাগিল যেন চারিদিকে ভৃঙ্গ।

অঙ্গে স্নানেব কোনও চিহ্ন নাই, মিশ্রকে শুনাইয়া উচ্চকণ্ঠে ডাক দিল, 'মাগো, তল দাও, স্নানে যাই।' মিশ্র, শচী বিস্মিত হইলেন—বিপ্রগণ তবে কি বলিয়া গলেন?

পিতাকে দেখিয়াই পুত্র পিতাব ক্রোড়ে উঠিল। বুকেব মধ্যে দৃঢবলে চাপিয়া রিতে ইচ্ছা হয়, তবুও কঠোর সুরে মিশ্র বলিলেন, 'নিমাই, কি তোমার দুর্বুদ্ধি, কন তুমি ঘাটে সকলকে অত্যাচার কব, বিষ্ণুপূজাব অর্ঘ্য, নৈবেদ্য অপহবণ কব? ছিঃ ছিঃ, লজ্জায় দুঃখে আমি মুখ দেখাইতে পাবি না।'

সুচতুর অভিনেতার মত দুই চোখে অশ্রু ভরিয়া রুদ্ধকণ্ঠে নিমাই বলিল, 'তুমি জিজ্ঞাসা করিয়া এসো তো বাবা সব বালকদের কাছে, আমি আজ ঘাটে গিয়াছি কি না? অন্যেরা করে দুষ্টামি আর দোষ হয় আমাব?' সবেগে পিতার কোল

হইতে নামিয়া সদর্পে ঘাটের দিকে চলিল নিমাই—'বেশ! না করিয়াও যখন আমারই বদনাম, তখন আজ হইতে ঐ সমস্ত 'অব্যভাব ই আমি করিব।'

সঙ্গীদের সঙ্গে মিলিত হইয়াই নিমাই নিজ কৃতিত্বের গর্বে হাসিয়া অস্থির হইল, সঙ্গীরা ততোধিক।

বিশ্বম্ভর দেখি সবে আলিঙ্গন করি
হাসয়ে সকল শিশু শুনিয়া চাতুরী,
সবেই প্রশংসে ভাল নিমাই চতুর,
ভাল এড়াইলা আজি মারণ প্রচুর।

শচী ও জগন্নাথ বিস্মিত হইলেন, বিহ্বল হইলেন, কিন্তু পুত্রস্নেহের কাছে সমস্ত অলৌকিকত্ব মুহূর্তে ধূলিসাৎ হইয়া গেল। শচীমাতা কেন সেদিনই বুঝিলেন না—'এ পুত্র আমার নহে'। বৃদ্ধ আচার্য অদ্বৈত তাঁহার গর্ভের বন্দনা করিয়া গেলেন প্রবীণ মুরারি গুপ্ত শিশু নিমাইকে প্রণাম করিয়া গেলেন, উপনয়নের দিনে পুত্রের দেহে কাহার আবির্ভাব হইল, কাহার দিব্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়াছিল সেই নবীন বটুর দেহ? কে ঐ দেহের অভ্যন্তর হইতে বলিয়া গিয়াছিলেন, 'সাবধানে এই দেহকে রক্ষা করিও মা, আমি এখন যাই'? 'আবার কি সেই অদৃশ্য অমোঘ শক্তিই আবির্ভূত হইয়াছেন আমার পুত্রের দেহে? হায়! বক্ষ আমার বিদীর্ণ হইতেছে না, অভাগিনী আমার যে আর কেহ নাই।'

বুঝি মনে পড়ে সেই তৈর্থিক ব্রাহ্মণের কথা। কতই বা বয়স তখন নিমাইয়ের মাত্র শিশু। গৃহে বিপ্র অতিথি, সাধ্যমত রন্ধনের আয়োজন করিয়া দিলেন মাতা। ব্রাহ্মণ রন্ধন সমাপন করিয়া তাঁহার ইষ্ট বালগোপালকে অন্ন নিবেদন করিয়া ধ্যানে বসিলেন, কেহ কাছে নাই, কোথা হইতে ছুটিয়া আসিল দিগম্বর গৌর, নিবেদিত অন্ন হইতে এক গ্রাস নিয়া মুখে তুলিল। সচকিত হইয়া বিপ্র 'হায় হায়' করিয়া উঠিলেন। লজ্জায় ক্রোধে জগন্নাথ মিশ্র নিমাইকে প্রহার করিতে গেলে বিপ্র মিশ্রের হাত ধরিলেন, বলিলেন, 'মিশ্র! বালক অজ্ঞান, ইহাকে প্রহার করিয়া লাভ নাই। শ্রীকৃষ্ণ আজ আমার অন্ন ইচ্ছা করেন নাই, ফলমূল যাহা থাকে আনিয়া দাও তাহাই নিবেদন করিয়া গ্রহণ করিব। আমি পরিব্রাজক সন্ন্যাসী, ইহাতে আমার কোনও কষ্টই হইবে না।'

মিশ্র করযোড় বহু মিনতি করিলেন, প্রতিবেশীরাও সঙ্গে যোগ দিলেন, বিপ্র আবার রন্ধনে রাজী হইলেন স্থান পরিষ্কৃত হইল রন্ধনের উপকরণ প্রস্তুত, রন্ধনে অধিক বিলম্ব হইল না

এইবার মাতা দুরন্ত পুত্রকে লইয়া অপর এক বাড়ীতে চলিয়া গেলেন—সকলে মিলিয়া এইবার পাহারা দিয়া রাখিতে হইবে এই চঞ্চলকে। গৃহিণীরা বলিলেন, ‘ছি, ছি নিমাই, কোথাকার কোন ব্রাহ্মণ, তাঁহার অন্ন খাইয়াছ তুমি, তোমার জাতি নাই।’ অবোধ! নিমাই বলিল, ‘ব্রাহ্মণের অন্নে কি গোপের জাতি যায়?’ জননীগণ হাসিয়া বলিলেন, ‘পাগল!’

নিবেদিত অন্ন সম্মুখে রাখিয়া ব্রাহ্মণ আবার ধ্যান করিতেছেন, কেমন করিয়া সকলের দৃষ্টি এড়াইয়া আবার আসিল নিমাই, আবার মুখে নিয়া তুলিল আর এক গ্রাস।

ব্রাহ্মণ ললাটে করাঘাত করিয়া উঠিলেন, ‘আজ অন্ন কপালে লেখা নাই। মিশ্র অসহ্য ক্রোধে ফাটিয়া পড়িলেন, এবার আর নিমাইয়ের রক্ষা নাই। বিপ্র আবার তাঁহাকে শান্ত করিলেন। মাথায় হাত দিয়া অবনত মুখে মিশ্র বসিয়া রহিলেন। এমন সময় মূর্তিমান্ ব্রহ্মতেজ-যেন বিশ্বরূপ গৃহে আসিলেন, অতিথি বিপ্র ঐ কিশোর সুন্দর মূর্তিখানি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেলেন, বিশ্বরূপের কথায় তাঁহার অন্তর দ্রব হইয়া উঠিল।

বিশ্বরূপ সমস্ত শুনিয়া বিপ্রের চরণে পড়িলেন, ‘আপনি সাধু, আপনি মহৎ, পরোপকারই আপনার ধর্ম, আপনি কৃপা করিয়া আমার মুখ চাহিয়া অন্ততঃ আর একবার রন্ধন করুন। বিপ্র অনেক আপত্তি করিলেন, কিন্তু কেবল বিশ্বরূপের মধুর ব্যবহারে বাধ্য হইয়া আরও একবার রন্ধনে বসিলেন।

সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হইয়াছে বহুক্ষণ, গৃহস্থ ও অতিথি সকলেই অভুক্ত ক্লান্ত নিমাই রুদ্ধদ্বারগৃহে জননীর বক্ষে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। তথাপি মিশ্র বাহির হইতেও দ্বার বন্ধ করিয়া রাখিলেন, পাছে কোনও ফাঁকে পুত্র আবার বাহির হয়।

অতিথির রন্ধন সমাপ্ত হইয়াছে, গৃহে কেহই আর জাগ্রত নাই, বিপ্র আবার অন্ন নিবেদন করিলেন ; চাহিয়া দেখেন আবার সম্মুখে সেই গৌর শিশু। বিপ্র অস্থির হইয়া উঠিলেন, তখন বালক বলিল, ‘বার বার তুমিই আমাকে আহ্বান করিয়া আন, আবার আমাকেই তুমি দোষী করিতেছ কেন? আমি তোমার আহ্বান উপেক্ষা করিতে পারি না বলিয়াই বার বার আসি। দ্বাপর যুগেও আমি এমন ভাবেই তোমার অন্ন গ্রহণ করিয়াছিলাম।’

বিপ্র দেখিলেন বালক নহে, তাঁহারই ইষ্ট নীলনবঘনরূপের জ্যোতিতে দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া। আনন্দবিহ্বল বিপ্র মূর্ছিত হইয়া

পড়িলেন। শ্রীহস্তস্পর্শে চেতনা লাভ করিয়া ইষ্টের চরণ ধরিয়া সৌভাগ্যবান বিপ্র রোদন করিতে লাগিলেন, স্তম্ভিত মুখ হইতে বাক্যস্ফূর্তি হইল না।

গোপাল অন্তর্হিত হইলেন, গৌর বলিলেন, 'সাবধান, এই কথা প্রকাশ করিও না।'

বিপ্র সেই মহাপ্রসাদ লইয়া মাথায়, সর্বাঙ্গে মাখিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন, মিশ্র ও শচী বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া চাহিয়া রহিলেন বিপ্রের দিকে। পুত্র তখন গৃহে গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত। পরদিন বিপ্র চলিয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহার শিশু নিমাইয়ের বন্দনা করিয়া গেলেন কেন, মাতা তো তখন বুঝিতে পারেন নাই।

নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া আছেন মাতা শচী আর কিশোরী বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া, 'এই যে রূপের হিল্লোলে তরঙ্গিত হইয়া মহালক্ষ্মীরূপিণী নৃত্য করিতেছেন, ইনি তো আমাদের কেহ নন?

খট্টার উপরে উঠিয়া বসিয়াছেন প্রভু, আনন্দে গাম্ভীর্য পরিবেশ পরিপূর্ণ, ভক্তগণ বিহ্বল হইয়া স্তব পড়িতেছেন—

জয় জয় জগৎ জননী মহামায়া,
দুঃখিত জীবেরে দেহ রাঙ্গা পদছায়া।

* * *

জগৎস্বরূপা তুমি, তুমি সর্বশক্তি,
তুমি শ্রদ্ধা দয়া লজ্জা—তুমি বিষ্ণুভক্তি।
সবাশ্রয়া তুমি সর্ব জীবের বসতি,
তুমি আদ্যা অবিকারা পরমা প্রকৃতি।

প্রভু জগজ্জননীভাবে উদ্ভাসিত হইয়া সমস্ত ভক্তগণকে সন্তানভাবে পূর্ণ করিয়া দিলেন।

রজনী অবসান হইয়া আসিতেছে, সন্তানের ক্ষুধা মিটে নাই, 'যেই দুঃখে বৈষ্ণবেরা অরুণেরে চাহে,' কোটি পুত্রশোকের দুঃখও তাহার কাছে হার মানে।

বিশ্বম্ভর বিশ্বজননী হইয়া জনে জনে তৃষিত, অপূর্ণ ভক্ত সন্তানকে, স্তন পান করাইলেন। সেই অমৃত পীযূষধারা পান করিয়া ভক্তগণ অমৃতময় হইলেন।

অদ্ভুত, অপূর্ব রজনী প্রভাত হইল। বিশ্বজননী আবার বিশ্বম্ভর হইলেন—কিন্তু জননীর অঙ্গের অপূর্ব স্নিগ্ধ জ্যোতির প্রভা আচার্যগৃহকে ঘিরিয়া রহিল সাত দিন।

নবদ্বীপের আকাশ বাতাস মধুময় হইয়া উঠিয়াছে—'মধুবাতা ঋতায়তে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ'—সমস্তই মধু।

এক রাত্রিতে শ্রীবাসের অঙ্গনে কীর্তন চলিতেছে, অন্তঃপুর হইতে শ্রীবাসের কাছে খবর আসিল, তাঁহার অসুস্থ পুত্রের এইমাত্র প্রাণ-বিয়োগ হইয়াছে। সকলের অলক্ষ্যে শ্রীবাস অন্তঃপুরে গেলেন, শোকাহত স্ত্রী ও পরিবারের আত্মীয়জনদের বলিলেন, 'যাঁহার নাম স্মরণ মাত্র লোকে ভবসাগর অক্লেশে উত্তীর্ণ হয়, দেখ সেই ভগবান স্বয়ং আমার গৃহে নৃত্য করিতেছেন। পুত্রের পরম সৌভাগ্য, সে এই সময়ে দেহত্যাগ করিয়াছে, তাহার জন্য শোক না করিয়া আনন্দ কর।'

শ্রীবাসের স্ত্রী সদ্যোলব্ধ সন্তানশোকে বিবশা, তিনি কিছুতেই আত্ম-সংবরণ করিতে না পারায়, শ্রীবাস বলিলেন, 'যদি তোমাদের ক্রন্দনে আমার প্রভুর নৃত্যসুখ ভঙ্গ হয়, তবে আমিও আজ গঙ্গায় প্রবেশ করিব।' ক্রন্দন থামিয়া গেল। নীরবে শ্রীবাস আসিয়া কীর্তনে যোগ দিলেন, মুখের একটি রেখাও কুঞ্চিত হইল না। ক্রমে পরস্পর ভক্তগণ সকলেই এই চরম দুঃসংবাদ শুনিলেন, শ্রীবাসের দিকে বিস্মিত নেত্রে চাহিয়া দেখেন আর স্তব্ধ হইয়া যান।

কতক্ষণ পরে প্রভুর বাহ্যজ্ঞান হইল, জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আজ নৃত্যে আমি সুখ পাইতেছি না কেন? পণ্ডিতের গৃহে কি আজ কোনও বিপদ ঘটিয়াছে?'

পণ্ডিত বলেন প্রভু মোর কোন দুঃখ,
যার ঘরে সুপ্রসন্ন তোমার শ্রীমুখ।

অন্যান্যের মুখে প্রভু সমস্তই শুনিলেন, ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কতক্ষণ হয় এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে?' ভক্তগণ বলিলেন, 'আড়াই প্রহর হইয়াছে, শুধু তোমার আনন্দভঙ্গ-ভয়ে শ্রীবাস কাহারও কাছে এতক্ষণ ইহা প্রকাশ করেন নাই।'

করুণ ব্যথিত নেত্রে প্রভু শ্রীবাসের দিকে তাকাইলেন—

শুনি শ্রীবাসের অতি অদ্ভুত কথন,
'গোবিন্দ, গোবিন্দ' প্রভু করেন স্মরণ।
প্রভু বলে, হেন সঙ্গ ছাড়িব কেমতে,
এত বলি মহাপ্রভু লাগিলা কাঁদিতে।

প্রভু স্থির হইলে সৎকারের জন্য মৃত শিশুকে বাহিরে আনিয়া প্রভুর পায়ের কাছে রাখা হইল। প্রভু মৃত শিশুকে প্রশ্ন করিলেন, 'কেন তুমি এই দেহ, গেহ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে?'

মৃতদেহে ক্ষণিক প্রাণস্পন্দন দেখা দিল, শিশু উত্তর করিল, 'যতদিন নির্বন্ধ ছিল, পণ্ডিতের গৃহে আর এই দেহে ছিলাম, এখন ভোগ শেষ হইয়াছে তাই চলিলাম। প্রভু! তুমি কৃপা করিও যেন যেখানেই থাকি তোমাকে বিস্মৃত না হই।' অভূতপূর্ব

এই ঘটনায় শ্রীবাসের পরিবার ও ভক্তমণ্ডলী আনন্দবিহ্বল হইলেন। অপর তিন ভ্রাতা-সহ শ্রীবাস প্রভুর চরণে পড়িয়া বোধ হয় বা এতক্ষণের নিরুদ্ধ ক্রন্দনকে উৎসারিত করিয়া দিলেন। প্রভু শ্রীবাসকে উঠাইয়া নিবিড় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া বলিলেন, পণ্ডিত, তুমি তত্ত্ববেত্তা, শোক করিও না, তোমার এক পুত্র গিয়াছে কিন্তু আমি তো আছি? আজ হইতে, আমি নিত্যানন্দ দুই নন্দন তোমার।

ভক্তগণ হরিধ্বনি করিলেন।

কিন্তু! মধুময় নবদ্বীপে আর কি মধুধারা ক্ষরিত হইবে না? কি বলিলেন প্রভু! আমার জন্য যিনি সদ্যমৃত পুত্রের শোক পর্যন্ত তুচ্ছ করেন এমন সঙ্গ ত্যাগ করিয়া আমি কেমন করিয়া যাইব? তবে? নবদ্বীপের মানস-সরোবরে প্রস্ফুটিত ব্রহ্মকমলটির সুধা কি আর ভক্তভৃঙ্গেরা পান করিতে পারিবেন না? শৈবিক বাঞ্ছা বহির্বাসে আবৃত করি। তাহাকে লুণ্ঠন করিয়া নিবে কোন্ বিক্ত সন্ন্যাসী? প্রভু কি সন্ন্যাসগ্রহণের সঙ্কল্প করিতেছেন মনে মনে? শ্রীবাস পুত্রশোক ভুলিয়া গেলেন ভক্ত ভুলিলেন নিজেকে শচীমাতা অব্যক্ত গোপন ব্যথায় বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া চাহিয়া রহিলেন পুত্রের পানে। আর এক বহু প্রতীক্ষিত রজনীর নিঃশব্দ প্রহরে কিশোরী বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া আসিয়া লুণ্ঠিতা হইয়া পড়িলেন প্রভুর পদতলে ওগো নিঠুর প্রিয় আমার! তুমি কি আমাকে ত্যাগ করিবে?

প্রিয়াজী ও জননী

তপঃকৃশা বিরহজীর্ণা বিষ্ণুপ্রিয়া বসিয়া আছেন নির্জন গৃহ অঙ্গনে। নবদ্বীপের আকাশ পূর্ণিমা-চন্দ্রের রজতশুভ্র শীতল জ্যোৎস্নায় প্লাবিত আর তরুণী বিরহাশ্রুধারায় প্রিয়াজীর হৃদয়-মন পরিপ্লুত।

দীর্ঘ দিবসান্তে ব্রতচারিণী বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভুর শ্রীমূর্তির সম্মুখে সামান্য ভোগ নিবেদন করিয়া একমাত্র একমুষ্টি প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছেন একবার গৌর নাম জপ করেন আর একটি তণ্ডুল একটি পাত্রে রক্ষা করেন, দিনান্তে সেই তণ্ডুলে মাত্র অন্ন প্রস্তুত করিয়া নিবেদন করেন গৌরচন্দ্রের শ্রীমূর্তির উদ্দেশ্যে তার পরে গ্রহণ করেন সেই প্রসাদ।

তার পরে চলে নিশি জাগরণ, দীর্ঘ সুতার প্রতীক্ষা। কোথায় ওগো দয়িত!, তোমাকে ছাড়া বন্ধ্যা এই দিবস-রজনী আমি কেমন করিয়া কাটাই, ওগো বলো! কোথায় তুমি আমার প্রাণারাম, নয়নাভিরাম।

আজও আসিয়াছে তেমনি ব্যথাভরা দুঃসহ নিঃসঙ্গ রাত্রি। অধীর ব্যাকুল বক্ষকে দুই করে চাপিয়া ধরিয়া আর্তনাদ করিতেছেন প্রিয়াজী। আকাশ বাতাস সে শোকাবেগের তীব্রতায় স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু কোথায় প্রিয়তম গৌরসুন্দর ?

প্রিয়াজী মূর্ছিতা হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন, উত্তান নয়ন ; প্রাণের কোনও লক্ষণ নাই। তখন ধ্যানে আসিয়া দাঁড়াইলেন, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নহেন, বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণ-গৌরাঙ্গ—নদীয়ানটবর। দীঘল চাঁচর বনকৃষ্ণকেশে সে গোরাবদনখানি আবৃত, তপ্ত সুবর্ণের কান্তি, মনোহর আয়ত দুই নেত্রে করুণা ও আনন্দের ধারা, আহা অমিয় ছানিয়া কে বা এ গোরারূপখানি গড়িল গো, মরি, মরি ঐ রূপের বালাই লইয়া মরিয়াও যে সুখ !

সমাধিরসে, ধ্যানের গভীরে ডুবিয়া গেলেন প্রিয়াজী, কিশোর জীবনের ক্ষুদ্র জীবনালেখ্যখানির এক-একটি পৃষ্ঠা খুলিতে লাগিল ; দিব্য নেত্রপাতে অন্তরের মণিকোঠায় বিষ্ণুপ্রিয়া একটির পর একটি চিত্র দেখিতে লাগিলেন।

……বহু আকাঙ্ক্ষিত রাত্রি আজ আসিয়াছে, শয়নমন্দিরে প্রিয়াজী আসিয়া দেখেন সুপ্রশস্ত শুভ্র শয্যা আলো করিয়া ভুবনমোহন স্বামী তাঁহার, গভীর নিদ্রায় আচ্ছন্ন !

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়নু
পেখনু পিয়া-মুখ-চন্দা।
জীবন-যৌবন সফল করি মানলু
দশ দিশ ভেল নিরদন্দা।

আজ আমার এ কি সে সৌভাগ্যরজনী উদিত হইল, আজ প্রিয়তমের মুখচন্দ্র আমি দর্শন করিলাম। ওরে, আজ মঙ্গল আমার দ্বারে সমাগত, আজ আমার জীবন-যৌবন সফল, দশদিকে আজ তো আর কোনও দ্বন্দ্ব নাই !

সুকোমল, সুন্দর দুই অরুণরাঙ্গা পদতলে বক্ষ রাখিয়া মরিয়া যাইতে ইচ্ছা হয় কিন্তু অধীর হৃদয় দৃঢ়বলে চাপিয়া রাখিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া অতি সন্তর্পণে স্বামীর পদতলে বসিলেন—অনুরাগরঞ্জিত, দুই কম্পিত করতলে ধীরে ধীরে পরম আপন, চরম দূর স্বামীর পাদসংবাহন করিতে লাগিলেন। সারা দিবসের অব্যক্ত যন্ত্রণা, বহুমুখশ্রুত বিচ্ছেদাশঙ্কার ব্যথা আর বাধা মানিল না, কয়েক ফোঁটা তপ্ত অশ্রু গড়াইয়া পড়িল স্বামীর পায়ে।

চমকিত হইয়া প্রভু জাগিয়া উঠিলেন। সম্মুখে চাহিয়া দেখেন বিষ্ণুপ্রিয়ার চোখে অশ্রু। দুই বলিষ্ঠ অভয় বাহুর বন্ধনে ভীরু কপোতীকে বক্ষে টানিয়া নিয়া

ব্যগ্র ব্যাকুল প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন কাঁদো বিষ্ণুপ্রিয়া বলো কি তোমার দুঃখ ?'

সুতীব্র ব্যথার নিরুদ্ধ নির্ঝরিণী মুক্তি পাইল, বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভুর বক্ষে সিক্ত মুখখানি রাখিয়া বার বার চেষ্টা করিয়াও কথা বলিতে পারিলেন না। অজস্র আদরে সোহাগচুম্বনে রক্ত কিশলয়-দুটিকে মুকুলিত করিয়া পত্নীর ব্যথার যখন কিছুটা উপশম করিলেন তখন ক্রন্দনজড়িত ভীরু কোমল স্বরে প্রিয়াজী জিজ্ঞাসা করিলেন—

মাকে—আর—আর আমাকে নাকি তুমি ত্যাগ করিবে—হাঁগো ?

চতুরশিরোমণি হাসিয়া উঠিলেন ও। এই কথা ? কে তোমার কাছে এই মিথ্যা সংবাদ দিল ? না না আমি তোমাকে ছাড়িয়া কোথাও যাইব না।'

ছলনার জাল পাতিয়া আদর-সোহাগের প্লাবন বহাইয়া বিষ্ণুপ্রিয়াকে প্রভু ভুলাইলেন। শিশিরসিক্ত যূথীর মতো দেবী সুপ্ত হইয়া উঠিলেন, কিন্তু তবুও অন্তরের গভীরে সেই ব্যথার কাঁটার তীক্ষ্ণাগ্র বিঁধিতে লাগিল বার বার।

বধূ বলিলেন ওগো আমি বড় ছোট, আমি বালিকা, আমাকে তুমি ভুলাইও না। সত্য বলো এখনও তুমি আমাকে ত্যাগ করিবে না—'

সত্যসুন্দর বিপদে পড়িলেন এবার মুখ গম্ভীর হইল বলিলেন, যদি যাইতে হয়, যদি সংসার ত্যাগ করিতে হয় কোনও দিন, তবে তিনি জানাইয়াই যাইবেন।

তবে ? তবে তুমি যাইবেই ? ব্যাকুল আতঙ্কে বিস্ফারিত দুই নয়ন মেলিয়া উঠিয়া বসিলেন বধূ। প্রভু করুণ-হাস্যে বলিলেন, যাইতে তাঁহাকে হইবেই। কৃষ্ণ বিনা অধন্য এ দিন রজনীকে সফল করিতেই হইবে। কে পতি, কেই বা পত্নী, কিসের এই সংসার ? কৃষ্ণই জীবের একমাত্র গতি, সাধন কৃষ্ণ, সাধ্য কৃষ্ণ! প্রভু কৃষ্ণান্বেষণে বাহির হইবেন বিশ্বের বিস্তৃত প্রাঙ্গণে আর বিষ্ণুপ্রিয়াকে থাকিতে হইবে নবদ্বীপের গৃহ-অঙ্গনে, নবদ্বীপের জননীরূপে। প্রভুর সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষা লইতে হইবে প্রিয়াজীকেও কিন্তু তাহা গৃহে।

ভীতা কিশোরী স্বামীর পদতলে লুটাইয়া পড়িলেন, আলুলায়িত কেশপাশে জড়াইয়া ধরিলেন প্রভুর পদদ্বয় 'না গো না, তুমি যাইও না, তুমি গেলে মা তো বাঁচিবেন না। আমাকে ত্যাগ করিবে তুমি আমিই তোমার সংসার ? তবে তাই হোক্। গঙ্গায় কি জল নাই প্রভু ? অভাগিনীর স্থান কি তাহাতে হইবে না ? তোমার সন্ন্যাসের বালাই লইয়া আমি গঙ্গায় প্রবেশ করিব, তবু তুমি মায়ের কাছে গৃহে থাকো।

প্রভু ডাকিলেন, বিষণ্ণ করুণ সে সুর, 'উঠ বিষ্ণুপ্রিয়া ! কে তুমি, কে আমি ? একবার চাহিয়া দেখ, তাকাও তোমার অন্তরে, সত্যস্বরূপকে দেখ, তোমার নাম সার্থক করো বিষ্ণুপ্রিয়া, জগৎপতি বিষ্ণুর পত্নী হও।'

অশ্রুসজল দুই নয়ন মেলিয়া প্রিয়াজী চাহিয়া দেখেন, সম্মুখে নাই তাঁহার ভুবনমোহন গৌরাঙ্গসুন্দর, আছেন নবীন নীরদ শ্যাম চতুর্ভুজ বিষ্ণু—"ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্", বিষ্ণুপ্রিয়া বিষ্ণুর চরণে প্রণাম করিলেন, যুগল হস্তের অঞ্জলি মেলিয়া প্রার্থনা করিলেন, 'হে অনাদি, অনন্ত, বিশ্বাতিগ, বিশ্বাতীত ! প্রসন্ন হও, আশীর্বাদ করো বিষ্ণুপ্রিয়ার পতিপ্রেম অক্ষুণ্ণ থাকুক, তুমি অগম্য, অসীম, মহা-ঐশ্বর্যের তুমি অধীশ্বর ; বিষ্ণুপ্রিয়া তোমাকে প্রণতি জানায়, কিন্তু তোমাকে সে চাহে না প্রভু, তাহার শান্ত সুন্দর পতির প্রেমেই সে সার্থক হইবে, তাঁহাকে ফিরাইয়া দাও প্রভু !'

এমনি করিয়াই ঐশ্বর্য পরাভূত হয় মাধুর্যের কাছে।

একদিন বৃন্দাবনে সংকেতকুঞ্জে শ্রীকৃষ্ণ সখীসহ শ্রীমতীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। মনে কি হইল নিজেই জানেন কি না কে জানে ? হঠাৎ ষড়ৈশ্বর্যময় বিষ্ণুরূপে কুঞ্জের দ্বারে দাঁড়াইলেন—শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম লইয়া চারিটি ভুজ প্রকাশিত হইল।

কয়েকটি সখী আসিতেছিলেন আগে, এই চতুর্ভুজ মূর্তি দেখিয়া সখীরা হাসিয়া অস্থির, 'এ আবার কি নূতন রঙ্গ, কোন নূতন ঢং, দূর করো তোমার ঐ দুই ভুজ।'

দূরাগত পদ্মগন্ধ ভাসিয়া আসিল কৃষ্ণের নাসিকায়, বুঝিলেন শ্রীমতীর অঙ্গগন্ধ, শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মসহ দুই অতিরিক্ত ভুজ যে কোথায় লুকাইল, কোথায় বা ঐশ্বর্য গেল মিলাইয়া !

'গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর দ্বিভুজ শ্যামসুন্দর দাঁড়াইলেন কুঞ্জের দ্বারে শ্রীমতীর অভ্যর্থনা-মানসে।

চতুর্দশী কিশোরী বিষ্ণুপ্রিয়া, কিন্তু বিষ্ণুমায়া তাঁহাকেও অভিভূত করিতে পারিলেন না, ত্রস্ত লজ্জায় নিজেই লুকাইলেন দূরে। গৌরাঙ্গসুন্দর যেন বা লজ্জিত মস্তক নত করিয়া দাঁড়াইলেন প্রিয়াজীর বক্ষের কাছে। বলিলেন, 'বিষ্ণুপ্রিয়া ! তুমি কি শুনিতে পাও না, জগৎ যে গভীর ব্যথায় কাঁদে ? শোন নাই কি নিপীড়িত ধরণীর আর্তনাদ ? আমাকে যাইতে দাও, একবার আমাকে কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া কাঁদিতে দাও ! ওগো প্রিয় আমার, এ গুরু বেদনার ভার তুমি ছাড়া আর কে বহিবে বলো ! অনুমতি দাও বিষ্ণুপ্রিয়া !' ছল ছল চোখে মিনতি করিতে লাগিলেন প্রভু !

প্রিয়াজী বলিলেন, 'তুমি যাও, জগতের ব্যথা হরণ করো, কিন্তু আমাকে তোমার সঙ্গে লও প্রভু। বৈদেহী কি রামের সঙ্গে বনে যান নাই, সত্যবানের সঙ্গে সাবিত্রী? আমি তো তোমাকে ছাড়া আর কাহাকেও জানি না। তোমার সেবার অধিকারটুকু আমার কাড়িয়া নিও না প্রভু।

প্রভু কাঁদিয়া উঠিলেন—'ওরে অবুঝ ওরে আমার প্রিয় তাহা তো হয় না। তোমাকে সঙ্গে লইলে আমার যে সন্ন্যাস করা হয় না বিষ্ণুপ্রিয়া। সন্তানশোকতাপিতা বৃদ্ধা জননী রহিলেন গৃহে, আর রহিলে অনাঘ্রাত কুসুমকলিকা আমার তরুণী গৃহলক্ষ্মী তুমি। আমি কাঁদিব হা কৃষ্ণ বলিয়া তোমরা কাঁদিবে 'হা গৌর" বলিয়া, আর আমাদের কান্নার অতল সমুদ্রে তখনই ডুবিবে জগৎজন। নইলে কেউ যে কাঁদে না বিষ্ণুপ্রিয়া। আমার সহধর্মিণী তুমি, আমার ধর্ম আমার সন্ন্যাসব্রত, আমার বিরহের ভার তুমিও গ্রহণ করো। ঐ বিরহব্যথার সূত্রে গাঁথা হইয়া রহিলাম তুমি আর আমি, কে আমাদের বিচ্ছিন্ন করিবে প্রিয়া?

প্রিয়াজী মুখ তুলিলেন, ত্যাগের মহিমায় মহিমান্বিতা শুভ্রপ্রেমময়ীর দুই চোখ হইয়া আসিল স্নিগ্ধজ্যোতির্ময়। বলিলেন 'বেশ তবে তাই হোক, তুমি স্বতন্ত্র ইচ্ছাময়, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্। আমার জীবনের শ্রেষ্ঠধন আমার প্রাণের প্রাণারাম আমি সমর্পণ করিলাম বিশ্বের কাছে বিশ্বের কাজে তোমার বিরহব্যথার ভার গ্রহণ করিলাম আমি।

মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূমিতলে লুটাইয়া পড়িলেন প্রিয়াজী। প্রভু সে ব্যথাতুর কোমলতনুখানি বক্ষে রাখিয়া ধীরে ধীরে কানের কাছে মুখ রাখিয়া ডাকিতে লাগিলেন, 'উঠ। বিষ্ণুপ্রিয়া। চোখ মেল ওগো দেখ আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে।

ব্যথার রজনী প্রভাত হইল। জননী শচী বধূর মুখপানে চাহিয়া আতঙ্ক আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিলেন—'তবে কি বহুজনের ইঙ্গিতে অর্দ্ধভাষণে যে কথা শুনিয়াও শুনি নাই, চারিদিকে যে অমঙ্গলচিহ্ন দেখিয়াও দেখি নাই তাহাই কি শুনিতে হইবে আজ সেই চরম অমঙ্গলই কি ঘটিবে আমার?

উন্মাদিনী জননী ছুটিয়া গেলেন নিমাইয়ের কাছে—'নিমাই, নিমাই।

'কি মা?' কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন পুত্র মলিন মুখ সজল চোখ। জননী বার বার পুত্রমুখপানে চাহিতে লাগিলেন, কম্পিত কণ্ঠে ডাকিলেন, 'নিমাই। সত্য কথা বল বাপ। তোর মুখ কেন মলিন, বৌমা আমার কাঁদে কেন? বল ওরে কি আছে আমার ভাগ্যে, শোনা আমাকে।

কণ্ঠ ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছে, চোখে অশ্রু উচ্ছ্বসিত হইতে চায়, তবু বলিতে হইবে, বলিতেই হয়! বিশ্বজগতের ভার যাঁহাকে বহিতে হয় তাঁহার সংসারকে বলি দিতেই হয় বারে বারে।

নিমাই জননীর রিক্ত তৃষিত বুকে মাথা রাখিলেন—'মাগো ছেলে বড় হইলে, উপযুক্ত হইলে বিদেশে কি ধন উপার্জন করিতে যায় না? তারপর সেই উপার্জিত ধন আনিয়াই তো পিতামাতার সেবা করে! আমিও দেশে দেশে উপার্জন করিতেই যাইব, মা সে বড়ো পরমধন—কৃষ্ণপ্রেমধন! আমাকে অনুমতি দাও মা; সে পরমধন উপার্জন করিয়া আনি, আনিয়া তোমাকেও সে ধনে আমি ধনী করিব।'

'ওরে, না রে না—আমার সকল ধনের ধন এই আমার বুকেই আছে, আর কোনও ধন আমি চাই না, বাপ! হাঁরে নিষ্ঠুর! তোর দাদা বিশ্বরূপ যে ধন আনিতে গেল, ফিরিয়া আসিয়াছে কি সে? কোন্ ধন সে আমাকে আনিয়া দিল; শুধু বুকভরা আঘাত? তুই কাহাকে আনিয়া ধন দিবি নিমাই? চাহিয়া কি দেখিস না এই বুকে কি আছে আর শুধু কাঁটার আঘাতের ক্ষত ছাড়া? তুই চলিয়া গেলে তবুও কি এই নির্লজ্জ হৃদয় ভাঙ্গিয়া যাইবে না?' জননীর অঝোরঝরা অশ্রুধারায় নিমাইয়ের অঙ্গ ভাসিয়া গেল। আরও সুদৃঢ় আলিঙ্গনে জননী ঢাকিয়া রাখিলেন বুকের মাণিককে, ঐ বুঝি কে হরণ করিয়া নিয়া যায়!

নিমাই মায়ের পায়ে পড়িলেন, আকুল ক্রন্দনজড়িত কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, 'মা গো! কৃষ্ণকে না পাইলে আমি যে বাঁচিব না! কৃষ্ণবিরহে আমার প্রাণত্যাগ হোক, তাহাই কি তুমি চাও মা?'

শিহরিতা মাতা অস্ফুট কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, 'ষাট্ ষাট্, উঠ নিমাই, আমার জীবনধন! তুমি সুখী হও।'

'তবে অনুমতি দাও মা! আমি কৃষ্ণের অন্বেষণে যাই, আর তাহা যদি না দাও তবে তোমার দেওয়া এই দেহ-প্রাণ তোমারই পদতলে বিসর্জন দিই! কেন মা আজ এত অধীর হইলে, যুগে যুগে পৃশ্নি, অদিতি, কৌশল্যা, দেবকীরূপে তুমিই তো আমার জননী ছিলে। যুগে যুগেই তো আমার বিরহব্যথার সুতীব্র আঘাত সহিয়াও তুমি আমাকে উৎসর্গ করিয়াছ বিশ্বেরকল্যাণে। কে তুমি, তুমি কি তাহা বুঝিয়া বিচার করিয়া দেখিবে না মা?'

মাতা স্তব্ধ হইলেন; মনে হইল, 'সত্যই তো, কে আমার পুত্র—এ তো বিশ্বম্ভর!' উজ্জ্বল দুই নয়ন মেলিয়া চাহিয়া দেখিলেন নিমাইয়ের পানে, আশা-আশঙ্কার অপরূপ দ্যুতি খেলিতেছে সেই মুখে, কিন্তু ভগবৎতেজে সে বরবপুখানি

উদ্ভাসিত, জ্যোতির্ময়। কম্পিত দক্ষিণ করতল পুত্রের মাথার উপর রাখিলেন জননী ; বলিলেন, 'তুমি সুখী হও নিমাই ! তোমার ব্রত পূর্ণ হোক।' আবার কণ্ঠ নিরুদ্ধ হইয়া আসিল, বলিলেন 'আমার কি ? আটটি কন্যা হারাইয়াছি পর পর, বিশ্বরূপ চলিয়া গিয়াছে, পাষাণে বুক বাঁধিয়া আছি শুধু তোমার দিকে চাহিয়া ! আজ তুমিও যাইবে, যাও। এ প্রাণ যদি ফাটিয়া নাও যায় তবুও বসুন্ধরা ফাটিয়া যাইবেন, তাহাতে প্রবেশ করিয়া সকল জ্বালা আমি জুড়াইব, কিন্তু ঐ যে অনির্বাণ দীপশিখাটি গৃহে আনিয়া জ্বালাইয়াছি, ঐ যে ম্লানমুখী স্বর্ণপ্রতিমা তাহাকে কি করিব ?'

'তুমি তাহাকে দেখিবে, আর সে দেখিবে তোমাকে, আর যিনি সর্বদ্রষ্টা সেই কৃষ্ণ দেখিবেন তোমাদের দুজনকেই ; বলো মা আমাকে অনুমতি দিলে ?'

'হ্যাঁ দিলাম'।

জননীও মূর্ছিতা হইলেন।

সন্ন্যাস

নদীয়ার গৌরপ্রেমসাগরে ভাবতরঙ্গে জোয়ার আসিয়াছিল, এবারে আসিয়াছে ভাঁটার টান।

'আমার সুখে, তোমরা কি সুখী হও না ? আমার ব্যথায় তোমাদের বুকও কি ভাঙ্গিয়া যায় না ? তবে কেন আমার অন্তরতমগণ। আমাকে তোমরা বাঁধিয়া রাখিতে চাও ? কৃষ্ণবিরহে আমার যে প্রাণ বাহির হইয়া যাইতে চায়, কোন্ বাঁধনে তাহাকে বাঁধিবে ভাই ?' আকুল প্রভু কাঁদিতে লাগিলেন জনে জনে ভক্তের হাতে ধরিয়া।

শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, মুরারি, মুকুন্দ হরিদাস প্রভৃতি ভক্তগণ বসিয়া আছেন নতনেত্রে, বিষণ্ণ, ভয়ব্যাকুল বদনে, কি উত্তর দিবেন তাঁহারা প্রভুকে ? কি করিবেন তাঁহারা ? প্রাণপতির বিচ্ছেদে প্রাণ তাঁহাদের বাহির হইয়া যাইবে, কিন্তু কেমন করিয়া রোধ করিবেন প্রভুর এই মত্ত বিরহধারার গতিবেগ ? কৃষ্ণমিলন-সাগরসঙ্গমের উদ্দেশে ছুটিয়াছে যে উদ্দাম স্রোতস্বিনী কোন্ শক্তি বা বাধা তাহার গতিরোধ করিবে ?

'তবু !' ব্যাকুল অনুনয়ে বলিলেন ভক্তগণ, 'প্রভু, নিজের হাতে এক শিশুবৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলে, সবে সে বৃক্ষে কয়েকটি তরুণ পল্লব মাত্র মেলিয়াছে—আজ

সেই নবপত্রাঙ্কুরান্বিত শিশুটিকে তুমি মূলে ধ্বংস করিবে? তোমার ইচ্ছা হইলে তাহাও কর, কিন্তু তোমার শোকশীর্ণা বৃদ্ধা জননী আর সংসার অনভিজ্ঞা তরুণী পত্নীর কি করিবে প্রভু?

'ওগো আমার প্রাণের বান্ধববৃন্দ! তোমরা গৃহে বসিয়া কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণকীর্তন কর, তাহাতেই আমাকে পাইবে। বিষ্ণুপ্রিয়া, জননী বা তোমরা যখন যেখানেই ভক্তিভরে কৃষ্ণকে ডাকিবে সেখানেই আমাকে দেখিতে পাইবে! আমি কি তোমাদের ছাড়া? এখন তোমরা আমাকে বিদায় দাও—আমার প্রকৃত বান্ধবের কাজ কর।'

নবদ্বীপের আকাশে দীপ্ত মধ্যাহ্নগগনের আলো কি নিভিয়া আসিয়াছে? কিসের এ দুর্ভেদ্য অন্ধকার?

সংকীর্তনের মধুর ধ্বনি থামিয়া গেল, যে সুরতরঙ্গ একদিন সুরলোক ভেদিয়া গোলোক স্পর্শ করিয়াছিল, আজ সে সুর 'হা হা রবে' দিগন্ত ভরিয়া তুলিল।

বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন জননীর কাছে, ম্লান হাসিমুখে; জননীও গোপন অশ্রু মুছিয়া ফেলিয়া বধূকে টানিয়া আনিলেন বুকের কাছে। দুঃসহ সমব্যথার দহনে, দুইটি শোকধারার মিলিত স্রোতে, দুইটি রমণীহৃদয় এক নিবিড়তর বন্ধনে যেন পরস্পর আরও সন্নিবিষ্ট হইয়া গেল, কিন্তু বাহিরে দুইজনেই টানিয়া দিলেন ছদ্মহাস্যের এক আবরণ। হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হোক, সুকঠোর দহনে অন্তর দগ্ধ হোক, তবুও হাসি ফুটাইতে হইবে মুখে, 'একজনকে দেখিবেন আর একজন।'

নবদ্বীপে পাখী আর গান করে না, ফুল আর ফোটে না, আকাশে সূর্য তারকা চন্দ্র আর হাসে না, সম্মুখে অতলস্পর্শী অন্ধকার, নবদ্বীপ উৎকণ্ঠিত, আতঙ্কবিহ্বল!

প্রভু দেখিলেন শোকাচ্ছন্ন নদীয়ার এই নবরূপ। ভয়ঙ্কর এই স্তব্ধতা তাঁহার সুকোমল অন্তরখানি দলিত মথিত করিয়া দিল। ভাবিলেন—'বিদায় তো লইতেই হইবে, কিন্তু তাহার পূর্বে হাসি ফুটাইতে হইবে মাতার মুখে, প্রিয়ার মুখে, ভক্তের মুখে।'

এখন আর মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত হইয়া যায় না, ম্লান বিবস মুখে জননীকে আর পুত্রের প্রতীক্ষা করিতে হয় না, উৎকণ্ঠিতা বিষ্ণুপ্রিয়ার দুরুদুরু বক্ষের কম্পন লইয়া বার বার আর ঘর-বাহির করিতে হয় না। প্রভু সময়মত গৃহে আসেন, আহার করিতে বসিয়া কতো বা কথা হয় মায়ের সঙ্গে, 'সংসারের কিসে উন্নতি হইবে, কি করিলে মাতা সুখী হইবেন।' মাঝে মাঝে আবার অব্যর্থ কৌতুকলক্ষ্যে বিঁধিতে

থাকেন দ্বারান্তরালবর্তিনীকে, কখনও বা করকঙ্কণের মধুর গুঞ্জনে ভাসিয়া আসে মৃদু প্রতিবাদ। মাতা মুখ টিপিয়া হাসেন, বধূর গুণের কথা বর্ণনা করিয়া পুত্রের মন বধূর প্রতি আরও আকর্ষণের চেষ্টা করেন। অদূর ভবিষ্যতের একটি সুন্দর চিত্র আঁকেন মনে মনে।

বিষ্ণুপ্রিয়ার বক্ষও পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে সুধারসে। অতন্দ্র রজনীর ব্যর্থ প্রহরগুলি আর কাঁদিয়া মরে না, আপন নিভৃত শয়নমন্দিরে ধরা দেন ধ্যানের দেবতা, বন্ধ্যা রজনী সফল হইয়া উঠে।

নিত্য নবতর উৎসাহে, বিচিত্রতর সজ্জায় সজ্জিতা করিয়া লাজনম্রমুখী প্রিয়াজীকে মাতা পুত্রের কাছে পাঠাইয়া দেন। প্রভাতে অলক্ষ্যে এক-একবার বধূর প্রেমরোমাঞ্চিত মুখখানির পানে তাকাইয়া আনন্দে, আশ্বাসে শূন্য হৃদয়খানি ভরিয়া উঠে।

মৃতপ্রায় ভক্তগণ জননীর মুখের দিকে চাহিয়া যেন আশ্বাস পান, তবে কি প্রভু সংসাররসে মগ্ন হইলেন? আর তবে ভয় নাই।

নবদ্বীপে আবার সাড়া জাগিল, অবহেলিত মৃদঙ্গ-মন্দিরা আবার বাজিয়া উঠিল মধুর স্বরে, আবার সংকীর্তনের ধ্বনিতে আকাশ বাতাস উঠিল ভরিয়া।

সেদিন সন্ধ্যাকালে দরিদ্র শ্রীধর, ভক্তোত্তম শ্রীধর একটি লাউ লইয়া আসিয়াছেন—গাছের প্রথম ফল, প্রভুসেবার মানসে।

প্রভু বলিলেন, 'মা, পায়স রান্না করিয়া ঠাকুরকে ভোগ দাও, কি সুন্দর কচি লাউটি।'

'দুধ কোথায়?' উৎকণ্ঠিতা হইলেন জননী, নিজের মুখে জানাইয়াছে পায়সের কথা, পাগল ছেলে। এখন কি করি।

এমন সময় এক ভক্ত দুধ লইয়া উপস্থিত হইলেন। পায়স প্রস্তুত হইল, শ্রীকৃষ্ণের কাছে নিবেদিত হওয়ার পর পরম সন্তোষে প্রসাদ গ্রহণ করিলেন প্রভু। জননীর তৃপ্তির সীমা রহিল না।

পান হাতে লইয়া বিষ্ণুপ্রিয়া গৃহে আসিলেন। গৌর উঠিয়া বধূকে কাছে টানিয়া আনিলেন, আজ নিজের হাতে সজ্জিত করিবেন প্রিয়াকে।

রাশি রাশি ফুল-চন্দন কোথায় ছিল, কোথায় বা ছিল সুন্দর বসন-ভূষণ আভরণ, স্বামী কোথা হইতে আনিলেন কে জানে?

আনন্দে, গৌরবে বিষ্ণুপ্রিয়ার ক্ষুদ্র বক্ষখানি ফাটিয়া যাইতে চায়, 'ওগো এত সুখ আমার সহিবে কি?'

নিজ হস্তে এইমাত্র যাঁহাকে অলকা-তিলক-চন্দনচর্চিতা, কুসুম-রত্নাভরণ-সজ্জিতা ও মধুগন্ধা করিয়া তুলিলেন, অপলক নেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন পতি! আপনার সুন্দরতম সৃষ্টিটিকে যেমন বার বার ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখিয়াও তৃপ্তি হয় না, তেমনি প্রভুর নয়নেরও যেন সে রূপসুধাপানে তৃপ্তি হইতেছিল না। 'ওরে ভীরু হৃদয় আমার! অধীর হইও না, উচ্ছল হইও না, স্থির হও'—প্রিয়স্পর্শ শিহরিতা আনন্দবিহ্বলা বিষ্ণুপ্রিয়া আবেশে দুই নয়নকমল মুদ্রিত করিলেন, মধুরসে পরিপূর্ণ হৃৎকমলটি লইয়া অর্ঘ্য দিলেন স্বামীর পায়ে,—'মধু মধু! সর্বত্রই মধু! আকাশ বাতাস কি আজ মধুগন্ধী, বৃক্ষ কি আজ মধু ক্ষরণ করিতেছে!'

ধীরে ধীরে নয়ন মেলিলেন প্রিয়াজী, ধীর সলজ্জ কণ্ঠে জানাইলেন ভীরু প্রার্থনাটি, যে প্রার্থনা নিশিদিন অন্তরের অন্তরে গুমরিয়া মরে। প্রতিদিন গদাধর বা অন্যান্য ভক্তরাই সজ্জিত করেন প্রভুকে, অন্তরাল হইতে প্রিয়াজী শুধু চাহিয়াই দেখেন। আজ যদি সৌভাগ্যরজনীর উদয় হইয়াই থাকে তবে আজ প্রিয়াজী সজ্জিত করিবেন তাহার প্রিয়তমকে।

প্রভু আনন্দে হাসিয়া সম্মত হইলেন। বসন-ভূষণ-মাল্যচন্দনে সে বরতনুখানি যখন সজ্জিত হইল, সে অনুপম লাবণ্যঘন গোরা তনুখানির দিকে মুগ্ধ নির্নিমেষ নয়নে তাকাইয়া রহিলেন প্রিয়াজী—এই ভুবনমোহন, নয়ন-রঞ্জন, পরমসুন্দর—ইনি আমার, ইনি কি আমার?'

পরস্পরের রূপমুগ্ধ দুই তরুণ-তরুণী এক অখণ্ড প্রেমরসে ডুবিয়া গেলেন, শাশ্বত সে প্রেমের সৌন্দর্য, মাধুর্য ও সৌগন্ধ্যে গৃহতল ভরিয়া উঠিল, স্বামীর অভয় বলিষ্ঠ দুই বাহুতে মাথাটি রাখিয়া শুইলেন বিষ্ণুপ্রিয়া,—কতো কথা, কতো গান! ধীরে রজনী শেষ প্রহরের দিকে চলিয়া পড়িল, সুগভীর আনন্দে প্রিয়াজীও ঢলিয়া পড়িলেন নিদ্রার ক্রোড়ে।

রজনী অবসানপ্রায়, অবসান সংসারের লীলা, আর সময় নাই; প্রিয়ার ললাটে একটি মৃদু চুম্বন রাখিয়া প্রভু সন্তর্পণে উঠিলেন। প্রিয়াজীর মাথাটি উপাধানে ন্যস্ত করিয়া নিঃশব্দে শয্যাত্যাগ করিলেন।

রুদ্ধ দ্বার খুলিয়া, নীরবে আসিয়া দাঁড়াইলেন নিদ্রিতা জননীর রুদ্ধ গৃহের সম্মুখে। জননীর চরণরেণুজড়িত দ্বারপ্রান্তে মাথা ঠেকাইয়া নিঃশব্দ দ্রুতচরণে চলিলেন সন্ন্যাসের পথে। মাঘ মাসের গভীর শীতের তন্দ্রাচ্ছন্ন রাত্রির তমসা পার হইয়া চলিলেন উন্মুক্ত বিশ্বের সূর্যালোকের উদ্দেশে।

জাহ্নবীর হিমশীতল জলে প্রভু আবক্ষ নিমগ্ন হইলেন, সন্তরণে পার হইয়া উঠিলেন অপর তীরে।

'বিদায়—বিদায়—জননী, জন্মভূমি, জাহ্নবী—বিদায়! কৃপা করিয়া অনুমতি দাও মা তোমরা, আমার যাত্রা সফল হোক। আমার সকল চাওয়া, সকল খোঁজা সার্থক হোক্। অপরিশোধ্য ঋণে ঋণী আমি তোমাদের কাছে; কৃপা কর, কৃষ্ণপ্রেমধন লাভ করিয়া আমি যেন আনিয়া দিতে পারি তোমাদের কাছে।'

দ্রুত অধীর চরণে চলিলেন নদীয়ার নিমাই, সর্বহারা শচীমাতার আঁধার ঘরের মাণিক, বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণারাম, ভক্তগণের প্রাণধন, কাটোয়ায় কেশবভারতীর উদ্দেশ্যে।

· তীব্রতম বেদনার আঘাতে ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল, সমাধি হইতে ব্যুত্থিতা হইলেন বিরহিণী বিষ্ণুপ্রিয়া!—'কোথায় তুমি ওগো নিষ্ঠুর দয়িত? তুমি কোথায়? আর কি তুমি আসিবে না?'

আবার মূর্ছিতা হইলেন বিষ্ণুপ্রিয়া, রজনীর তন্দ্রাহারা মধ্যযামে নবদ্বীপের আকাশে স্তব্ধ তারাগুলি রহিল জাগিয়া।

নীলাচলের পথে

শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী ব্রজধামে আসিয়াছেন, ব্রজের ধূলা অঙ্গে-অঙ্গে মাখিয়া গিরিগোবর্ধন পরিক্রমান্তে আসিয়া বসিয়াছেন গোবিন্দকুণ্ডের তীরে।

অযাচক বৃত্তি, ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হইলেও কাহারও কাছে ভিক্ষা করিবেন না, কাজেই উপবাসী।

তখন দিনান্তের ক্লান্ত রবি অস্তাচলের দিকে যাত্রা করিয়াছেন, ব্রজের গোধূলি, আকাশের রক্তিম রাগ শ্রীপাদের অন্তরে নবোঢ়া রাইকিশোরীকেই স্মরণ করাইয়া দিতেছে, আবেগে আঁখি-দুইটি হইতে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে, পুরী ডুবিয়া আছেন ধ্যানের গভীরে। এমন সময় কিশোর কণ্ঠের আহ্বান কানে গেল —'পুরী! মাধবেন্দ্রপুরী!' বাঁশীর মতো সুর অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করিল, দুই ধ্যাননিমীলিত নয়ন মেলিয়া পুরী চাহিয়া দেখেন, সম্মুখে দাঁড়াইয়া নবঘনশ্যামসুন্দর এক কিশোর গোপবালক, হাতে দুগ্ধভাণ্ড!

বালক বলিল, 'গোঁসাই মাগি কেন নাহি খাও, কিবা কর ধ্যান! ধর! এই দুগ্ধ পান করিয়া উপবাস ভঙ্গ কর।'

বালকের রূপমাধুর্যে ও কণ্ঠস্বরের সুধায় বিরক্ত সন্ন্যাসীর অন্তর স্নেহসিক্ত হইয়া উঠিল। বলিলেন, 'বালক, তুমি কে? তুমি কেমন করিয়া জানিলে আমি উপবাসী?' চঞ্চল পদে চলিয়া যাইতে যাইতে বালক বলিল, 'ঐ যে দেখা যায়, ঐ গ্রামে আমি থাকি। তুমি সারাদিন না খাইয়া এইখানে ধ্যান করিতেছ, ব্রজবাসীরা তোমাকে দেখিয়া গেলেন কি না—তাই তাঁহারাই এই দুধ দিয়া আমাকে পাঠাইয়াছেন। আমাদের গ্রামে আসিয়া তুমি না খাইয়া থাকিবে, তাই কি হয়? নাও, দুধটা পান করিয়া ভাণ্ডটি রাখিয়া দিও। আমি এখন যাই, আমার অনেক কাজ, পরে আসিয়া ভাণ্ডটি লইয়া যাইব।'

পুরীর চোখের ক্ষুধা, মনের তৃষ্ণা কিছুই মিটিল না, বালক ত্রস্তপদে চলিয়া গেল।

সন্ধ্যাবন্দনা সমাপনান্তে পুরী অমৃতাস্বাদী সেই দুগ্ধ পান করিয়া, ভাণ্ড লইয়া বসিয়া রহিলেন বালকের প্রতীক্ষায়। ধ্যানে মন সমাহিত হইতে চায় না, কেবলই যেন বালকের পদধ্বনি কানে আসে। কিন্তু রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিল, বালক আসিল না। রাত্রিশেষে হতাশ পুরীর ক্লান্ত নয়নে সামান্য তন্দ্রার আবেশ হইল, আর সেই তন্দ্রার মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল সেই বালক, রূপের প্রভায় দিগন্ত উজ্জ্বল করিয়া কাতরকণ্ঠে বলিল, 'পুরী! কাঁটার কুঞ্জে, কাঁটার আঘাতে, গ্রীষ্মের প্রখর তাপে আমি ক্ষত-বিক্ষত-দগ্ধ হইতেছি, আমিই গিরিগোবর্ধনধারী গোপাল, ম্লেচ্ছভয়ে সেবকেরা আমাকে ফেলিয়া কবে পলাইয়া গিয়াছে। সেই হইতে আমি তোমার আশায় বসিয়া আছি, আমাকে তুমি উদ্ধার কর, এই কাঁটার কুঞ্জ হইতে বাহির কর।' হাসিয়া-কাঁদিয়া পুরী অস্থির হইলেন, ললাটে করাঘাত করিয়া নিজেকে ধিক্কৃত করিতে লাগিলেন বার বার।

প্রত্যুষেই পুরী গ্রামে চলিয়া গেলেন। মুহূর্তে গ্রামে গ্রামান্তরে বার্তা রটিয়া গেল। কুঞ্জ হইতে বহু কষ্টে, বহু যত্নে গোপালকে বাহিরে আনিয়া তখনই স্নান, পূজা, নানা উপচারে, আভরণে শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা হইল, হইল সেবার ব্যবস্থা, নানা আয়োজন।

পুরী বৃন্দাবনে গোপালের সেবানন্দে আত্মহারা হইয়া আছেন। আবার এক রাত্রিতে স্বপ্নে গোপাল আদেশ করিলেন, 'পুরী! এতকাল কাটার আঘাতে, রৌদ্রতাপে আমি ক্ষত-বিক্ষত-দগ্ধ হইয়াছি, আমার দহনজ্বালা কমে না। তুমি উড়িষ্যা হইতে মলয়জ চন্দন আনিয়া আমার অঙ্গে লেপন কর, তবেই আমি শীতল হইব।'

নিঃসম্বল পুরী পরদিনই সমস্ত পথকষ্ট ও বিপদের আশঙ্কা অগ্রাহ্য করিয়া যাত্রা করিলেন সুদূর উড়িষ্যার পথে। বহুদিন ভ্রমণের পরে উড়িষ্যার রেমুণা নামক স্থানে আসিয়া উপনীত হইলেন।'

"তারপর।" নবীন সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বলিতে লাগিলেন সেই অমৃতময়ী কথা শ্রীপাদ নিত্যানন্দ, মুকুন্দ, দামোদর ও জগদানন্দের কাছে। গুরুর গুরু শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর কৃষ্ণপ্রেমের ও পুরীর প্রতি কৃষ্ণবাৎসল্যের বর্ণনা করিতেছেন প্রভু, নীলাচলের পথে রেমুণার গোপীনাথের মন্দিরে।

জননী শচী ও বধূ বিষ্ণুপ্রিয়ার বক্ষের ধন, নবদ্বীপের প্রাণ গৌর আজ পথের ভিখারী, পথে পথে ঘুরিতেছেন দণ্ডকমণ্ডলু-হাতে। মাত্র কয়দিন আগে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন কাটোয়ার শ্রীপাদ কেশব ভারতীর কাছে। অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী ভারতীরও চোখে আসিয়াছিল জল সন্ন্যাসের কঠোর শিক্ষা হইতে বাঁচাইতে চাহিয়াছেন এই সুন্দর কিশোরটিকে। কিন্তু চোখের জলের মিনতি দিয়া সন্ন্যাসীকে দ্রব করিলেন প্রভু। সন্ন্যাস দিতে ভারতী সম্মত হইলেন।

দীর্ঘ কৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশদাম হাতে লইয়া নাপিত আর্তস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন—ওগো নিদয় আমাকে কেন এই নিষ্ঠুর কাজের জন্য আর কি নাপিত নাই?'

নিমাইও কাঁদিয়া উঠিলেন—'ওগো আমার কর্মপথের বন্ধ। তুমি দয়া করিয়া এই কেশের বন্ধন হইতে আমাকে মুক্তি দাও।

কুঞ্চিত কালো কেশে পথের ধূলা আবৃত হইয়া গেল, গঙ্গায় অবগাহন করিয়া সিক্ত বসনে, মুণ্ডিত নতমস্তকে আসিয়া দাঁড়াইলেন গৌর, কাটোয়ার অগণ্য নরনারী অসহ্য ব্যথায় বক্ষ চাপিয়া নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলেন। স্বপ্নশ্রুত মন্ত্র ভারতীর কর্ণে দিয়া ভারতীর কাছে সন্ন্যাস প্রার্থনা করিলেন গৌর। প্রজ্বলিত হোমানল শিখায় একে একে আপনার নাম, রূপ পরিচয় আহুতি হইয়া গেল। ভারতী 'তত্ত্বমসি' মহামন্ত্র কর্ণে দান করিলেন হস্তে দিলেন অরুণরাঙা দুইখণ্ড বহির্বাস ও কৌপীন,—'আজ হইতে তুমি আর নবদ্বীপের গৌর নও তুমি সর্বজীবের চৈতন্য-স্বরূপ, সেই অখণ্ড সনাতন পরমপুরুষ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।'

নবীন সন্ন্যাসী ক্রন্দিত নরনারীর দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, তারপরে লুটাইয়া পড়িলেন পথের ধূলায়। বলিলেন, 'আশীর্বাদ কর, আমি যেন কৃষ্ণপ্রেম লাভ করি।' গুরুর পায়ে প্রণাম রাখিয়া গৌর ছুটিয়া চলিলেন, রাধাভাবে বিভোর হইয়া, বৃন্দাবনের পথে। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ তিন দিবসের উপবাসে ক্লিষ্ট, পথশ্রান্ত হইয়াছেন, কিন্তু কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত প্রভুর কোনও ক্লেশ, কোনও বেদনাবোধ নাই,

কৃষ্ণবিরহের প্রচণ্ড তাপে আর সমস্ত দুঃখ কোথায় গিয়াছে মিলাইয়া। তাই নিত্যানন্দের নির্দেশে যে ব্রজের পথ ত্যাগ করিয়া শান্তিপুরের পথে চলিতেছেন, সে খেয়ালও প্রভুর নাই!

চলিয়াছেন বৃন্দাবনের পথে কিন্তু শ্রবণে কেন কৃষ্ণনাম প্রবেশ করিতেছে না? (দুর্ভাগ্য রাঢের মুখে কৃষ্ণনাম নাই!) নিত্যানন্দ এক সুযোগে রাখাল বালক-কয়েকটিকে ডাকিয়া কৃষ্ণনাম শিখাইলেন। বালকেরা প্রভুর কাছে কৃষ্ণনাম করিতে লাগিল। প্রভু নিত্যানন্দের ছলনায় ভুলিলেন, ভাবিলেন ব্রজ নিকটবর্তী, তাই, ব্রজের রাখালদের অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া মহানন্দে মগ্ন হইলেন। সম্মুখে প্রবাহিতা জাহ্নবী, নিত্যানন্দ বলিলেন, 'জাহ্নবী নহে, যমুনা।' প্রভু ঝাঁপ দিলেন, সম্মুখে চাহিয়া দেখেন শুষ্ক কৌপীন-বহির্বাস-হস্তে নৌকায় দাঁড়াইয়া শ্রীঅদ্বৈত আচার্য। প্রভু বিস্মিত হইলেন—'একি! বৃন্দাবনে কখন কিরূপে আসিলেন আচার্য?' অশ্রুজড়িত কণ্ঠে শ্রীঅদ্বৈত বলিলেন, 'ওগো! তুমি যেইখানে, সেইখানেই বৃন্দাবন, এসো দীনের গৃহতল পুণ্য কর চরণধূলি দানে।'

আচার্যগৃহে আনন্দবারিধি কল্লোলিত হইয়া উঠিল, গ্রাম গ্রামান্তর, দূর-দূরান্তর হইতে আসিতে লাগিলেন সহস্র সহস্র দর্শনার্থী। নবদ্বীপ হইতে বালক, বৃদ্ধ নরনারী সকলেই আসিতে লাগিলেন।

নবদ্বীপে নিত্যানন্দ গিয়াছেন প্রভুর বার্তাবহ হইয়া, ভক্তগণ দলে দলে প্রস্তুত মাতা শচীর দোলা প্রস্তুত, নিত্যানন্দ মাতাকে লইয়া যাইবেন। জননী দোলায় উঠিবেন, দীর্ঘ অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকিয়া, ভূষণ শিঞ্জন করিতে করিতে আসিয়া জননীর আঁচল ধরিয়া দাঁড়াইলেন কিশোরী, বিরহিণী বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া। নিতাই কাঁদিয়া উঠিলেন—'মাগো! তুমি গৃহে যাও। নিষ্ঠুরের কাছ হইতে আমি তোমার যাওয়ার অনুমতি লইতে পারি নাই।

জননী ফিরিয়া দাঁড়াইলেন, কোমল বিহঙ্গীকে বক্ষে নিবিড় করিয়া ধরিয়া চলিলেন গৃহের দিকে,—'চাই না, আমিও চাই না তাহাকে দেখিতে।

কিশোরী কল্যাণী অবগুণ্ঠিতা বধূ জননীর আঁচল ছাড়িয়া দিলেন, অশ্রুসিক্ত নয়নকমল তুলিয়া ধরিলেন জননীর মুখে, বলিলেন, 'না মা তুমি যাও। আমি যে তাঁহার প্রিয়তম, তাই এই চরমতম আঘাতও আমারই, মাগো এ তো ত্যাগ নয়, এ যে পরম গ্রহণ!'

ভক্তগণসহ শচীমাতা চলিলেন শান্তিপুরের পথে, আর নবদ্বীপের শান্তিহীন শূন্য গৃহতলে লুটাইয়া পড়িলেন দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া।

শান্তিপুরে জননীর স্নেহ-ছায়াতলে, ভক্তমণ্ডলীর প্রেমে, প্রভু কয়েকদিন বিশ্রাম করিলেন। তারপর জননীর অনুমতি ও আদেশ লইয়া চলিলেন নীলাচলের পথে। হাহাকার করিয়া ধূলায় পড়িলেন বৃদ্ধা জননী, শান্তিপুরের পথপ্রান্তে আসিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন বৃদ্ধ আচার্য, সন্ন্যাসী ফিরিয়া চাহিলেন না। সঙ্গী হইলেন শুধু চারজন, শ্রীপাদ নিত্যানন্দ, মুকুন্দ, দামোদর, জগদানন্দ।

আজ এই চার সঙ্গীসহ প্রভু রেমুণায় পৌঁছিয়াছেন, সঙ্গীদের কাছে বলিতেছেন—

মাধবেন্দ্র পুরীর কথা অকথ্য কথন
মেঘ দরশন মাত্র হন অচেতন।

"তারপর —প্রভু বলিতে লাগিলেন, 'এই সেই রেমুণা, এই সেই গোপীনাথ মলয়জচন্দন সংগ্রহের পথে এইখানেই আসিয়া একদিন উপস্থিত হইলেন মাধবেন্দ্র পুরী। রেমুণার গোপীনাথ বিগ্রহ জাগ্রত দেবতা, কত তাঁহার পূজার আয়োজন কত বা সেবার রাজসমারোহ। পুরী গোস্বামী মন্দিরের দ্বারে যুক্তকরে দাঁড়াইয়া অশ্রুঅর্ঘ্য গোপীনাথের পায়ে নিবেদন করিতেছেন। দেখিলেন বিগ্রহের সম্মুখে দ্বাদশ মৃৎপাত্রপূর্ণ ক্ষীরভোগ নিবেদিত হইয়াছে। পুরী শুনিয়াছেন, এই অমৃতকেলি ক্ষীরভোগ, যাহা গোপীনাথের অগ্রে নিবেদিত হয় পৃথিবীতে কোথাও এইরূপ অপূর্ব বস্তু আর নাই। হঠাৎ মনে হইল, এই প্রসাদের এক কণামাত্র যদি একবার আস্বাদন করিতে পারিতেন তবে বৃন্দাবনে তাঁহার গোপালকে তিনিও এইরূপ ক্ষীর ভোগ দিতেন।

কিন্তু এই সামান্যমাত্র বাসনার উদয়েই পুরী গোস্বামী লজ্জা ও অনুশোচনায় মরমে মরিয়া গেলেন। 'শ্রীবিষ্ণু' স্মরণ করিয়া ঐটুকু বাসনা উদয়ের জন্যও নিজেকে ধিক্কৃত করিয়া নিষ্কিঞ্চন সন্ন্যাসী মন্দির ত্যাগ করিয়া এক জনহীন হাটে গিয়া বসিয়া নাম করিতে লাগিলেন।

গভীর রাত্রি, রেমুণা নিস্তব্ধ, গোপীনাথের মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ, পূজারী নিদ্রিত। গোপীনাথ নিদ্রিত পূজারীকে স্বপ্নে ডাকিয়া জাগাইলেন, বলিলেন, তাঁহার ধড়ার আঁচলের তলায় এক পাত্র ক্ষীর তিনি লুকাইয়া রাখিয়াছেন, তাহা এখনই নিয়া হাটে মাধবেন্দ্রপুরী গোস্বামীকে যেন অর্পণ করা হয়।

পূজারী দ্রুত ব্যস্ত পদে মন্দিরের দ্বার উন্মুক্ত করিলেন। বিগ্রহের ধড়ার আঁচল সরাইয়া দেখেন, সত্যই এক পাত্র ক্ষীর আঁচলের আড়ালে সযত্নে রক্ষিত রহিয়াছে,

অথচ ভোগ সরাইবার সময় পূজারী তাহা জানিতে পারেন নাই। বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে পূজারী চাহিয়া রহিলেন—'ইহাও কি সম্ভব, কে সেই মহাসৌভাগ্যবান মাধবেন্দ্রপুরী, যাঁহার জন্য গোপীনাথ তথা জগতের নাথ কে চুরির আশ্রয় লইতে হয় ?'

পূজারী সেই মহাপ্রসাদ মাথায় করিয়া হাটে গিয়া ডাকিলেন—'কোথায় গো মাধবেন্দ্রপুরী! কে তুমি পরম সৌভাগ্যবান অন্তরঙ্গ ভক্ত! আসিয়া গ্রহণ কর, তোমার জন্য নিজ হাতে চুরি করিয়া ক্ষীর রাখিয়াছেন গোপীনাথ!'

উঠিয়া আসিলেন মাধবেন্দ্রপুরী, 'হে কৃষ্ণ! দীনদয়াল! অধমতারণ! এই অধমের প্রতি তোমার এত দয়া!' কাঁদিতে কাঁদিতে পুরী অঞ্জলি ভরিয়া সেই প্রসাদ গ্রহণ করিলেন, মাথায় বক্ষে মুখে সে অমৃত মাখিয়া অমৃতময় হইয়া উঠিলেন।

রাত্রিশেষে পুরী গোস্বামী রেমুণা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, প্রতিষ্ঠা আর লোক জানাজানির ভয়ে। কিন্তু হাটের মাঝে গোপীনাথের চুরির খবর রাষ্ট্র হইতে বিলম্ব হইল না। সহস্র লোকে গোপীনাথের চুরির কথা শুনিলেন। মুখে মুখে কুখ্যাতি (!) বাড়িয়া নাম হইল 'ক্ষীরচোরা গোপীনাথ'। কিন্তু তাহাতে গোপীনাথ এতটুকু লজ্জিত হইলেন না, চুরি করা যে কত কালের অভ্যাস! লোকে জানুক, ধরা পড়ুন, বন্ধন হোক, তবুও কি অভ্যাস ছাড়া যায় ?

দীর্ঘপথশ্রম পুরীকে নিরস্ত করিতে পারিল না। বহু যত্নে বহু চন্দন, কর্পূর সংগ্রহ করিয়া যখন প্রত্যাবর্তনের পথে রেমুণায় আসিয়া গোপীনাথের সম্মুখে দাঁড়াইলেন, গোপীনাথ পুরীর দিকে চাহিয়া ওষ্ঠ-অধর কুঞ্চিত করিয়া একটুখানি সলজ্জ মৃদু হাসি হাসিলেন।

রাত্রিতে বৃন্দাবনে পুরীর প্রতিষ্ঠিত গোপাল পুরীকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া আদেশ করিলেন, 'পুরী! তোমার সংগৃহীত চন্দন এই রেমুণার গোপীনাথের সেবাতে উৎসর্গ কর, তাহা হইলেই আমি শীতল হইব। আর তোমাকে কষ্ট করিতে হইবে না।' ভক্তের পথকষ্ট, গুরুভার চন্দন বহনের দুঃখ আর ভগবান সহ্য করিতে পারিলেন না, ভক্তের আকুল আগ্রহচন্দনেই শীতল হইলেন গোপাল।"

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু বলিলেন—

নিত্যানন্দ করহ বিচার,
পুরী সম ভাগ্যবান জগতে নাহি আর।

'যাঁহাকে প্রত্যক্ষ দর্শন দিয়া গোপাল দুগ্ধ পান করাইলেন, যাঁহার চেষ্টায় কাঁটার বন হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া বৃন্দাবনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, যাঁহার জন্য স্বয়ং ক্ষীর চুরি করিয়া 'ক্ষীরচোরা গোপীনাথ' নামে (কু!) খ্যাত হইলেন, স্বপ্নে গোপাল

যাঁহাকে তিনবার দর্শন দিলেন, যাঁহাব শ্রমভার লাঘব করিবার জন্য রেমুণাতেই চন্দন পরিয়া তৃপ্ত হইলেন, সেই মহাপ্রেমী, মহাসাধকের ভাব কেমন করিয়া আমরা বুঝিব বলো ?'

এত কহি পড়ে প্রভু তাঁর কৃত শ্লোক।
যেই শ্লোক চন্দ্র জগৎ কর্যাছে আলোক॥

পুরীর সুদীর্ঘ জীবনের সাধনা সমাপ্তপ্রায়, সিদ্ধির আর ক্ষণমাত্র বাকী! পুরীব অন্তিমকাল। শিয়রে প্রিয়তম শিষ্য শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরী বসিয়া গুরুর অন্তর্ধান-আশঙ্কায় বেদনাতুর!

শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর বাহ্যজ্ঞান নাই, কিন্তু ভিতরে চলিতেছে লীলার দর্শন! শ্রীকৃষ্ণ ব্রজভূমি ত্যাগ করিয়া মথুরায় চলিয়া গিয়াছেন, ধুলায় পড়িয়া স্বর্ণলতিকা রাধিকা কাঁদিতেছেন, আকুল বিরহক্রন্দনে আকাশ বাতাস ভারাতুর!

অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে
মথুরানাথ কদাবলোক্যসে
হৃদয় ত্বদলোককাতরং
দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্—

'ওগো দীনের শরণ দুঃখহরণ! অন্তর বিরহদহনে জীর্ণ হইয়া যাইতেছে, বলো কি করিব ওগো ?'

বিরহিণী রাধিকার তীব্র আর্তি ও তপ্ত অশ্রু চোখে লইয়া পুরী এই শ্লোক উচ্চারণ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিলেন। শেষ নিঃশ্বাসটির সঙ্গে সঙ্গে এতদিন শ্রীমতীর বিরহ-উৎস হইতে যে-ধারাটি সযত্নে অন্তরে গোপনে রক্ষা করিয়াছিলেন তাহা প্রিয়তম, যোগ্যতম শিষ্য শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া গেলেন।

তারপর? আর কিছু বলিতে পারিলেন না প্রভু। নিরুদ্ধ প্রেমের আবেগে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন গোপীনাথের দ্বারপ্রান্তে।

শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরী ভগীরথের মতো এই বিরহগঙ্গাধারা লইয়া বহু দেশে ভ্রমণ করিলেন, কিন্তু সঙ্গমের আশা মিটিল না, সাগরের সন্ধান পাইলেন না।

তৎকালীন ভারতের প্রায় সর্বত্রই ছিল শুষ্ক অসার জ্ঞানচর্চা, প্রকৃত জ্ঞানীর সংখ্যা বিরল ছিল আর ভক্তি ছিল বাহ্যিক বিধি-বিধানে সীমাবদ্ধ, ঐশ্বর্যজ্ঞানজনিত বৈধী ভক্তির সাধকই তখন বেশী। দক্ষিণ ভারতে কিছু ভক্তিমার্গী সাধক ছিলেন, তাঁহারা 'আলোয়ারগণ'। তাঁহারা মাধুর্যেরই সাধক। কিন্তু তাঁহাদের প্রেমের সমাপ্তি ঘটিত মিলনে, রাধাবিরহের সুগভীর মাধুর্য ও তীব্রতার সন্ধান তাঁহারা পান

নাই। রাধিকার মিলন হইতেও যে বিরহের চমৎকারিতা অনেক বেশী, তাঁহারা সে সন্ধান পান নাই।

জীব হ্লাদিনীস্বরূপা, আনন্দস্বরূপা শ্রীমতীরই অংশ, কিন্তু ভগবানের সঙ্গে অনাদি কাল হইতেই জীবের বিচ্ছেদ। যেইদিন কোনও ভাগ্যবান জীব এই বিচ্ছেদের কথা বুঝিতে পারেন সেইদিন হইতেই আরম্ভ হয় তাঁহার বিরহজ্বালা, 'সেই' প্রেমার আস্বাদন, তপ্ত ইক্ষু চর্বণ, মুখ জ্বলে, না যায় ত্যজন। সেই প্রেমা যার মনে, তার বিক্রম সেই জানে বিষামৃতে একত্রে মিলন॥'

শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী এই বিচ্ছেদের সন্ধানই জীবকে দিয়া গেলেন।

ভ্রমণ করিতে করিতে ঈশ্বর পুরী আসিলেন গয়াধামে, বিষ্ণুপদতীর্থে! বিষ্ণুপদে প্রণাম করিয়া যখন উঠিয়া দাঁড়াইলেন, সম্মুখে চাহিয়া দেখেন—

ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি
অবনী বহিয়া যায় রে।

—এক পরমসুন্দর গৌর তরুণ অশ্রুধারায় বিষ্ণুচরণকমল সিক্ত করিয়া দিতেছেন। পুরী চমকিত হইলেন, এই কি সেই রাধারসসমুদ্রের মোহানা?

অশ্রুসিক্ত দুই কমলনয়ন ঊর্ধ্বে তুলিয়া সেই তরুণ গৌরাঙ্গসুন্দর ঈশ্বর পুরীর দিকে চাহিলেন, সমুদ্র উচ্ছ্বসিত হইল, অপন তরঙ্গভঙ্গে পুরীর পায়ে পড়িলেন নিমাই, কাতর করুণ কণ্ঠে দীক্ষা প্রার্থনা করিলেন। পুরী গোস্বামী আপনবক্ষে রক্ষিত গুরুদত্ত সেই সঞ্জীবনী রসধারাটিকে গৌরসাগর-সঙ্গমে মিশাইয়া দিয়া চলিয়া গেলেন নিরুদ্দেশের পথে।

আরম্ভ হইল মহাপ্রকাশ—নবদ্বীপের নিমাই পণ্ডিতের সমস্ত রূপ, যৌবন, পাণ্ডিত্য, ঐশ্বর্য, সংসার তুচ্ছাতিতুচ্ছ হইয়া গেল। রাধিকার সত্তায় রূপান্তরিত হইয়া মহাপ্রভু চলিলেন নীলাচলের পথে। জীবনের শেষ দ্বাদশ বৎসর চলিল সেই বিরহের আস্বাদন, লোকচক্ষুর অন্তরালে গম্ভীরার নিভৃত ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে, কেবল স্বরূপ ও রামরায়ের সঙ্গে। এই দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসরের প্রতিটি মুহূর্ত যে অসহ্য তীব্র ব্যথা ও কষ্টে কাটিয়াছে তাহার বর্ণনা কেহই করিতে পারে নাই, করিতে গিয়া লেখনী স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে।

কি সে দুঃসহ বিরহব্যথা যাহার দহনে দেহের অস্থিসন্ধিগুলি পর্যন্ত কখনও বিচ্ছিন্ন কখনও কূর্মাকৃতি হইয়া গিয়াছে। প্রতি লোমকূপ হইতে রক্তধারা ক্ষরিত হইতেছে, মুখে লালা, গলায় ঘর্ঘর শব্দ, জীবনের আশা মাত্র নাই, হয়তো পথেই পড়িয়া রহিলেন বা সমুদ্রের জলেই ডুবিয়া রহিলেন

ঘণ্টার পর ঘণ্টা, তথাপি বিরাম নাই, তথাপি এই বিরহজ্বালার অবসান যেন নাই।

অন্তরঙ্গ স্বরূপ, রামরায়, সেবক গোবিন্দের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে; 'প্রভু! প্রভু!' কানের কাছে মুখ নিয়া হাহাকার করিতেছেন, কিন্তু প্রভু কোথায়? ইনি তো দশম দশায় পতিতা কোমল লতিকা, বিরহতাপদগ্ধা রাধিকা।

মহাপ্রভুর সাক্ষীগোপাল দর্শন

গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসং শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ং স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্॥—গীতা ৯।১৮

যিনি অনাদি অনন্ত, অব্যয় পরমাত্মস্বরূপ, যিনি সাংখ্যের নির্লিপ্ত পুরুষ, তিনিই জীবের গতি প্রভু, বন্ধু, আশ্রয় ও সাক্ষী। শ্রুতি যাঁহাকে বলিয়াছেন—

নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্।
দিব্যো হ্যমূর্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ॥

তিনিই আবার ভক্তের ভগবান, শরণাগতবৎসল, ভক্তের গতি, প্রভু। ভক্তের কাছে কেবল সাক্ষী অর্থাৎ নিরপেক্ষ দ্রষ্টারূপে থাকিবার সাধ্য তাঁহার নাই। ভক্তের যোগক্ষেম রক্ষা করিবার জন্য মাথায় করিয়াও বোঝা বহন করিতে হয়, ভক্তকে মিথ্যার অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়ানো সাক্ষীর মতোই সাক্ষ্যও তাঁহাকে দিতে হয়, শুধু নির্বাক নিষ্ক্রিয় সাক্ষী-স্বরূপ হইয়া থাকিবার উপায় থাকে না।

সন্ন্যাসের পরে নীলাচলের পথে প্রভু চলিয়াছেন। আর বেশী দূরে নয় নীলাচল। প্রভুর যেন আর বিলম্ব সহিতেছে না, দ্রুত অগ্রসর হইতেছেন।

পথে রেমুণার ক্ষীরচোরা গোপীনাথ দর্শন করিয়া কটকে আসিয়াছেন সাক্ষী-গোপাল দর্শনের আশায়। মন্দিরে গোপালের সম্মুখে গৌর আসিয়া দাঁড়াইলেন—

গোপালের আগে যবে প্রভুর হয় স্থিতি
ভক্তগণ দেখে যেন দোঁহে এক মূর্তি,
দোঁহে একবর্ণ, দোঁহে প্রকাণ্ড শরীর
দোঁহে রক্তাম্বর, দোঁহার স্বভাব গম্ভীর।
মহা তেজোময় দোঁহে কমল নয়ন,
দোঁহার ভাবাবেশ মন, চন্দ্র বদন।

দোঁহা দেখি নিত্যানন্দপ্রভু মহারঙ্গে।
ঠারাঠারি করে হাসে ভক্তগণ-সঙ্গে।—চৈতন্য ভাগবত

একজন কৃষ্ণবর্ণ, আর একজন রাধাকান্তি দ্বারা আচ্ছাদিত গৌরবর্ণ, ভিতরে একই বর্ণ, একই ভাব, একই রস ; কে কাহাকে দর্শন করিতেছেন, কে কাহার রসে মগ্ন হইতেছেন কে জানে? শ্রীপাদ নিত্যানন্দ দুই বিগ্রহের অপূর্ব সাদৃশ্যের দিকে ইঙ্গিত করিয়া মুকুন্দাদির দিকে তাকাইলেন, পরমানন্দে সকলেই নীরবে হাস্য করিতে লাগিলেন।

প্রভু প্রকৃতিস্থ হইলে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ সাক্ষীগোপালের ইতিকথা ও মহিমা বর্ণনা করিতে লাগিলেন—'বহুকাল পূর্বে বিদ্যানগব হইতে তীর্থদর্শন মানসে দুই বিপ্র পথে বাহিব হইয়াছেন। পথেই পরিচয়—একজন ধনী, মানী, কুলশ্রেষ্ট, তিনি বড়ো বিপ্র ; আর একজন ধনহীন, মানহীন, কুলহীন, ছোট বিপ্র। দুইজনেই পবম ভক্ত। দুইজনে একসঙ্গে চলিতে চলিতে তীর্থরাজ ব্রজধামে উপস্থিত হইলেন। পরমানন্দে দর্শনাদি চলিতেছে, অকস্মাৎ বড়ো বিপ্র অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। আপনাকে সম্পূর্ণ অসহায় ভাবিয়া আকুল হইয়া পড়িলেন বড়ো বিপ্র। কিন্তু দুইহাত ভরিয়া আশ্বাস ও শান্তি লইয়া পাশে আসিয়া দাঁড়াইলেন ছোট বিপ্র। তাঁহাব নিঃস্বার্থ নিপুণ সেবায় বড়ো বিপ্র শীঘ্রই সুস্থ ও নিরাময় হইয়া উঠিলেন। কৃতজ্ঞতা ও স্নেহে দ্রবীভূত হইয়া বড়ো বিপ্র প্রতিজ্ঞা করিলেন, দেশে ফিবিয়াই তিনি আপন কন্যাকে ছোট বিপ্রের হস্তে সমর্পণ করিবেন। ছোট বিপ্র নিজেব সামাজিক মর্যাদা ও ধনের অভাবের কথা জানেন, তাই তিনি বড়ো বিপ্রকে এই অসম্ভব প্রতিজ্ঞা হইতে নিবৃত্ত করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিলেন ; কিন্তু আপন আত্মজাকে পাত্রস্থ করিবাব সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তাঁহার আছে মনে করিয়াই বড়ো বিপ্র আপন প্রতিজ্ঞায় অটল রহিলেন। গোপাল-মূর্তির সম্মুখেই এই প্রতিজ্ঞা তিনি করিলেন।

ছোট বিপ্র জানেন, দেশে ফিরিলে বড়ো বিপ্র কিছুতেই এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করিতে পারিবেন না। তাঁহার আত্মীয়-স্বজন কিছুতেই ইহাতে সম্মত হইবেন না, অধিকন্তু ছোট বিপ্রই সকলেব নিকটে মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হইবেন। তাই নিরুপায় হইয়া গোপালকেই তিনি সাক্ষী মানিলেন, বলিলেন, 'আমাব আর তো কেহ নাই, এই অসম্ভব বাক্যের সাক্ষী তুমিই রহিলে গোপাল, ব্রাহ্মণের বাক্য যাহাতে রক্ষা পায় তাহা তুমি দেখিও আর আমাকেও যেন মিথ্যার জালে জড়াইতে না হয় তাহাও দেখিও, প্রয়োজন হইলে আমি তোমাকে সাক্ষ্য দিতে ডাকিব ইহা মনে রাখিও।'

তীর্থ ভ্রমণান্তে দুই বিপ্র দেশে ফিরিলেন। বড়ো বিপ্র আপন প্রতিশ্রুতির

কথা ভুলেন নাই! তিনি স্ত্রী-পুত্রকে যখন তীর্থবাক্যের কথা জানাইলেন তখন তাঁহারা একেবারে বিহ্বল, বিমূঢ় হইয়া গেলেন। এই অসম্ভব কার্যের প্রতিবাদে গৃহ মুখর হইয়া উঠিল এবং স্ত্রীপুত্র বিষপানে প্রাণত্যাগ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। একদিকে সত্যরক্ষা অপর দিকে স্ত্রীপুত্রের প্রাণরক্ষা, বড়ো বিপ্র পরম সঙ্কটে পড়িয়া বিপদভঞ্জনকে ডাকিতে লাগিলেন। অবশেষে যেন একটি রফা হইল, পুত্রগণ বড়ো বিপ্রকে নির্বাক থাকিতে স্বীকৃত করাইলেন।

বহু দিন কাটিয়া গেল। বড়ো বিপ্রের কোনও সাড়া না পাইয়া ছোট বিপ্র একদিন তাঁহার প্রার্থনা লইয়া আসিয়া দাঁড়াইলেন। প্রতিশ্রুতি স্মরণ করাইয়া দেওয়া মাত্রই বড়ো বিপ্রের পুত্রগণ তাঁহাকে গালাগালি করিয়া প্রহার করিতে উদ্যত হইলেও বড়ো বিপ্র পুত্রভয়ে নির্বাক হইয়াই রহিলেন, তাঁহার অন্তর দগ্ধ হইয়া যাইতেছিল কিন্তু সত্য উচ্চারণ করিবার সাধ্য মাত্র তাঁহার ছিল না।

তাঁহার অবস্থা ছোট বিপ্র বুঝিতে পারিলেন, তিনি গ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে আহ্বান করিয়া আনিয়া যখন সমস্ত ঘটনা বলিলেন তখনও বড়ো বিপ্র নীরব। কেবল একবার মাত্র বলিলেন, 'আমার কিছুই স্মরণ নাই'। পুত্রগণ এই সুযোগেরই অপেক্ষা করিতেছিল, উত্তেজিত স্বরে তাহারা বলিয়া উঠিল, 'আমাদের বৃদ্ধ পিতাকে বিদেশে একলা পাইয়া এই ধূর্ত ধুতুরা খাওয়াইয়া পাগল করিয়া কি কথা আদায় করিয়াছে তাহার কি মূল্য? মূর্খ, অধম, অকুলীন এই ব্যক্তির কাছে সুস্থ দেহ-মনে আমার পিতা কন্যাদান করার কথা বলিতে পারেন ইহাও কি সম্ভব?' 'অসম্ভব। অসম্ভব একবাক্যে সভাগৃহ এই কথাই তারস্বরে ঘোষণা করিল। ক্বচিৎ কেহ বা ছোট বিপ্রের মুখের দিকে চাহিয়া সত্যের প্রকাশ দেখিতে পাইলেন, কিন্তু প্রমাণ ছাড়া ঐ সত্য স্থাপনের কোনও উপায়ই দেখিতে পাইলেন না। ছোট বিপ্রের ক্ষীণ স্বর সভার কোলাহলে ডুবিয়া গেল। কেবল একবার যখন তিনি বৃন্দাবনের গোপালকে সাক্ষী মানার কথা বলিলেন, তখন পুত্রগণ উৎফুল্ল মুখে বলিয়া উঠিল, 'ভালো কথা, সাক্ষী আনা হোক, তখন সত্য মিথ্যা বুঝা যাইবে, তারপরে কন্যাদান করিতে হয় নিশ্চয়ই আমরা করিব।' পরম স্বস্তি ও নিশ্চিন্ত নিঃশ্বাস ফেলিয়া বিপ্রের পুত্রগণ গৃহে ফিরিল। কলিকালে প্রতিমা যে সাক্ষ্য দিতে আসিবেন না ইহা তাহাদের জানা।

ক্ষুণ্ণ ক্ষুব্ধ মনে ছোট বিপ্র চলিয়াছেন বৃন্দাবনের পথে। বিবাহ হইল না। দুঃখ ইহা নয়, ব্রাহ্মণের তীর্থবাক্য রক্ষিত হইল না, অন্তর বিদীর্ণ হইতে লাগিল সেই অপরাধের গুরুত্বে। তিনি বুঝিলেন, তিনি যেমন নিরুপায় বড়ো

বিপ্রও তাহাই। কাজেই বড়ো বিপ্রের ধর্মরক্ষার জন্য তিনি অধিকতর ব্যাকুল হইলেন।

দীর্ঘ পরিক্রমান্তে ছোট বিপ্র বৃন্দাবনে উপস্থিত হইলেন। মন্দিরে গোপালের সম্মুখে দাঁড়াইয়া এতক্ষণে অন্তরের নিরুদ্ধ ব্যথা উৎসারিত হইল, বলিলেন, 'তুমিই অগতির গতি, তুমিই শরণাগতপালক, তুমি সত্যদ্রষ্টা, তুমিই আমার একমাত্র সাক্ষী—

ব্রহ্মণ্যদেব! তুমি বড় দয়াময়।
দুই বিপ্রের ধর্ম রাখ হইয়া সদয়॥—
কন্যা পাব—মনে মোর নাহি এই সুখ।
ব্রাহ্মণের প্রতিজ্ঞা যায় এই বড় দুখ॥
এত জানি সাক্ষী তুমি দেহ দয়াময়।
জানি সাক্ষী না দেয় যেই তার পাপ হয়॥—চৈঃ চঃ

হে ব্রহ্মণ্যদেব! জানিয়াও যদি সাক্ষ্য না দাও তবে পাপ তোমাকেও ছাড়িবে না! তুমি সত্যস্বরূপ, কাজেই ব্রাহ্মণের সত্যরক্ষার দায়িত্ব তোমারই।'

গোপাল মনে মনে হাসিলেন—'সত্যস্বরূপ তো বটেই, তবে বেশীদিনের কথা তো নয়, এই বৃন্দাবনেই যে কতো সত্য কথা বলিয়াছেন তাহা তো নিজের জানা। ভাগ্য ভালো যে এই সরল বিপ্র তাহা মনে রাখে নাই? চুরিকরা মাখনের দাগ মুছিয়া ফেলিয়া মুখখানিকে কতোবারই তো 'সাধু সাধু' দেখাইতে হইয়াছে মায়ের কাছে, ধরা পড়িবার ভয়ে!

গভীর রাত্রিতে গহন নিকুঞ্জে বনমালী-বেশ লুকাইয়া কালী-করালীর ছদ্মবেশ ধরিতে হইয়াছে আয়ান ঘোষের সম্মুখে! অথচ আজ ভক্ত ডাকিতেছেন; উপায় কি; সত্য সাক্ষ্যই দিতে হইবে সর্বজনসমক্ষে! তথাপি একটু সাধ্যসাধনার দরকার, অনেক যত্ন তোয়াজ না করিলে সাধারণ সাক্ষীই তো মিলে না; আর এ তো অনাদিকালের সাক্ষী!' হাসিয়া প্রতিমারূপী গোপাল ছোট বিপ্রকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'তুমি নিশ্চিন্ত মনে দেশে চলিয়া যাও, সেইখানে সভা ডাকো, অন্তরীক্ষ হইতে দৈববাণী দ্বারাই আমি সাক্ষ্য দিব, এই প্রতিমা-স্বরূপে তো আমি অন্যত্র যাইতে পারিব না!'

বিপ্র বলিলেন, 'তুমি যদি চতুর্ভুজ মূর্তি ধারণ করিয়াও সাক্ষ্য দাও তথাপি কেহ তাহা বিশ্বাস করিবে না, এই প্রতিমা-স্বরূপেই তোমাকে আমার সঙ্গে যাইতে হইবে।'

কৃষ্ণ কহে—প্রতিমা চলে কাঁহাও না শুনি,
বিপ্র কহে—প্রতিমা হৈয়া কহ কেনে বাণী ?

'যদি প্রতিমা হইয়া কথা বলিতে পারো তবে চলিতেই বা পারিবে না কেন ? আমি তোমার কোনও কথাই শুনিব না, ব্রাহ্মণের সত্য রক্ষার জন্য আমার সঙ্গে তোমার যাইতেই হইবে।

সাক্ষী এইবার নরম হইলেন, বলিলেন—'তথাস্তু। তুমি যাত্রা কর, আমি তোমার পশ্চাতে পশ্চাতে চলিব, কিন্তু এক সর্ত, তুমি পশ্চাতে ফিরিয়া তাকাইতে পারিবে না, তুমি আমার নূপুরের ধ্বনি শুনিতে পাইবে, যদি ফিরিয়া তাকাও তবে আমি আর একপদও অগ্রসর হইব না, সেখানেই থাকিয়া যাইব। এক সের অন্ন রন্ধন করিয়া আমার উদ্দেশ্যে নিবেদন করিবে, আমি তাহা গ্রহণ করিয়া তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাইব।

বিপ্র পরমানন্দে সর্তে রাজী হইয়া বিদ্যানগরের পথে যাত্রা করিলেন। বহু দিবসান্তে নূপুরের ধ্বনিমাত্র সম্বল করিয়া যেদিন গ্রামপ্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন সেইদিন মনে হইল, 'আজ একবার স্বচক্ষে গোপালকে দেখা দরকার, শেষে গ্রামের লোক আহ্বান করিয়া আনিয়া যদি সাক্ষীকে দেখাইতে না পারি তবে আর রক্ষা থাকিবে না। গ্রামে যখন পৌঁছিয়াছি আর ভয় কি, গোপাল এখানে থাকিয়া গেলেও ক্ষতি নাই।' বিপ্র ফিরিয়া তাকাইলেন, গোপালও হাসিয়া সেইখানেই দাঁড়াইলেন। 'গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেল' যবে, তখন আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই ছুটিয়া আসিলেন অভিনব সাক্ষী দর্শনের আশায়। এ কি অসম্ভব ঘটনা। লোকের বিস্ময়ের আর অবধি রহিল না, ভক্তিতে, আনন্দে ভক্তগণ অভিভূত হইয়া গেলেন।

সর্বসমক্ষে গোপাল সত্য সাক্ষ্যই দিলেন। এবার আর বাধা রহিল না, অশ্রুজলে সিক্ত হইয়া, আনন্দে ভক্তিতে পূর্ণ হইয়া বড়ো বিপ্র ছোট বিপ্রের হস্তে কন্যা সম্প্রদান করিলেন।

দুই বিপ্রের ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া গোপাল তাঁহাদের বর প্রার্থনা করিতে বলিলে, তাঁহারা বৃন্দাবনের ধনকে এইস্থানেই থাকিবার প্রার্থনা জানাইলেন। গোপাল সম্মত হইলেন। দেশের রাজা এই সৌভাগ্যের উদয়ে পরমানন্দে, মহা আড়ম্বরে এক নবনির্মিত সুন্দর মন্দিরে গোপালের প্রতিষ্ঠা করিলেন, নাম হইল 'সাক্ষীগোপাল'।

কিছুকাল কাটিল। বোধ করি গোপালের আর একই স্থানে, একই সেবা-পূজা ভালো লাগিল না, তিনি চিরনূতন। উড়িষ্যায় রাজা পুরুষোত্তমদেব সহসা

বিদ্যানগর আক্রমণ করিলেন, যুদ্ধে তাঁহারই জয়লাভ হইল। গোপালের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হইয়া তিনি তাঁহাকে নিজ রাজধানী কটকে লইয়া আসিলেন। রাজসমারোহে কটকে সাক্ষীগোপালের প্রতিষ্ঠা হইল।

পুরুষোত্তমদেবের মহিষী একদিন নবনির্মিত মন্দিরে গোপাল দর্শন করিতে আসিলেন। গোপালের অপরূপ সৌন্দর্যে ও মাধুর্যে মুগ্ধ হইয়া রানী আপন অঙ্গের মণিখচিত স্বর্ণাভরণে গোপালকে সজ্জিত করিয়া অপলক-নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার নাসিকায় ছিল একটি নিটোল সুন্দর মুক্তা, ইচ্ছা হইল ইহাও গোপালকে পরাইয়া দেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁহার, বিগ্রহের নাসিকায় কোনও ছিদ্র পাওয়া গেল না। ব্যর্থমনোরথ রানী মনের কষ্ট মনে লইয়াই রাজভবনে ফিরিয়া গেলেন। সারা দিনরাত্রি মনের মধ্যে ঐ ব্যথার কাঁটাটুকু যেন বিঁধিয়াই রহিল। গভীর রাত্রিতে রানী নিদ্রিতা হইলেন। এতক্ষণ ধরিয়া গোপাল বোধ করি অবসর খুঁজিতেছিলেন। এইবার স্বপ্নে গোপাল আসিয়া রানীর শিয়রে দাঁড়াইলেন। অঙ্গের জ্যোতিতে, আভরণের দীপ্তিতে কোমল কিশলয়ের মতো মুখখানির আনন্দোদ্ভাসিত হাস্যে রানীর শয়নগৃহ আলোকিত হইয়া উঠিল। রানী চমকিতা হইয়া উঠিলেন। তাঁহাকে আরও চমৎকৃত করিয়া মধুর কণ্ঠে গোপাল বলিলেন, 'আমার নাকে মুক্তা পরাইলে না কেন? দেখ তো এই যে ছিদ্র! ছোটবেলা বুঝি আমার মা যশোদা আমার নাকে গহনা পরান নাই?' হাসিয়া চঞ্চল বালক অদৃশ্য হইলেন।

রানীর স্বপ্নাবেশ ছুটিয়া গেল, ইহা কি সত্য? কতক্ষণে রাত্রি প্রভাত হইবে, কতক্ষণে গিয়া গোপালের নাসিকা দর্শন করিবেন, রানী অধীর হইয়া উঠিলেন। অবশেষে ব্যাকুল রজনী প্রভাত হইলে দ্রুত শিবিকায় আরোহণ করিয়া রানী মন্দিরে গোপালের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ভিজা তুলা দিয়া ঘষিতে ঘষিতে —কি অপূর্ব বিস্ময়ের কথা—সত্যই গোপালের নাসিকায় একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র আবিষ্কৃত হইল! আনন্দে রানীর অন্তর ভরিয়া গেল। মুক্তা পরিয়া গোপালের রূপ যেন আরও নয়নাভিরাম হইয়া উঠিল!

পরমানন্দে প্রভু এতক্ষণ এই কাহিনী শুনিতেছিলেন। গোপালের অঙ্গে আজও রানীর দেওয়া সেই আভরণ, নাসিকায় সেই মুক্তা। প্রভু মুগ্ধ নেত্রে গোপালের রূপসুধা পান করিতে লাগিলেন।

পরদিন সাক্ষীগোপালকে প্রণাম করিয়া আবার পথে নামিলেন যাত্রীদল।

মহাপ্রভুর দণ্ডভঙ্গলীলা

মহাপ্রভু ও যাত্রীদল ভুবনেশ্বর, কমলপুর প্রভৃতি তীর্থ ও তীর্থদেবতা দর্শনান্তে কপোতেশ্বরে আসিলেন।

পণ্ডিত জগদানন্দ প্রভুর সন্ন্যাসের চিহ্ন দণ্ডখানি শ্রীনিত্যানন্দের হাতে রাখিয়া ভিক্ষা করিতে গেলেন, বলিয়া গেলেন দণ্ডটি যেন সাবধানে রক্ষা করা হয়।*

আথে ব্যথে নিত্যানন্দ দণ্ড ধরি করে,
বসিলেন সেইস্থানে বিহ্বল অন্তরে।
দণ্ড হাতে করি হাসে নিত্যানন্দ রায়,
দণ্ডের সহিত কথা কহেন লীলায়।
'অয়ে দণ্ড! আমি যারে বহিয়ে হৃদয়ে,
সে তোমারে বহিবেক এতো যুক্তি নহে?
এত বলি বলরাম পরম প্রচণ্ড,
ফেলিলেন দণ্ড ভাঙ্গি করি তিনখণ্ড।—চৈঃ ভা

শ্রীপাদ নিত্যানন্দ স্বয়ং সঙ্কর্ষণ, অনন্তদেব, তিনি জানেন মহাপ্রভু বস্তুটি কি। কাজেই তিনি ভাবিলেন,—'যিনি সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপ, তাঁহার পক্ষে বিধিনিষেধ অর্থহীন, কেবল লোককল্যাণের জন্য যে জননী, পত্নী ভক্তগণকে কাঁদাইয়া প্রভুর এই সন্ন্যাস-গ্রহণ ও সন্ন্যাসের সমস্ত কঠোরতা-বরণ, তাহার উপরে আবার এই যতিচিহ্ন দণ্ডধারণ, বাৎসল্যরসাশ্রিত শ্রীমন্নিত্যানন্দ কিছুতেই ইহা সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না, অপরিসীম বেদনার ভারে তাঁহার বক্ষ বিদীর্ণ হইতেছিল, অথচ প্রাণগৌরের সম্মুখে একটিমাত্র প্রতিবাদের শব্দ উচ্চারণ করারও সাধ্য তাঁহার ছিল না। তাই আজ সুযোগ পাইয়া গৌরপ্রেমে পাগল নিতাই দণ্ডখানি ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন, এতদিনকার সঞ্চিত নিষ্ফল ক্রোধাগ্নি আজ যেন দণ্ডটির উপরেই বর্ষিত হইল—'আমি যাঁহাকে বক্ষে করিয়া রাখি, তিনি কেন তোমাকে বহন করিবেন?' অতএব দণ্ডের চরম দণ্ড দিয়া তিনি তাহা তিনখণ্ড করিয়া নদীতে বিসর্জন দিলেন।

এই কথা যখন প্রভুর কর্ণগোচর হইল, প্রভু যেন দুঃখে ও ঈষৎ ক্রোধে শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দণ্ডখান কেমন করিয়া ভাঙ্গিল শ্রীপাদ?

---

* শ্রীচৈতন্যভাগবত মতে দণ্ডভঙ্গলীলাটি সুবর্ণরেখা নদীর তীরে সংঘটিত হয়।

নিত্যানন্দের অন্তরে ভয়, কিন্তু বাহিরে সাহসের ভাণ করিয়া বলিলেন, 'তুমি প্রেমাবেশে বিহ্বল হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গিয়াছিলে, তোমাকে রক্ষা করিতে গিয়া দণ্ডটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।'

প্রভু নিত্যানন্দের অন্তরের কথা জানেন, তাঁহার স্নেহপাগল অগ্রজ কেমন করিয়া এবং কেন যে দণ্ড ভাঙ্গিয়াছেন তাহাও তাঁহার অজানা নয়। তিনি আরও ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, 'আমার তো সম্বলের মধ্যে ছিল এই একমাত্র দণ্ড, তাহাও তুমি কেন ভাঙ্গিয়া ফেলিলে শ্রীপাদ? জানো না কি ইহাতে যে সর্ব দেবতার অধিষ্ঠান?'

নিত্যানন্দ বলিলেন, 'তোমার দণ্ডে কি আছে আমি তাহা জানি না। আমি একখানা বাঁশমাত্র ভাঙ্গিয়াছি, তাহাতেই যদি আমার অপরাধ হইয়া থাকে, বেশ তো আমি প্রস্তুত, তোমার ইচ্ছামতো শাস্তি তুমি আমাকে দিতে পারো।'

প্রভু ঈষৎ ক্লিষ্ট স্বরে বলিলেন, 'যে দণ্ডের মধ্যে সর্ব দেবতার অধিষ্ঠান, সে তোমার মতে কি হৈল বাঁশখান?' যাহা হোক্, অসীম তোমাদের অনুগ্রহ, আমাকে নীলাচলে আনিয়া আমার পরম উপকার তো তোমরা করিয়াছ. এখন হয় তোমরা আগে যাও, নতুবা আমাকে আগে যাইতে দাও, তোমাদের সঙ্গে আর আমি যাইব না।'

শ্রীমুকুন্দ বলিলেন. 'প্রভু! তাহাই হউক. তুমিই অগ্রবর্তী হও; আমরা তোমার পশ্চাতেই চলিব, সঙ্গে যাইব না।'

শুনিবামাত্র দ্রুতগতিতে প্রভু অগ্রে চলিয়া গেলেন. দণ্ডভঙ্গের দুঃখে ও ক্রোধে যেন কাহারও প্রতি ফিরিয়ও তাকাইলেন না। দুই প্রভুর 'মতি' বুঝিতে না পারিয়া ভক্তগণ বিহ্বল হইয়া রহিলেন।

ইঁহো কেন দণ্ড ভাঙ্গে, তেঁহো কেন ভাঙ্গায়.
ভাঙ্গাইয়া কেনে ক্রুদ্ধ ইঁহো তো দোষায়।

নিজেই নাট্যকার, নিজেই অভিনেতা, কে জানে ইহা কোন্ অভিনয়?

দূর হইতে বহু প্রত্যাশিত জগন্নাথ দেউলের চূড়াগ্রভাগ দেখা গেল. আবেশে, প্রেমে নৃত্য করিতে করিতে প্রভু এই অর্ধ শ্লোকটি উচ্চারণ করিতে লাগিলেন,—

প্রাসাদাগ্রে নিবসতিঃ পুরঃস্মেরবক্তারবিন্দো
মামালোক্য স্মিত সুবদনো বালগোপালমূর্তি।—চৈঃ ভাঃ

'(দেখ দেখ) যাঁহার বদনারবিন্দ বিকশিত, সেই বালগোপালমূর্তি শ্রীকৃষ্ণ আমাকে

দেখিয়া মৃদু মধুর হাস্যে শ্রীমুখে সমধিক শোভা বিস্তার করিতে করিতে প্রাসাদের উপরিভাগে আমার সম্মুখে আসিয়া অবস্থান করিতেছেন।

এই শ্লোক উচ্চারণ করিতে করিতে কতবার আছাড় খাইয়া প্রভু ভূমিতলে পড়িতে লাগিলেন।

যিনি এক অখণ্ড সত্তা বহুরূপে তিনি নিজেকে বিস্তৃত করিয়াছেন, কিন্তু সমস্ত বৈচিত্র্যের মধ্যেও তিনি এক এবং একা কেহ তাঁহার সঙ্গী নাই। সচল গৌরব্রহ্ম চলিয়াছেন অচল দারুব্রহ্ম দর্শনে—সঙ্গিগণ এখানে বাধাস্বরূপ। তাই এই কৌশল তাই এত দ্রুততা।

নীলাচলে মহাপ্রভু

অবশেষে প্রভু আসিয়া পৌঁছিলেন নীলাচলে শ্রীজগন্নাথের মন্দিরের দ্বারে, আর বিলম্ব সহিতেছে না ঐ যে দুই হাত বাড়াইয়া জগন্নাথ তাঁহাকে আহ্বান করিতেছেন। প্রভু ব্যাকুল হইয়া শ্রীমূর্তির দিকে অগ্রসর হইলেন।

প্রভু যে হইয়াছেন অচেতন প্রায়
দেখি মাত্র জগন্নাথ নিজ প্রিয় কায়
কি আনন্দ মগ্ন হৈলা বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর।
বেদেও এসব তত্ত্ব জানিতে দুষ্কর॥
সেই প্রভু গৌরচন্দ্র চতুর্ব্যূহ রূপে।
আপনে বসিয়াছেন সিংহাসন সুখে॥
আপনেই উপাসক হই করে ভক্তি।
অতএব কে বুঝিবে ঈশ্বরের শক্তি॥ —চৈ ভ,

নিজেই নিজেকে দৃঢ়রূপে আলিঙ্গন করিবার আকুলতায় প্রভু বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া মূর্তির একেবারে সন্নিকটে উপস্থিত হইলেন। সাধারণ একজন মানুষের এত সাহস ও স্পর্ধা দেখিয়া পড়িছাগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল। সেই সময়ে দৈবক্রমে ভারতবিখ্যাত পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম সেইস্থানে উপস্থিত ছিলেন। উড়িষ্যারাজ শ্রীপ্রতাপাদিত্যের সভাপণ্ডিত সার্বভৌমের তখন পুরীতে অপ্রতিহত প্রভাব ও ক্ষমতা। তিনি মন্দিরে প্রভুর আকস্মিক অভ্যুদয় ও দেহে এত অদৃষ্টপূর্ব প্রেমের আবেশ দেখিয়া মুগ্ধ ও বিস্মিত নয়নে প্রভুর দিকে চাহিয়া ছিলেন, পরিহারিগণ যখন প্রভুকে প্রহার করিতে উদ্যত হইল তখন শাস্ত্রাক্ষণাভিজ্ঞ

সার্বভৌমের মন হাহাকার করিয়া উঠিল। এই সুন্দর কোমল দেবদুর্লভ দেহটিকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি নিজ বক্ষ দ্বারা প্রভুকে আবৃত করিয়া রাখিলেন। তাঁহার শাসনকঠোর নির্দেশে পরিহারিগণ নিরস্ত তো হইলই অধিকন্তু অচৈতন্য এই পুণ্যতনুখানি বহন করিয়া নিয়া সার্বভৌমের গৃহে পৌঁছাইয়া দিল।

বহুক্ষণেও শ্রীচৈতন্যপ্রভুর চৈতন্য হইল না। সার্বভৌম এই অজ্ঞাতপরিচয় সুকুমার সন্ন্যাসীর জন্য মনে মনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন।

সূক্ষ্ম তুলা আনি নাসা-অগ্রেতে ধরিলা।
ঈষৎ চলয়ে তুলা, দেখি ধৈর্য হৈলা॥

নবীন সন্ন্যাসীর প্রাণের লক্ষণ দেখিয়া সার্বভৌমের স্নেহবৎসল মনের স্থৈর্য ফিরিয়া আসিল। তিনি বিস্মিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, 'ইনি কে? দেখিতেছি ইনি একজন সাধারণ মনুষ্য মাত্র, অথচ ইঁহার দেহে যে সুদীপ্ত সাত্ত্বিক বিকার ও মহাসমাধির (প্রলয়) লক্ষণ দেখিতেছি, এইরূপ অধিরূঢ় মহাভাবের বিকাশ তো একমাত্র নিত্যসিদ্ধা কৃষ্ণপ্রেয়সী-শ্রেষ্ঠা শ্রীমতীতেই সম্ভব বলিয়া জানি, কিন্তু এই সাধারণ মনুষ্যদেহে অধিরূঢ় ভাবের প্রকাশ দেখিতেছি, একি পরম বিস্ময়!' সার্বভৌম শাস্ত্রজ্ঞ, পরম পণ্ডিত; তিনি শাস্ত্রলক্ষণ মিলাইয়া প্রভুর প্রেমের গভীরতার পরিমাপ করার চেষ্টা করিতেছেন। তিনি মাদনাখ্য মহাভাবময়ী শ্রীমতীর প্রেমের লক্ষণ জানেন, কিন্তু জানেন না সেই রসসমুদ্র কত গভীর, কত অসীম! দূর হইতে তিনি সমুদ্রের তরঙ্গহিল্লোলের শব্দ শ্রবণ করিয়াছেন মাত্র, সমুদ্র দর্শন করেন নাই, অবগাহন তো সুদূরের কথা। আজ সহসা সার্বভৌমের চক্ষুর সম্মুখ হইতে যেন দুর্লঙ্ঘ্য বাধার পর্বত নিমেষে অন্তর্হিত হইয়া গেল। বিস্ময়বিহ্বল সার্বভৌম অকূল, অসীম সমুদ্রের পানে বিস্ফারিত নেত্রে চাহিয়া রহিলেন।

কিছুক্ষণ পরেই শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ সিংহদ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং লোকের মুখে মুখে শুনিতে পাইলেন, এক নবীন সন্ন্যাসী জগন্নাথ দর্শনে গিয়া মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছেন এবং তাঁহাকে সার্বভৌমের গৃহে নেওয়া হইয়াছে; তখনই তাঁহারা বুঝিতে পারিলেন সন্ন্যাসী কে! তাঁহারা সার্বভৌমের গৃহের অনুসন্ধান করিতেছেন ঠিক সেই সময়েই শ্রীগোপীনাথ আচার্য সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। তিনি সার্বভৌমের ভগ্নীপতি, মুকুন্দের পূর্বপরিচিত। অকস্মাৎ নীলাচলে তাঁহাদের দেখিয়া আচার্য যেমন আনন্দিত হইলেন, তাঁহারাও ততোধিক আনন্দ লাভ করিলেন। আচার্যের কাছে প্রভুর নীলাচলে আগমনের

কারণ ও সাম্প্রতিক ঘটনার বিবরণ দিয়া তাঁহাকে সঙ্গে লইয়াই মুকুন্দাদি চারিজন দ্রুত সার্বভৌমগৃহে উপস্থিত হইলেন।

প্রভুর তখনও বাহ্য জ্ঞান ফিরিয়া আসে নাই। প্রভুর 'গণ'কে লইয়া আচার্য অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। যথারীতি নাম-সঙ্কীর্তনের পরে প্রভুর বাহ্য জ্ঞান হইল, 'হরি, হরি' বলিয়া তিনি উঠিয়া বসিলেন।

বয়োবৃদ্ধ, জ্ঞানবৃদ্ধ সার্বভৌম প্রথানুসারে নবীন সন্ন্যাসীর পদধূলি লইলেন। তাঁহার অনুরোধে শীঘ্র স্নানাদি সমাপন করিয়া তাঁহাব গৃহেই জগন্নাথের প্রসাদান্নে তাঁহারা মধ্যাহ্ন ভোজন করিলেন।

প্রসাদ গ্রহণেব পরে সার্বভৌম প্রভুব পূর্বাশ্রমের পরিচয় জানিতে চাহিলে আচার্য তাহা জানাইলেন। নদীয়া সম্বন্ধেও প্রভুব মাতামহ ও পিতা সার্বভৌমেব পরিচিত ছিলেন এবং পিতার সম্বন্ধে তাঁহারা পূজ্য ছিলেন। সাবভৌম প্রভুর ঐ পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন।

প্রীত হইয়া গোসাঞিরে কহিতে লাগিলা—
সহজেই পূজ্য তুমি আবেত সন্ন্যাস,
অতএব জানিহ তুমি আমি নিজ দাস।

শুনিয়া লজ্জিত প্রভু 'শ্রীবিষ্ণু' স্মরণ করিয়া কহিলেন, 'ছিঃ ছিঃ এইরূপ কথা বলিয়া আপনি আমাকে অপরাধী কবিবেন না; আপনি জগদ্‌গুরু, সর্বলোকের হিতকর্তা, বিশেষতঃ সন্ন্যাসীদের আপনি বেদান্ত পড়াইয়া থাকেন। আমি বালক, অজ্ঞান সন্ন্যাসী, আপনাকে আমি গুরু বলিয়া স্বীকাব করিলাম। আপনার আশ্রয়লাভের জন্যই আমাব এখানে আসা, দয়া করিয়া আপনি আমার সর্বপ্রকার ভারই গ্রহণ করুন। আজই তো দর্শনে গিয়া আমাব যে বিপদ ঘটিয়াছিল আপনি না থাকিলে কে আজ আমাকে রক্ষা কবিত?'

তরুণ সন্ন্যাসীর সরল বিনম্র বাক্যে সার্বভৌমের জ্ঞানকঠোর হৃদয় দ্রব হইয়া গেল। তিনি সস্নেহে বলিলেন, 'তুমি আর একলা মন্দিরে দর্শনে যাইও না, আমার সঙ্গে অথবা আমার লোক সঙ্গে লইয়া যাইও।' প্রভুও বলিলেন, আর সম্মুখে গিয়া তিনি দর্শন করিবেন না, গরুড়ের পশ্চাৎ হইতেই দর্শন করিবেন। সার্বভৌমের মাতৃস্বসার একটি নির্জন গৃহে প্রভুর 'বাসা' দেওয়া হইল।

একদিন সার্বভৌম গোপীনাথ আচার্যকে বলিলেন, 'এমন বিনীত স্বভাব, এমন সুন্দর এই সন্ন্যাসী, ইহাকে দেখিলেই আমার অন্তরে অত্যন্ত প্রীতির সঞ্চার হয়,

তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি, ইনি কোন্ সম্প্রদায় হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন এবং ইঁহার সন্ন্যাসের নামই বা কি ?'

আচার্য প্রভুর 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম ও 'ভারতী' সম্প্রদায়ের কথা বলিলেন। সার্বভৌম প্রভুর নামটি শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন কিন্তু 'ভারতী' সম্প্রদায় শুনিয়া তাঁহার মন যেন তত প্রসন্ন হইল না ; বলিলেন, 'নামটি তো উত্তমই হইয়াছে কিন্তু সম্প্রদায় উত্তম নহে—মধ্যম !

আচার্য ক্ষুব্ধ হইলেন, প্রভু বা প্রভুব কার্য সমালোচনার অতীত, যিনি স্বয়ং ভগবৎতত্ত্ব তাঁহার যে বিধি, ধর্ম বা আচারের কোন অপেক্ষাই থাকিতে পারে না আচার্য তাহা জানেন। তথাপি প্রভুর ভগবত্তার কথা না বলিয়াও তিনি বলিলেন, 'ইহার তো কোনও প্রকার বাহ্যাপেক্ষা নাই, তাই তিনি সম্প্রদায় উপেক্ষা করিয়াছিলেন।'

সার্বভৌমের অন্তরে নবাগত তরুণ সন্ন্যাসীব প্রতি স্নেহের সঞ্চাব হইয়াছে। তাই তাঁহার শুভাশুভের প্রতিও যেন তাঁহাব দৃষ্টি পড়িয়াছে। তিনি বলিলেন, 'এই তরুণ বয়সে ইনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, এই বয়সে সন্ন্যাস রক্ষা করা অত্যন্ত কঠিন ; তবে আমি যদি বেদান্ত পড়াইয়া ইঁহাকে অদ্বৈতমার্গে প্রবেশ করাইতে পারি তবেই ('নেতি নেতি') জ্ঞানেব উদয়ে তাঁহার সমস্ত মোহই দূব হইয়া যাইবে এবং ইনি যদি বলেন তবে পুনবায় যোগপট্ট দিয়া উত্তম সম্প্রদায় হইতে ইহাকে সন্ন্যাস গ্রহণ কবাইতে পারি !'

যিনি স্বয়ং অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বস্বরূপ, যিনি দ্বৈতাদ্বৈতেব মীমাংসা, তাঁহার সন্ন্যাস রক্ষা করিবেন সার্বভৌম, অদ্বৈতমাগে তাঁহাকে প্রবেশ করাইয়া ! আচার্য আব মুকুন্দ অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। আচার্য বলিলেন, 'ভট্টাচার্য, ইনি স্বয়ং ভগবান্, তুমি ইহা বুঝিতে পারো নাই, বিজ্ঞজনই তাঁহার মহিমা বুঝিতে পারেন, অজ্ঞেরা পারিবে কেমন করিয়া ?'

সাবভৌমের শিষ্যগণ সেখানে উপস্থিত ছিলেন ; প্রগল্ভ বচনে তাঁহারা বলিয়া উঠিলেন, 'ঈশ্বর কহ কোন প্রমাণে ?'

মহাপ্রভুর সম্বন্ধে এই সমস্ত বিরূপ আলোচনায় আচার্য এত বিচলিত হইলেন যে তাঁহার নিজের বয়সের গুরুত্ব বা পাণ্ডিত্যের মর্যাদা উপেক্ষা করিয়াই তিনি অল্পবয়স্ক শিষ্যদের কথার উত্তর দিলেন, 'ঈশ্বরতত্ত্বজ্ঞ বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সাধনালব্ধ অনুভূতি দ্বারা যাহা প্রকাশ করেন—ঈশ্বরত্ব সম্বন্ধে তাহাই প্রমাণ।'

তর্কশাস্ত্রনিপুণ শিষ্যগণ আবার তারস্বরে বলিতে লাগিলেন, উঁহু, অনুভব

দ্বারা ঈশ্বরত্ব প্রমাণ হয় না, অনুমানে তাহা সিদ্ধ হয়। (যেমন ধূম দেখিয়া অগ্নির অনুমান, সৃষ্টি দেখিয়া স্রষ্টার অনুমান)।' সার্বভৌম চুপ করিয়া আছেন, আচার্য যে আপন গৌরব তুচ্ছ করিয়া তাঁহার তার্কিক শিষ্যগণের কথার উত্তর দিতেছেন, এবং শিষ্যগণও যে গুরুর সম্মুখেই শিষ্টতার সীমা লঙ্ঘন করিতেছেন তাহা উপেক্ষা করিয়াই, হয়তো বা কিছুটা কৌতুহলভরেই তিনি তর্কের গতি লক্ষ্য করিতেছিলেন।

আচার্য এবারে ক্রুদ্ধ হইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'অনুমান—প্রমাণে ঈশ্বরতত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া যায় না। যাহার প্রতি ঈশ্বরকৃপার লেশমাত্র বর্ষিত হয় নাই সেই দুর্ভাগা ঈশ্বরতত্ত্ব জানিবে কোথা হইতে? দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি ভাগবতের এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিলেন—

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্। —ভাঃ ১০।১৪।২৯

হে দেব, হে ভগবান! তোমার পাদপদ্মের যৎকিঞ্চিৎ অনুগ্রহপ্রাপ্ত ব্যক্তিই তোমার মহিমা বা স্বরূপতত্ত্ব কিঞ্চিৎ অনুভব করিতে পারেন—অন্যথা (অনুগ্রহলেশহীন) অন্য কোনও ব্যক্তি নিঃসঙ্গ ভাবে অবস্থান পূর্বক (শাস্ত্র-জ্ঞানাদিতে রত) বহুকাল যাবৎ অনুসন্ধানে থাকিলেও বিচার করিয়াও তাহা জানিতে পারে না।

আচার্য এইবার ভট্টাচার্যের দিকে ফিরিয়া প্রত্যক্ষ আক্রমণ করিলেন— 'ভট্টাচার্য! যদিও তুমি পরম পণ্ডিত, জগদ্‌গুরু, কিন্তু তোমাতে ঈশ্বরকরুণার লেশমাত্র নাই এবং শাস্ত্রেরও ইহাই সিদ্ধান্ত কেবল পাণ্ডিত্যের দ্বারা ঈশ্বরতত্ত্ব কখনও জ্ঞাত হওয়া যায় না।

এইবার সার্বভৌমও কথা বলিলেন, 'আচার্য! একটু সাবধান হইয়া কথা বলো, আমি না হয় কৃপালেশহীন কিন্তু তোমাতে যে ঈশ্বরকৃপা আছে তাহার প্রমাণ কি?'

আচার্য বলিলেন, 'দেখিবামাত্র যে জ্ঞান হয় তাহা 'বস্তু'র জ্ঞান কিন্তু তাহা বস্তুর স্বরূপ বা তত্ত্বজ্ঞান নহে। (কাঁচ দেখিলেও হীরকের 'বস্তু' জ্ঞান জন্মিতে পারে— তাহা শুধু বাহ্যিক জ্ঞান, তাহা আংশিক জ্ঞান,) কিন্তু হীরকের স্বরূপজ্ঞান তথা সামগ্রিক জ্ঞান লাভ করিতে হইলে জহুরীর কৃপার প্রয়োজন, নতুবা বস্তুসাদৃশ্যে অজ্ঞের কাছে হীরক এবং কাঁচে কোনও ভেদই থাকে না।

আচার্য ভট্টাচার্যের ভগ্নীপতি, হয়তো বা এই সম্পর্ক না থাকিলে এইরূপ ব্যক্তিগত আক্রমণে ভট্টাচার্য রুষ্টই হইতেন, কিন্তু তিনি হাসিয়াই বলিলেন, 'আচার্য! এত ক্রোধ করিতেছ কেন, আমি শাস্ত্রপ্রমাণের কথা বলিতেছি মাত্র, তুমি দোষ গ্রহণ করিও না। চৈতন্য গোসাঞি যে মহাভাগবত তাহা তো আমি অস্বীকার করিতেছি না, কিন্তু কোনও শাস্ত্রেই কলিকালে বিষ্ণুর অবতারের কথা নাই এবং সেইজন্যই বিষ্ণুকে "ত্রিযুগ" নামে শাস্ত্রে অভিহিত করা হইয়াছে।'

আচার্য যেন পণ্ডিত সার্বভৌমের অজ্ঞতায় বিমূঢ় হইয়া গেলেন, বলিলেন, 'পণ্ডিত! মহাভারত ও শ্রীমদ্ভাগবত এই দুই প্রধান শাস্ত্রগ্রন্থ কি বলিয়াছেন তাহা তুমি জানো না বলিয়াই কি আমাকে বিশ্বাস করিতে হইবে? তোমার হৃদয় শুষ্ক তর্কনিষ্ঠ, তাই তুমি হয়তো স্বীকার করিতে চাও না, কলিযুগে বিষ্ণুর লীলাবতার না থাকিলেও যে যুগধর্ম সংস্থাপনের জন্য যুগাবতার ধরাধামে আবির্ভূত হন তাহার প্রমাণ কি তুমি ঐ দুই গ্রন্থে পাও নাই? এই আমি প্রামাণ্য শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি—

আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনুঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ॥ —ভাঃ ১০।৮।১৩

(গর্গাচার্য বলিলেন), 'হে ব্রজরাজ! যুগে যুগে শ্রীমূর্তি প্রকটনকারী তোমার এই পুত্রের শুক্ল, রক্ত ও পীত এই তিনটি বর্ণ হইয়াছিল, সম্প্রতি ইনি কৃষ্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।'

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্!
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥ —ভাঃ ১১।৫।৩২

'হে রাজন্, দ্বাপরে এইরূপে লোকে জগদীশ্বরকে স্তুতি করেন (নমস্তে বাসুদেবায় ইত্যাদি)। নানাবিধ তন্ত্রের বিধান অনুসারে যেরূপ (স্তুতিপূজা) করিয়া থাকেন তাহা শ্রবণ করুন, সুবুদ্ধি ব্যক্তিগণ সঙ্কীর্তনপ্রধান পুজোপকরণ দ্বারা, অঙ্গ ও উপাঙ্গরূপ অস্ত্র এবং পার্ষদগণের সহিত বর্তমান গৌরকান্তিবিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ ভগবানের অর্চনা করিয়া থাকেন।'

গীতাতেও স্বমুখে ভগবান্ কি বলেন নাই—

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ —গীতা ৪।৭-৮

আচার্য মহাভারত হইতেও এই শ্লোকটী উদ্ধৃত করিলেন—

সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গোবরাঙ্গশ্চন্দনাঙ্গদী।
সন্ন্যাসকৃৎ সমঃ শান্তো নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণঃ।

—মহাভারত-দানধর্মে বিষ্ণুসহস্রনামস্তোত্র

'সুবর্ণের ন্যায় পীতবর্ণ যাঁহার (কিন্তু বিশেষার্থে যিনি 'কৃষ্ণ" এই উত্তমবর্ণদ্বয় সর্বদা বর্ণনা করেন), উজ্জ্বল হেমবরণ, বর (শ্রেষ্ঠ) অঙ্গ, যিনি চন্দনের অঙ্গদ ধারণ করেন, সন্ন্যাসী ভগবন্নিষ্ঠ বুদ্ধি (শম), অচঞ্চলচিত্ত, (শান্ত) কৃষ্ণনিষ্ঠ এবং নিবৃত্তিপরায়ণ এবং সেই জন্যই তাঁহার নাম সুবর্ণবর্ণ, হেমাঙ্গ, :বরাঙ্গ, চন্দনাঙ্গদী, সন্ন্যাসী, শম শান্ত এবং নিষ্ঠাশান্তিপরায়ণ।'

এই সমস্ত শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া আচায সার্বভৌমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই মহাগ্রন্থদ্বয়ের এই সমস্ত প্রমাণেও কি তোমার এই কষিতকাঞ্চনতনুসুন্দর, সুকুমার, কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত, শান্ত সন্ন্যাসীর ভগবত্তায় বিশ্বাস হয় না ?

না আমারই ভুল, তোমার কাছে এই সমস্ত প্রমাণ দেখানোও নিষ্ফল, উষর ভূমিতে বীজরোপণ করিয়া কে কবে ফল লাভ করিয়াছে ? যেমন তুমি কুতার্কিক তেমনই তোমার শিষ্যগণ , শুষ্ক পাণ্ডিত্যের অভিমানে মত্ত হইয়া আছ, ঈশ্বরতত্ত্বের কি বুঝিবে তোমরা ?

আর তোমাদের দোষ দেওয়াও বৃথা, ইহা মায়ারই প্রভাব। যেদিন ঈশ্বরকৃপা লাভ করিবে সেদিনই তুমি এই সব সিদ্ধান্ত মানিবে।'

এত তিরস্কারেও ভট্টাচার্য ক্রুদ্ধ হইলেন না, কুলীন, মানী ভগ্নীপতিকে যথেষ্ট সমীহ করিয়া অবশেষে কৌতুকের হাসি হাসিয়া বলিলেন, 'আচ্ছা ভাই, আমি তো কৃপালেশহীন শুষ্ক জ্ঞানী আছি-ই, এখন তুমি গিয়া চৈতন্য গোসাঞিকে আমার গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করিবার নিমন্ত্রণ করিয়া আস, পরে আমাকে শিক্ষা দিও!'

মহাপ্রভুর ভগবত্তা সম্বন্ধে ভট্টাচার্যের এই অবিশ্বাস দেখিয়া মুকুন্দ একান্ত দুঃখিত হইলেন কিন্তু আচার্যের সিদ্ধান্তে কথঞ্চিৎ সান্ত্বনা লাভ করিলেন।

প্রভুর কাছে দুইজনে উপস্থিত হইলেন। ভট্টাচার্যের নামে প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া দুইজনেই ভট্টাচার্যের কুতর্কের কথা ও ভক্তিহীনতার কথা বলিয়া তাঁহার নিন্দা করিলেন।

শুনিয়াই প্রভু বলিয়া উঠিলেন, 'ছি, ছি, তোমরা এইরূপে বয়োবৃদ্ধ, জ্ঞানবৃদ্ধ ভট্টাচার্যের নিন্দা করিও না। আমার প্রতি তাঁহার অনুগ্রহ এবং বাৎসল্য

আছে বলিয়াই তিনি যাহাতে আমার এই চঞ্চল বয়সে সন্ন্যাসধর্ম রক্ষিত হয় তাহারই চেষ্টা করিতেছেন মাত্র, ইহাতে তাঁহার দোষ দর্শন করা তোমাদের উচিত নহে।'

তারপর, তরুণ সন্ন্যাসীর সুকঠোর সন্ন্যাসধর্ম অবিচলিত রাখিবার আশায় এবং অদ্বৈত-বেদান্তমার্গে প্রবেশ করাইবার একান্ত ইচ্ছায় তৎকালীন ভারতের শ্রেষ্ঠতম বৈদান্তিক পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যকে বেদান্তের পাঠ দিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু সেদিন তিনি জানিলেন না, বেদের যেখানে অন্ত হইয়াছে সেখানেই আরম্ভ হইয়াছে একটি নূতন অধ্যায়, তাহারই পাঠ লইতে হইবে জগদ্‌গুরু বাসুদেব সার্বভৌমকে তরুণ সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কাছে।

মহাপ্রভুর নীলাচল

পাড়ার নাম 'গৌরবাড়শাহী', শ্রীগৌরাঙ্গের বাট (পথ) ও শাহী। কাছেই যমেশ্বরতোটা শিবের মন্দির ও তোটা-গোপীনাথ। এই তোটাতেই প্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত গদাধর থাকিতেন, তাঁহার শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ শুনিবার জন্য প্রায়ই প্রভু এখানে আসিতেন।

একদিন প্রভু গদাধরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'গদাধর। আজ যদি তোমাকে আমি কিছু দিই, তুমি গ্রহণ করিবে কি?'

গদাধর বলিল, 'তোমার দান যে আমার মাথার ভূষণ প্রভু!'

প্রভু নখে মাটি খুঁড়িতে লাগিলেন, দীর্ঘদেহী কালো পাথরের গোপীনাথের চূড়াগ্রভাগ দেখা দিল, মাটির নীচ হইতে উঠাইয়া গদাধর এখানেই তাঁহাকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই বিগ্রহের অঙ্গেই প্রভু লীন হইয়া যান বলিয়া একটি প্রবাদ আছে—

কি করিব কোথা যাবো বাক্য নাহি সরে,
গোরাচাঁদে হারাইলাম গোপীনাথের ঘরে।

এই কথা মন্দিরের দরজায় লেখা।

একদিন এই তোটা-গোপীনাথের নিকটবর্তী চটকপর্বত-দর্শনে গোবর্ধন ভ্রম হইল, সুনীল সমুদ্রকে ভাবিলেন যমুনা, প্রভু ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন, উঠিলেন বুঝি আঠারো ঘণ্টা পরে এক জেলের জালে, চক্রতীর্থের কাছে।

এই তো কাছেই সেই চটকপর্বত, সেই সমুদ্র, ধার ঘেঁষিয়া চলিয়াছে গৌর-

বাট, গৌর-পদধূলিলিপ্ত দীর্ঘ পথ, একদিন যেখানে সেই দীর্ঘদেহ তপ্তকাঞ্চনবর্ণ নবীন সন্ন্যাসীর পদচিহ্ন পড়িয়াছিল।

এই যমেশ্বরতোটার পথ বাহিয়াই প্রভু আসিতেছেন একদিন, পশ্চাতে গোবিন্দ। দূর হইতে মধুর সঙ্গীত-ধ্বনি কানে আসিল। গুর্জরী রাগিণীতে গান করিতেছেন এক দেবদাসী। প্রভু উন্মত্ত আবেগে ছুটিয়া চলিয়াছেন, সঙ্গীতকারীকে আলিঙ্গনের আশায়। পথে মনসিজের ঘন কাঁটার বেড়া, কিন্তু প্রেমের পথে কিসের বন্ধন? কাঁটার আঘাতে সে সোনার অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত হইতে লাগিল, কিন্তু ভ্রূক্ষেপহীন গৌর চলিয়াছেন দ্রুত পদবিক্ষেপে। গোবিন্দ ছুটিয়া আসিয়াও নাগাল পাইতেছেন না, চীৎকার করিয়া বলিলেন, 'প্রভু। স্ত্রীলোকের গান।' বাহ্য চেতনা ফিরিয়া আসিল প্রভু বলিলেন,—

গোবিন্দ আজি রাখিলা জীবন,
স্ত্রীপরশ হইলে আমার হইত মরণ।

শ্রীজগন্নাথের মন্দির, বিরাট গৃহতল, বিরাট প্রাঙ্গণ, সহস্র ভক্তের মেলা। এই সেই গরুড় স্তম্ভ যেখানে দাঁড়াইয়া দিনের পর দিন দর্শন করিতেন, হস্ত-পদ-বিহীন দারুজগন্নাথকে নহে বংশীধারী শ্যামসুন্দরকে শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর। স্তম্ভের নীচের খাল টি অশ্রুজলে ভরিয়া যাইত। যে পাথরটির উপরে দাঁড়াইয়া দীর্ঘকাল দর্শন করিয়াছেন, তাহাতে দীঘল চরণ-দুইটির ছাপ অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। মন্দির-প্রাঙ্গণেই একটি ছোট মন্দিরে সেই চরণচিহ্ন নিত্য পূজিত হইতেছে।

প্রবেশ করিবার পথে, মন্দিরের সিংহদরজার পরেই 'বাইশ পাহাচ, বাইশটি সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া মন্দিরে পৌঁছিতে হয়। সে বাইশ পাহাচের নীচেই আছে এক 'নিম্নগাড়ে',* তাহাতে পাদপ্রক্ষালন করিয়া প্রভু নিত্য ঈশ্বর-দর্শনে যান।

পাঁচশত বৎসর পূর্বে এইখানে সিংহদরজার সম্মুখে তেলেঙ্গা গাভী থাকিত। অর্ধরাত্রি পর্যন্ত স্বরূপ ও রায় রামানন্দের সঙ্গে রাধাকৃষ্ণ-রসাস্বাদন করিবার পর বহু মিনতি করিয়া স্বরূপ প্রভুকে শয়ন করাইয়া আসিয়াছেন, তিন দ্বারে কপাট আর গম্ভীরার দরজায় শুইয়া গোবিন্দ। স্বরূপের ভয়ে কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন প্রভু। কিন্তু কতক্ষণ? জানেন না স্বরূপ দরজায় কান পাতিয়া। বিরহিণী রাধিকার নিদ্রা কি ছিল? করুণ কাতর কণ্ঠে প্রভু আস্তে আস্তে কৃষ্ণনাম

---

* নীচু গর্ত।

করিতে লাগিলেন। স্বরূপ আবার ভিতরে গেলেন, বলিলেন, 'প্রভু, তোমার না হয় নিদ্রা নাই, ক্লান্তি নাই, দেহবোধ নাই! কিন্তু আমরা তো সাধারণ জীব! আমরা যে আর পারি না প্রভু!'

লজ্জায় করুণায় অভিভূত হইয়া প্রভু বলিলেন, 'থাক্ স্বরূপ, ক্ষমা দাও, এই যে নিদ্রা যাইতেছি।'

কিন্তু কোথায় নিদ্রা? এমনি এক রজনীর গভীর যামে প্রভুকে শয়ন করাইয়া স্বরূপ, রামানন্দ ঘরে গিয়াছেন; তিন দ্বার রুদ্ধ, প্রভুর দরজায় প্রহরী গোবিন্দ আজ নিদ্রিত। প্রভু অনুচ্চকণ্ঠে ঘরের ভিতরে নাম জপ করিতেছেন। অনেকক্ষণ সাড়া না পাইয়া স্বরূপ উঠিলেন, গোবিন্দ উঠিলেন, গৃহ শূন্য, প্রভু নাই। গৃহ গৃহপ্রাঙ্গণ সমস্ত খুঁজিয়াও যখন দেখা মিলিল না, দীপ জ্বালাইয়া গভীর নিশীথে তিন চার জনে 'প্রভু! প্রভু!' বলিয়া পথে বাহির হইলেন।

ইতি-উতি অন্বেষিয়া সিংহদ্বারে গেলা,
গাবীগণ মধ্যে যাই প্রভুরে পাইলা।—
পেটের ভিতর হস্তপদ কূর্মের আকার,
মুখে ফেন, পুলকাঙ্গ, নেত্রে অশ্রুধার,
গাবীগণ চৌদিকে শুঙ্খে (ঘ্রাণ লয়) প্রভুর অঙ্গ,
দূর কৈলে নাহি ছাড়ে মহাপ্রভুর সঙ্গ।

প্রভুর অঙ্গের গন্ধ গ্রহণ করিতেছে গাভীগণ, ছাড়াইলেও ছাড়িতে চাহে না, গৌর তাহাদেরও প্রভু যে!

সিংহদরজার সম্মুখ দিয়াই রাজপথ, রথযাত্রার পথ, কিছুদূর সৌভাগ্যবান গজপতি প্রতাপরুদ্রের প্রাসাদ। রাজা প্রতাপরুদ্র শুনিলেন, তাঁহার রাজ্যে এক নবীন সন্ন্যাসী আসিয়াছেন, লোকে তাঁহাকে স্বয়ং ভগবান বলিয়া বলিতেছেন। এমনকি অত্যন্ত বিস্ময়ের কথা, ভারতবিখ্যাত অদ্বৈতবৈদান্তিক, পণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌমও নাকি তাঁহার চরণাশ্রিত হইয়া ভক্ত হইয়াছেন।

সার্বভৌমকে রাজা ডাকাইয়া আনিলেন, জিজ্ঞাসা করিয়া এবং দেখিয়া শুনিয়া বুঝিলেন, সার্বভৌম একেবারে দ্রব হইয়াছেন।

একাদিক্রমে সাতদিন ধরিয়া বেদান্ত পড়াইয়া যাঁহাকে জ্ঞানের আলোকে আনিবার আশায় সার্বভৌম অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন, সাতদিনের মধ্যে একটি দিনও তো কই তাঁহার মুখের ভাবে এতটুকু ব্যতিক্রম দেখা গেল না?

সার্বভৌম ভাবিলেন, বাতুল না মূর্খ? জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমার এই

অধ্যাপনা, তুমি বুঝ কি না বুঝ, কিছুই তো বল না তুমি? আমি কেমন করিয়া জানিব, তুমি কি বুঝিতেছ?'

তরুণ সন্ন্যাসী বলিলেন, 'আপনার আদেশ শ্রবণ করা, তাই শ্রবণমাত্র করি, আপনার ব্যাখ্যা আমি কিছুই বুঝি না।'

'কি বলিলে?' বৃদ্ধ নৈয়ায়িক, শাস্ত্রজ্ঞ পরমপণ্ডিত বলিয়া উঠিলেন, 'আমার ব্যাখ্যা বুঝ না তুমি?'

সন্ন্যাসী বলিলেন,

ব্যাসের সূত্রের অর্থ সূর্যের কিরণ,
কল্পিত ভাষ্য মেঘে করে আচ্ছাদন।

বেদ, পুরাণ, উপনিষদ শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি শাস্ত্র মথিত করিয়া সন্ন্যাসী অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্ব স্থাপিত করিলেন। ভক্তির জয় হইল। তথাপি পাণ্ডিত্যাভিমান সম্পূর্ণ দূর হয় নাই, আপন হৃত-গৌরব উদ্ধারের আশায় সার্বভৌম—

আত্মারামাশ্চ মুনয়ঃ নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণোহরিঃ। —ভাঃ ১।৭।১০

এই শ্লোকটির নয় রকম অর্থ করিলেন ভাবিলেন এইবার প্রভু আর ইহার খণ্ডন করিতে পারিবেন না। পরম আনন্দে প্রভু সার্বভৌমের প্রতিভার প্রশংসা করিলেন এবং তাঁহারই অনুরোধে এইবার নিজে অর্থ করিতে লাগিলেন, শুধু শ্লোকের নয়, প্রতিটি শব্দের। 'আত্মা' শব্দে, 'মুনি', 'রাম' শব্দে, 'নি', 'গ্রন্থ' ইত্যাদি শব্দে, কত প্রকার যে অর্থ করিলেন তাহার আর ইয়ত্তা রহিল না। সার্বভৌম ভট্টাচার্য স্তম্ভিত মুগ্ধ হইয়া পায়ে পড়িলেন, শুষ্ক পাণ্ডিত্যের অহঙ্কার ধূলায় লুটাইল। ষড়ভুজ দর্শন করিয়া অচৈতন্য হইলেন, যখন চেতনা পাইয়া উঠিলেন, তখন দুই চোখভরা অশ্রু লইয়া যুক্তকরে দাঁড়াইলেন ভক্ত। শ্লোক লিখিয়া উৎসর্গ করিলেন প্রভুর পায়ে,

কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
প্রাদুষ্কর্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ॥

'কালপ্রভাবে বিনষ্টপ্রায় স্ববিষয়ক ভক্তিযোগ প্রচার করিবার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম ধারণ করিয়া যিনি আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার (শ্রীচৈতন্যের) পদারবিন্দে আমার চিত্তভৃঙ্গ গাঢ়রূপে লীন হোক্।'

মহারাজা প্রতাপরুদ্রের জিজ্ঞাসার উত্তরে ভক্ত সার্বভৌম যখন প্রভুর ঈশ্বরত্ব স্বীকার করিলেন, তখন মহারাজ আকুল হইয়া কহিলেন, 'পণ্ডিত! তাঁহাকে আমায় একবার দর্শন করাও!' প্রভু তখন দক্ষিণে, তাই সার্বভৌম তাঁহার প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত রাজাকে প্রতীক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন।

এদিকে দক্ষিণ যাত্রার পথে গোদাবরীতীরে বিদ্যানগরে প্রভু রায় রামানন্দের সঙ্গে মিলিত হইলেন। রস ও রসিকের, আস্বাদ্য ও আস্বাদকের সে মিলনে যে সাধ্য-সাধনতত্ত্ব, যে অনাস্বাদিতপূর্ব রসতত্ত্ব প্রকাশিত হইল তাহা অবর্ণনীয়। প্রতিদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে রাজপ্রতিনিধি রায় গোপনে আসিয়া প্রভুর সঙ্গে মিলিত হন, গভীর রাত্রি পর্যন্ত চলে রসাস্বাদন।

শেষে একদিন রায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'প্রভু আমার চিত্তে এক সংশয় দেখা দিয়াছে, তোমারই সম্বন্ধে, তবুও তোমাকেই জিজ্ঞাসা করি।'

পহিলে দেখিলুঁ তোমা সন্ন্যাসীস্বরূপ।
এবে তোমা দেখি মুঞি শ্যাম-গোপরূপ॥
তোমার সম্মুখে দেখোঁ কাঞ্চন-পঞ্চালিকা।
তার গৌরকান্ত্যে তোমার সর্ব-অঙ্গ-ঢাকা॥

প্রভু তাঁহার স্বাভাবসিদ্ধ হাসি হাসিয়া বলিলেন, 'রায় তুমি কৃষ্ণপ্রেমিক এবং ভক্ত, আর ভক্তের লক্ষণই এই, সর্বত্রই তাঁহার কৃষ্ণদর্শন হয়।'

রায় কহে —তুমি প্রভু! ছাড় ভারি ভুরি।
মোর আগে নিজ-রূপ না করিহ চুরি॥

প্রভু ধরা পড়িয়াছেন এবং যাঁহার কাছে ধরা পড়িয়াছেন তিনি ভক্তোত্তম রসিকশেখর, সাড়ে তিনজন পাত্রের একজন, তাই—

তবে হাসি তাবে প্রভু দেখাইলা স্বরূপ।
রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ॥"

সে অপরূপ রূপমাধুরী দর্শনে রায় মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। সেইদিন জগতে রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব, মহারাসতত্ত্ব প্রকটিত হইল এবং সেই তত্ত্বের প্রথম দ্রষ্টা হইলেন, রায় রামানন্দ।

বিষয়-ঐশ্বর্যে কোনও দিনই আসক্তি ছিল না, এখন একেবারেই তাহা হইতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য রায় রাজা প্রতাপরুদ্রের শরণ লইলেন। বাসুদেব সার্বভৌমের পরিবর্তনেই রাজার বিস্ময়ের ও ভক্তির সীমা ছিল না, এখন রায়ের

গৌরপ্রেম দেখিয়া রাজা একেবারে অভিভূত হইয়া গেলেন, বলিলেন, 'রায়! আমাকে একবার তাঁহার সহিত মিলন করাও।'

দীর্ঘ দুই বৎসর পরে প্রভু নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন। সার্বভৌম, শ্রীনিত্যানন্দ ও সকল ভক্তের অনুরোধ ব্যর্থ হইল, প্রভু রাজদর্শনে সম্মত হইলেন না, অধিকন্তু পুরী ছাড়িয়া যাইবার ভয় দেখাইলেন।

শুনিয়া রাজা কাঁদিয়া উঠিলেন, 'ভগবান কি এক প্রতাপরুদ্র ব্যতীত সকলকে কৃপা করিবেন, এই পণ করিয়াছেন? দর্শন বিনা রাজা প্রাণত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

রায় রামানন্দ নীলাচলে আসিলে রাজা তাঁহার সংকল্পের কথা জানাইলেন। বুদ্ধিমান বিচক্ষণ রায় এবার স্বয়ং দৌত্যের ভার লইলেন। ধীরে ধীরে প্রভুর মন দ্রব হইয়া আসিল।

রথযাত্রা। গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দ আসিয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীবাস, মুকুন্দ প্রভৃতি পরম বৈষ্ণবকে অগ্রণী করিয়া প্রভু সাতটি কীর্তনসম্প্রদায় গঠন করিলেন। সচল গৌরবর্ণ জগন্নাথকে অগ্রবর্তী করিয়া অচল নীল দারুজগন্নাথ রথে চলিয়াছেন। —প্রভু দ্রুতগতিতে সাত সম্প্রদায়েই ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতেছেন। অজস্র নয়নধারায় বক্ষ ভিজিয়া যাইতেছে, স্বেদ, কম্প, স্তম্ভ, পুলকের উদ্গম হইয়া ক্ষণে ক্ষণে বাহ্যজ্ঞান হারাইতেছেন, তবুও সুমধুর কণ্ঠে গাহিতেছেন—

সেই ত পরাণনাথ পাইলুঁ—
যাঁহা লাগি মদন দহনে ঝুরি গেঁলু।

রাজা দূর হইতে তৃষিত নয়নে চাহিয়া আছেন।

নাচিতে নাচিতে প্রভুর হৈল ভাবান্তর,
হস্ত তুলি শ্লোক পড়ে করি উচ্চৈঃস্বর।—

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি বরস্তা এব চৈত্রক্ষপা-
স্তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
রেবারোধসি বেতসীতরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥ —সাহিত্যদর্পণ।

রাধাভাব-ভাবিত গৌর শ্রীকৃষ্ণকে ইহাই যেন বলিতে চাহিতেছেন, '(কুরুক্ষেত্রে) সেই তুমি, সেই আমি, সেই নবসঙ্গম, কিন্তু তথাপি হে দয়িত! আমার মন বৃন্দাবনের সেই মিলনের জন্য উৎকণ্ঠিত, তুমি বৃন্দাবনে উদয় হইয়া আবার আমাকে

লইয়া লীলা কর।' প্রভুর রসে রসিক স্বরূপ ভাবানুযায়ী পদ গাহিয়া প্রভুর সঙ্গে ফিরিতে লাগিলেন।

মধ্যাহ্নে নৃত্যক্লান্ত প্রভু পুষ্পোদ্যানে প্রবেশ করিয়া ক্ষণিক বিশ্রাম করিতেছেন, সার্বভৌম প্রভৃতি ভক্তের উপদেশানুযায়ী রাজবেশ পরিত্যাগ করিয়া রাজা প্রতাপরুদ্র বৈষ্ণববেশে, নব অভিসারিকার মতো ভীরু, কম্পিত পদক্ষেপে প্রিয়তমের কাছে চলিলেন।

প্রভুর দুই চোখ বন্ধ, ভূমিতে অর্ধশয়ন করিয়া আছেন। রাজা ধীরে ধীরে পায়ে মাথা রাখিলেন, বক্ষ ভরিয়া উঠিল সুধারসে, নয়নে অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল. আবৃত্তি করিতে লাগিলেন ভাগবতের শ্লোক। প্রভু আনন্দোৎফুল্ল মুখে বলিতে লাগিলেন, 'বলো, বলো!' রাজা শেষে এই শ্লোকটি পাঠ করিলেন।—

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং,
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং,
ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ। —ভাঃ—১০।৩১।৯

প্রভু, 'ভূরিদা, ভূরিদা, (হে বহুদাতা!)' বলিয়া চোখ বুজিয়াই রাজাকে আলিঙ্গন করিলেন, 'কে গো তুমি? কৃষ্ণলীলামৃত পান করাইলে আমায়?'

রাজা চরণে পড়িয়া কহিলেন, 'আমি যে তোমার দাসের দাস প্রভু!' প্রভু যেন না চিনিয়াই প্রতাপরুদ্রকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করিলেন।

কৃতকৃতার্থ, পূর্ণ হইয়া রাজা বাহির হইয়া আসিলেন, লুটাইয়া পড়িলেন ভক্তদের পায়ে!

এই সেই রাজার প্রাসাদ!

মন্দির হইতে স্বর্গদ্বারের পথের পাশেই ভক্তপ্রবর 'যবন' হরিদাসের কুটীর। মন্দির ও ভক্তগণের ছায়াও যেন তাঁহার পাদস্পর্শে মলিন না হয় সেই ভয়ে হরিদাস এই কুটীরেই তাঁহার পুরীবাসের দিনগুলি কাটাইয়া গিয়াছেন। স্বয়ং প্রভুই প্রত্যহ একবার আসিয়া তাঁহার সহিত এখানে মিলিত হইতেন। শ্রীরূপের ললিতমাধব ও বিদগ্ধমাধব নাটকেরও এখানেই আরম্ভ। যে বকুল* বৃক্ষের তলায় হরিদাস সিদ্ধিলাভ করেন সেই পরমাশ্চর্য সিদ্ধবকুল বৃক্ষটি দীর্ঘ চারিশত বৎসর যাবৎ শুধু বল্কলের উপরে দণ্ডায়মান। কথিত আছে, হরিদাসের মহাপ্রয়াণের

---

* কথিত আছে মহাপ্রভুর নিক্ষিপ্ত দণ্ডকাষ্ঠ হইতে এই বৃক্ষ উৎপন্ন হয়।

পরে রথচক্র নির্মাণের জন্য মহারাজ এই বৃক্ষটি ছেদন করিতে উদ্যত হন, হরিদাসের শিষ্যের আকুল মিনতি অগ্রাহ্য করিয়া। নিরুপায় শিষ্য সারারাত্রি চোখের জলে গুরুকে স্মরণ করিতে থাকেন। প্রভাতেই কি অদ্ভুত ঘটনা—দৃশ্য। দেখা গেল বৃক্ষের মূল অংশটি রূপান্তরিত হইয়াছে বল্কলে। অথচ চির সবুজ, সতেজ সেই বৃক্ষ।

আপন ইষ্টের সম্মুখে সেই মহাসাধক মহাপ্রয়াণ করিলেন।

কীর্তনান্তে সেই পূত দেহ কাঁধে করিয়া স্বয়ং প্রভু ভক্তগণসহ সমুদ্রতীরে আসিলেন। বালুকাশয্যায় মহাবৈষ্ণবের সমাধি রচিত হইল। সেই সমাধি সমুদ্রতীরে আজও বর্তমান।

মন্দিরের কাছেই কাশীমিশ্রের গৃহ, গম্ভীরা। বলিলেও চলে কিন্তু রাধাকান্ত-মঠ বলিলেই ঠিক হয়।

অঙ্গনের সামনেই মন্দির, আর সেই মন্দির আলো করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। রাধাকান্তের বিগ্রহ, পাশে শ্রীরাধা ও ললিতা বিশাখা, অনেক সখী। কাঞ্চী (?) হইতে আনা বিগ্রহ অপরূপ অঙ্গলাবণ্যে যেন জীবন্ত হইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। কথিত আছে, প্রভুর সময়েও এই বিগ্রহ ছিলেন এবং এইখানেই প্রভুর চোখে রাসলীলা প্রকট হইত। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি প্রামাণিক গ্রন্থে একথা উল্লেখিত নাই।

ভিতরে একটি গৃহে প্রভু থাকিতেন, ছোট্ট সেই গৃহখানি, সেই গম্ভীরা,—দ্বাদশ বৎসরের লীলা নিকেতন। এইখানে নিত্য পূজিত হয় প্রভুর পাদুকা, কমণ্ডলু ও ব্যবহৃত কাঁথার এতটুকু একখণ্ড।

অতি ছোট ঘর, ছোট তাহার দরজা, এই দরজাতেই একদিন মধ্যাহ্ন-আহার গ্রহণ করিবার পর দীর্ঘদেহ প্রভু আসিয়া শুইয়া পড়িলেন। সেবক গোবিন্দ প্রতিদিন এই সময়ে প্রভুর শরীরের ক্লান্তি দূর করিবার জন্য তাঁহার শরীর সংবাহন করেন। প্রভু দরজা জুড়িয়া আছেন অথচ দরজার অপর দিকে যাইতে না পারিলে অঙ্গসেবার সুবিধা হয় না, তাই প্রভুকে একটু সরিবার জন্য গোবিন্দ মিনতি করিতে লাগিলেন। কত যেন শ্রান্ত প্রভু বলিলেন, 'না গোবিন্দ আমার নড়িবার সাধ্য নাই। তুমি যাহা খুশি কর। প্রভু চোখ বন্ধ করিলেন।

বারবার বলিয়াও যখন ফল হইল না তখন গোবিন্দ আপন বহির্বাস দিয়া প্রভুর শ্রীঅঙ্গ আচ্ছাদিত করিয়া মনে মনে প্রণাম করিয়া প্রভুকে লঙ্ঘন করিয়াই ঐ দিকে গেলেন, মার্দন-সুখে প্রভু নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। প্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গেলে

ইচ্ছাকৃত নিদ্রা ভাঙ্গিয়া প্রভু যেন বিস্মিত হইয়াই গোবিন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এ কি গোবিন্দ ? তুমি খাইতে যাও নাই ?'

'আপনাকে লঙ্ঘন করিয়া কেমন করিয়া যাই ?'

'তবে আসিয়াছিলে কেমন করিয়া ?'

সে-উত্তর গোবিন্দ প্রভুকে আব কি দিবেন ; কিন্তু তিনি তো জানেন প্রভুর সবার জন্য কোটী নবকভোগও যে কাম্য !

এই একজন, আর একজন পণ্ডিত জগদানন্দ। পুরুষরূপ ধরিয়া যেন অভিমানিনী সত্যভামা আসিয়া গৌরের সেবার ভাব লইয়াছেন স্বহস্তে।

সারারাত্রি গম্ভীবার কঠিন ভিত্তিতলে প্রভু মাথা বাখিয়া শুইয়া থাকেন, প্রেমের তীব্র দহনে মাথা ঠুকিতে থাকেন যখন, জগদানন্দের অন্তর বিদীর্ণ হইতে থাকে। অতি সাহস করিয়া একটি তুলার বালিশ তৈরী করিয়া আনিয়াছেন, পাতিয়া দিয়াছেন ছেঁড়া কাঁথাটিব উপবে। দেখা-মাত্র প্রভু ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন—একি, শুধু বালিশ কেন ? একটি পালঙ্ক আনো ; একজন মর্দনিয়া রাখো তেল মর্দন করিতে, তবেই তোমাদের বাসনা পুর্ণ হয়। "জগদানন্দ চাহে মোরে বিষয় ভুঞ্জাইতে।" ' বালিশ দূরে নিক্ষিপ্ত হইল।

স্বরূপের কাছে খবর শুনিলেন জগদানন্দ, ওষ্ঠাধব দৃঢভাবে বদ্ধ হইয়া গেল, একটি কথাও বলিলেন না।

আবার গৌড় হইতে পুরী পর্যন্ত দীর্ঘ এতখানি পথ কতকটা চন্দনের তেল লইয়া আসিয়াছেন বড় আশা করিয়া ; বিনিদ্র রজনী জাগিয়া প্রভুর মাথা উত্তপ্ত হইয়া উঠে, তাই এই ঠাণ্ডা তেলটি ব্যবহার করিলে প্রভুর একটু সুখ হয়। স্বরূপ পণ্ডিতের ইচ্ছা প্রভুকে জানাইলেন। প্রভু বলিয়া উঠিলেন, 'অসম্ভব ! "সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র সর্বলোকে গায়", সুগন্ধি তেল মাখিয়া আমি পথে বাহির হইব আর লোকে আমার সন্ন্যাসের নিন্দা করিবে তাহা হইবে না। বরং পণ্ডিতকে বলিও, এ তেল মন্দিরে দিক্ আরতির সময়ে জ্বলিবে তাহাই ভালো হইবে।'

স্বরূপের মুখে একথাও জগদানন্দ শুনিলেন, দ্বিতীয় বার আর অনুরোধ করিলেন না। পরদিন প্রভু জগদানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন, 'তুমি বুঝি আমার জন্য চন্দনতেল আনিয়াছ ?' কথা শেষ হইতে পারিল না, জগদানন্দ বলিয়া উঠিলেন, কে বলিল তোমাকে, আমি তোমার জন্য তেল আনিয়াছি ? মিথ্যা কথা !' প্রচণ্ড গতিতে ঘর হইতে তেলের পাত্রটি আনিয়া প্রভুর সামনেই তাহা আছাড় মারিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন পণ্ডিত। সমস্ত অঙ্গনে তেল ছড়াইয়া পড়িল, বাতাস

ভরিয়া উঠিল সুগন্ধে, জগদানন্দ ঘরে দ্বার দিয়া উপবাসী পড়িয়া রহিলেন। তিন দিন উপবাসেই রুদ্ধগৃহে কাটিয়া গেল, ভক্তবৎসল প্রভু আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, দরজায় আঘাত করিয়া ডাকিলেন, 'জগদানন্দ! উঠ! আমি আজ তোমার ঘরে ভিক্ষা করিব।'

চোখে জল, মুখে হাসি, জগদানন্দ ভিক্ষার আয়োজন করিতে লাগিলেন। মধ্যাহ্নে আসিলেন প্রভু, বলিলেন, 'এসো জগদানন্দ, আজ তোমাতে আমাতে একসঙ্গে বসিয়া প্রসাদ পাই।' আর কি অভিমান থাকে? পণ্ডিত মিনতি করিয়া প্রভুকে বসাইলেন, 'তুমি খাও প্রভু! আমি কথা দিতেছি, আমি পরে প্রসাদ পাইব।'

অন্ন গ্রহণ করিয়া প্রভু বলিয়া উঠিলেন, 'আহা ক্রোধের রান্না বুঝি এমনই সুস্বাদু হয়।'

* * *

এই গম্ভীরার ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে সাধারণ লোক-লোচনের অন্তরালে যে বৃহৎ গম্ভীর-লীলা একাদিক্রমে দ্বাদশবর্ষ ধরিয়া অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহারই বর্ণনা করিতে গিয়া কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

রাধিকার চেষ্টা যৈছে উদ্ধব দর্শনে,
এইমত দশা প্রভুর হয় রাত্রি দিনে।

অশ্রু, স্তম্ভ, বৈবর্ণ্য, পুলক, স্বেদ—লোমকূপে রক্তোদ্গম দন্ত হালিয়া পড়ে, হস্তপদের সন্ধিগুলি কখনও বিচ্ছিন্ন, কখনও ঐ সকল অঙ্গই আবার যেন শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে, এই অবস্থায় রাধাভাব-বিভাবিত গৌরসুন্দর মাত্র দুইজন অন্তরঙ্গ ভক্ত সঙ্গে লইয়া কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদ করিতেছেন, যেই জন্য তাঁহার অবতার!

কখনও স্বরূপের, কখনও রায় রামানন্দের কণ্ঠ ধরিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিতেছেন, ' "সখিরে শুন মোর হত বিধিবল। আমার তনু, মন, চিত্ত কৃষ্ণ বিনা সকলি বিফল!" আমার শ্রবণ, নয়ন, জিহ্বা সমস্তই অসার গো সখী! তাহারা যে কৃষ্ণকথা শোনে না, কৃষ্ণরূপ দেখে না, কৃষ্ণকথা তো বলে না, ধিক্ ধিক্ এই জীবনে কই কৃষ্ণ তো তাহা গ্রহণ করিলেন না।'

আবার বলিতেছেন, 'ওগো সখী, কৃষ্ণ তো দর্শন দেনই না, তবুও যদিই কোনও শুভক্ষণে বা স্বপ্নে কৃষ্ণের দর্শন পাই, অমনি "আনন্দ" আর "মদন' এই দুই বৈরী আসিয়া উপস্থিত হয়, আমি নেত্র ভরিয়া আর তাঁহাকে দেখিতে পাই না!'

'হায়রে হায়! আর কি কখনও কৃষ্ণ আমাকে দেখা দিবেন? কিন্তু আশা যে ছাড়িতেও পারি না'—

পুনঃ যদি কোনও ক্ষণ করায় কৃষ্ণ দরশন,
তবে সেই ঘটি, ক্ষণ, পল
দিয়া মাল্যচন্দন নানারত্ন আভরণ
অলঙ্কৃত করিমু সকল!

কাঁদিতে কাঁদিতে হঠাৎ যেন বিস্মৃত চেতনা ফিরিয়া আসিল, সম্মুখে স্বরূপ ও রায়কে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমি না কৃষ্ণচৈতন্য? এতক্ষণ স্বপ্নে যেন কি দেখিলাম, কি যেন প্রলাপ বকিলাম, তোমরা কি কিছু শুনিয়াছ?' সেই স্বপ্নস্মৃতিই আবার জাগ্রত হইল, আবার চৈতন্য লুপ্ত হইতেছে, আবাব 'হায়, হায়' করিয়া এক শ্লোক উচ্চারণ করিতেছেন—

কই অবরহিঅং পেম্মং, ণহি হোই মানুষে লোত্র,
জই হোই কস্সে বিরহো বিরহে হোন্তম্মি কো জা অই॥

'অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, সে কি সখী! মানুষের হয়? জম্বুনদ হেমসম সেই প্রেম একবার হইলে আব কি তাহার বিয়োগ হয়, না বিয়োগ হইলেও লোকে বাঁচে?'

আবার হাহাকার করিয়া বলিতেছেন, 'কোথায় আমার কৃষ্ণপ্রেম! কেবল মিথ্যা দম্ভ লইয়া মরিতেছি, আমাব এ ক্রন্দনও যে মিথ্যা; কৃষ্ণপ্রেম শুদ্ধ সুনির্মল, তাহা বহু দূরে; "তবে যে করি ক্রন্দন, স্বসৌভাগ্য প্রখ্যাপন করি, ইহা জানিও নিশ্চয়।" এ শুধু নিজের সৌভাগ্য যেন মানুষকে দেখানো।'

এই মত দিনে দিনে স্বরূপ রামানন্দ সনে
নিজভাব কবেন বিদিত
বাহ্যে বিষজ্বালা হয় ভিতরে অমৃতময়,
কৃষ্ণপ্রেমাব অদ্ভুত চরিত।
এই প্রেমার আস্বাদন তপ্ত ইক্ষু চর্বণ
মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন,
সেই প্রেমা যার মনে তার বিক্রম সেই জানে
বিষামৃতে একত্র মিলন। —চৈতন্যচরিতামৃত।

কৃষ্ণপ্রেম-বিষে তনুমন দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, কিন্তু ভিতরে অমৃত-রসধারার প্লাবন! নানা ভাবের প্রাবল্য যেন মত্ত গজের ন্যায় প্রভুর দেহ-ইক্ষুবন ভাঙ্গিয়া-

চুরিয়া দিতে লাগিল, গম্ভীরার ভিত্তির কঠিন পাষাণতলে মুখ ঘষিয়া মাথা ঠুকিয়া প্রভু কাঁদিতে লাগিলেন—

হে দেব, হে দয়িত, হে ভুবনৈকবন্ধো,
হে কৃষ্ণ, হে চপল, হে করুণৈকসিন্ধো,
হে নাথ, হে রমণ, হে নয়নাভিরাম,
হা হা কদানু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে।

'হে দেব, হে দয়িত! হে ভুবনের বন্ধু! হে কৃষ্ণ, হে চপল, হে করুণাসিন্ধু! হে নাথ, হে রমণ, হে নয়নাভিরাম, হা হা কবে তুমি আমার নয়নদ্বয়ের গোচরীভূত হইবে?'

মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ

১৪৩১ শকের মাঘী সংক্রান্তি শুক্লপক্ষে সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া প্রভু নীলাচলে আসিলেন, সঙ্গী শ্রীনিত্যানন্দ, জগদানন্দ, মুকুন্দ ও দামোদর পণ্ডিত। নীলাচলে আসিবার অব্যবহিত পরেই বাসুদেব সার্বভৌমকেও ভক্তিপথে আনিয়াছেন প্রভু, বৈদান্তিক পণ্ডিত সার্বভৌমের জীবনে আনিয়াছেন অভিনব আনন্দ! কিন্তু সার্বভৌমের নবলব্ধ আনন্দকে পূর্ণ বিকাশের সুযোগ না দিয়াই প্রভু অকস্মাৎ দক্ষিণদেশে একলা ভ্রমণের জন্য ব্যাকুল হইয়া সকলের অনুমতি চাহিলেন, তিনি অগ্রজ বিশ্বরূপের সন্ধানে বাহির হইবেন।

সকলেই বুঝিলেন, বিশ্বরূপের সন্ন্যাস ও শঙ্করারণ্য নামগ্রহণ এবং তাঁহার সিদ্ধিপ্রাপ্তির খবর অন্যান্যের মতোই প্রভুরও জানা, তথাপি প্রভুর এই যাত্রা, আসলে দক্ষিণদেশ উদ্ধারের জন্য একটি ছলমাত্র।

শ্রীনিত্যানন্দ বলিলেন, 'দক্ষিণদেশের পথ সব আমার জানা, আমাকে তুমি সঙ্গে লও, কিন্তু প্রভু অসম্মত হইয়া বলিলেন, 'তোমরা কৃপা করিয়া আমাকে নীলাচলে আনিয়া দিয়াছ, তোমাদের কাছে আমি ঋণী, কিন্তু কিছুকাল আমাকে একটু একলা থাকিতে দাও, আমি তীর্থ ভ্রমণ করিয়া আসি। তোমাদের স্নেহের অত্যাচার হইতে কিছুদিন আমাকে একটু মুক্তি দাও, আমি সন্ন্যাসী, কিন্তু সন্ন্যাসের কঠোর বিধি পালনের স্বাধীনতা আমার নাই, আমার কৃচ্ছ্রতাদর্শনে তোমাদের হৃদয় বিদীর্ণ হয়, আমার প্রতি পদক্ষেপের উপরেই তোমাদের নিয়ত সজাগ দৃষ্টি, তোমরা যেভাবে চালাও সেইভাবেই আমাকে চলিতে হয়, এইবার

দয়া কর, বেশী দিন নয়; কিছুদিন আমাকে একা থাকিতে দাও।' ভক্তগণ নীরব হইলেন।

এইবার পণ্ডিত সার্বভৌমের অনুমতি চাহিলেন প্রভু। কাতর কণ্ঠে পণ্ডিত মিনতি করিতে লাগিলেন, 'আমার এই শুষ্ক দীর্ণ হৃদয়কে মাত্র সংশোধন করিয়া এখনই তুমি চলিয়া যাইও না প্রভু! আরো কিছুদিন থাকো।'

সার্বভৌমের অনুরোধ রক্ষা করিয়া আর দুই-চারি দিন প্রভু নীলাচলে রহিলেন।

সকলের আকুল মিনতিতে, জলপাত্র, বহির্বাসাদি বহন করিবার জন্য কৃষ্ণদাস নামক এক সরল সহজ ব্রাহ্মণকে সঙ্গে লইতে স্বীকৃত হইলেন।

শ্রীজগন্নাথকে প্রদক্ষিণ করিয়া সমুদ্রতীরে আলালনাথের পথে প্রভু যাত্রা করিলেন। আসন্ন যাত্রার মুহূর্তে সার্বভৌম প্রভুর পদপ্রান্তে নিবেদন করিলেন 'প্রভু! এতদিন যাঁহার মহিমা বুঝি নাই, "বৈষ্ণব" বলিয়া কত না উপহাস করিয়াছি, সেই রসিকশ্রেষ্ঠ, ভক্তোত্তম রায় রামানন্দ আছেন গোদাবরী তীরে বিদ্যানগরে, তুমি তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইও, পৃথিবীতে এইরূপ ভক্ত আর আছেন কি না আমার জানা নাই।'

প্রভু সানন্দে ভট্টের বাক্য অঙ্গীকার করিলেন। আরম্ভ হইল প্রভুর সম্মুখযাত্রা. পশ্চাতে পড়িয়া রহিলেন মূর্ছিতপ্রায় ভট্ট। প্রভু ফিরিয়া তাকাইলেন না।

নবদ্বীপের চারজন সঙ্গী ও গোপীনাথসহ প্রভু আলালনাথে আসিলেন। আলালনাথকে দর্শন করিয়া প্রেমে প্রভু নৃত্য-গীত করিতে লাগিলেন, অদ্ভুত-এই-প্রেমাবেশ দর্শন করিবার জন্য ক্রমেই লোকসংঘট্ট বাড়িতে লাগিল। তপ্তকাঞ্চনবর্ণ দীর্ঘ সুবলিত তনু, অরুণ বসন, নয়নে পুলকাশ্রু. দেহের ভূষণ কম্প, স্বেদ ;—স্তব্ধ বিস্ময় ও ভক্তিতে সহস্র সহস্র লোক চাহিয়া আছেন প্রভুর দিকে, অবিরাম আসিতেছে মানুষের ধারা!

বেলা শেষ হইতে চলিল, তথাপি লোকসংঘট্ট কমে না দেখিয়া শ্রীপাদ নিত্যানন্দ কোনও রূপে প্রভুকে মন্দিরে আনিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন। বাহির হইতে আসিতেছে সহস্র কণ্ঠের কাতর আহ্বান. 'প্রভু! একবার দর্শন দাও. বহু কষ্টে. বহু দূর হইতে আমরা আসিয়াছি, আমাদের ফিরাইয়া দিও না দয়াল!'

শ্রীপাদ নিত্যানন্দাদির চেষ্টায় কোনও মতে স্নান ভোজন শেষ করিয়াই প্রসন্ন শ্রীমুখে প্রভু আসিয়া দাঁড়াইলেন বাহিরে, জনতা আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিল। নিত্যানন্দ হাসিয়া সঙ্গীগণকে বলিলেন, 'এমনই ঘটিবে প্রতিদিন, প্রতি গ্রামে.

প্রান্তরে-লোকালয়ে, এইরূপেই জীব উদ্ধার করিতে করিতে সমগ্র দক্ষিণভারত ভ্রমণ করিবেন প্রভু।'

পরদিন আরম্ভ হইল প্রভুর একক পদযাত্রা, সঙ্গীগণ পড়িয়া রহিলেন পশ্চাতে, ঊর্ধ্ব আকাশের পানে দুই দীর্ঘ সুবলিত বাহু তুলিয়া বদনে কৃষ্ণ নাম উচ্চারণ করিতে করিতে চলিলেন প্রভু—

কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হে
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ রক্ষ মাম্।
রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম্
কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম্॥

বন্ধুর দুর্গম পথে চলিয়াছেন নবীন সন্ন্যাসী, পতিতপাবন গৌর, করুণায় দিক্-দিগন্ত পুণ্যস্নিগ্ধ করিয়া। যিনিই একবার এই রূপ দর্শন করিতেছেন, যাঁহার কর্ণে একবার সেই শ্রীমুখোচ্চারিত সুমধুর নাম প্রবেশ করিতেছে, তিনিই আকুল কণ্ঠে বলিতেছেন 'হরি হরি, হরে কৃষ্ণ'! এবং প্রভুর অনুসরণ করিতেছেন, গৃহের কথা, আত্মীয়জনের কথা মনে নাই, যেন জীবনের চরম পাওয়া পূর্ণ হইয়া গিয়াছে, আর কিছু চাওয়ার নাই।

প্রভু একবার যাঁহার অঙ্গ স্পর্শ করিতেছেন তিনিই পূর্ণ হইতেছেন নামের শক্তিতে, অপার্থিব আনন্দে অভিষিক্ত হইতেছে তাঁহার দেহ মন প্রাণ, আবার তিনি যাঁহাকে স্পর্শ করিতেছেন তিনিও পূর্ণ হইতেছেন এক দিব্য শক্তিতে, একের স্পর্শে অপরে, এইভাবে মুহূর্তে রূপান্তর ঘটিতেছে সর্ব মানবচিত্তের, গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, দিক্ হইতে দিগন্তরে ব্যাপ্ত হইতেছে ভুবনমঙ্গল নাম, আকাশ বাতাস ভরিয়া যাইতেছে কৃষ্ণনামের মাধুর্যে!

চলিতে চলিতে কূর্মস্থানে পৌঁছিয়া, 'কুষ্ঠী বিপ্র'কে উদ্ধার করিয়া প্রভু তৃষিত অন্তরে ভক্তশ্রেষ্ঠ রায় রামানন্দের সঙ্গে মিলনের আশায় আসিয়া বসিলেন গোদাবরী তীরে, বিদ্যানগরে। মিলন হইল, এবং সেই নিবিড়তম গভীর মিলনালিঙ্গনে ভক্ত ও ভগবান দুইজনেরই বক্ষ ভরিয়া গেল সুধারসে। দশ দিন রায়ের সঙ্গে কাটাইয়া, তাঁহাকে নীলাচলে যাওয়ার অনুরোধ করিয়া প্রভু যাত্রা করিলেন দাক্ষিণাত্যের পথে।

শুষ্কজ্ঞানী, তার্কিক, ধর্মহীন 'পাষণ্ডী' লোকপূর্ণ ছিল দক্ষিণদেশ; মুষ্টিমেয় ঐশ্বর্যরসাশ্রয়ী ভক্ত এবং মরমী সিদ্ধ-সাধকও যে না ছিলেন তাহা নয়। প্রভুর দর্শনে ও স্পর্শে সকলেই ভক্ত বৈষ্ণব হইতে লাগিলেন, যে উদ্দেশ্যে প্রভুর সেই দেশে

গমন, তাহা সিদ্ধ হইল। আবার মাঝে মাঝে কেহই যে প্রভুর কার্যে বাধার সৃষ্টি করেন নাই তাহাও নয়। এক বৌদ্ধ আচার্য প্রথমে নানাবিধ কুটতর্ক ও অসার পাণ্ডিত্যের জোরে প্রভুকে পরাজিত করিতে গিয়া নিজেই যখন পরাভূত হইলেন তখন অপরিসীম ক্রোধে তিনি অন্ধ হইয়া উঠিলেন; প্রভুকে অপমান করার জন্য অমেধ্য, অশুচি, অন্নপূর্ণ এক থালি আনিয়া বিষ্ণুর প্রসাদ বলিয়া প্রভুকে দিলেন। 'প্রসাদ' বলিয়া কথিত অন্নের অমর্যাদা করা প্রভুর পক্ষে অসম্ভব, তিনি থালি গ্রহণ করিয়া দুইহস্তে তাহা উর্ধ্বে তুলিয়া চলিতে লাগিলেন। কোথা হইতে এক মহাকায় পাখী আসিয়া ঠোঁটে করিয়া থালাখানি লইয়া আকাশে উড়িতে লাগিল, অকস্মাৎ সেই থালাখান বৌদ্ধাচার্যের মাথায় পড়িয়া আচার্য অচৈতন্য হইয়া রহিলেন। তখন শিষ্যগণ কাঁদিতে কাঁদিতে প্রভুর পায়ে পড়িলে প্রভু তাঁহাদের গুরুকে নামামৃতপ্রসাদ-দানে সুস্থ করিয়া দিয়া চলিয়া গেলেন আপন গন্তব্যপথে।

ত্রিমল্ল, শিবকাঞ্চী, বিষ্ণুকাঞ্চী প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করিয়া, শিব শক্তি সমস্ত বিগ্রহকে বন্দনা, অর্চনা করিয়া চলিতেছেন প্রভু। যিনি ঈশ্বর, যিনি ধর্মসংস্থাপক তাঁহার যে কোনও ভেদ নাই, যিনি কৃষ্ণ তিনিই শিব, তিনিই যে শক্তি ও শক্তিমান তাহাই দেখাইতেছেন প্রভু প্রতি তীর্থে, প্রতি বিগ্রহের অর্চনা করিয়া।

শিয়ালী ভৈরবী দেবী, অমৃতলিঙ্গ শিব, প্রভৃতি তীর্থ দর্শনান্তে প্রভু শ্রীরঙ্গনাথে উপস্থিত হইলেন। বিগ্রহ দর্শন মাত্রে আরম্ভ হইল অদ্ভুত অলৌকিক প্রেমের প্রকাশ। দক্ষিণভারতের শ্রেষ্ঠ তীর্থ শ্রীরঙ্গনাথ, দেশ-বিদেশ হইতে লক্ষ লক্ষ লোকের সমাগম এই তীর্থে, তাই করুণাঘন প্রভু এই তীর্থে কিছুকাল অবস্থান করিবার বাসনা করিলেন। বেঙ্কটভট্ট নামক এক ভক্তের আগ্রহে ও ব্যাকুলতায় তাঁহার গৃহে চারিমাস বাস করিয়া চাতুর্মাস্য ব্রত উদ্‌যাপন করিতে প্রভু স্বীকৃত হইলেন। কৃষ্ণকথারসে চারিমাস কোথা দিয়া কাটিতে লাগিল প্রভু ও ভট্ট কেহই তাহা বুঝিতে পারিলেন না।

প্রভু লক্ষ্য করিলেন প্রতিদিনই এক দীনহীন ব্রাহ্মণ মন্দিরের এক নিভৃত কোণে বসিয়া গীতাপাঠ করেন, অশুদ্ধ উচ্চারণ, অশুদ্ধ তাঁহার অধ্যয়ন কিন্তু কি বিশুদ্ধ আনন্দে যেন ব্রাহ্মণের হৃদয়খানি পূর্ণ এবং তাহারই উজ্জ্বল অভিব্যক্তি তাঁহার বদনে, তাঁহার নয়নে! চারিদিকে লোক, কেহ হাসিতেছে, কেহ করিতেছে উপহাস, কিন্তু ব্রাহ্মণের তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই।

একদিন বিপ্রের পাঠ-সমাপনান্তে প্রভু তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন 'ব্রাহ্মণ!

গীতার কোন্ তথ্য, কোন্ বাক্যে আপনি এত আনন্দলাভ করেন ,তাহা আমাকে কৃপা করিয়া বলিবেন কি ?'

হাসিয়া কাঁদিয়া বিপ্র বলিলেন, 'আমি মূর্খ, শব্দার্থও জানি না, তথ্যও বুঝি না, শুদ্ধাশুদ্ধ পাঠ করিয়া যাই, কিন্তু যতক্ষণ পাঠ করি আমি দেখিতে পাই—

অর্জুনের রথে কৃষ্ণ হঞা রজ্জুধর,
বসিয়াছে হাথে তোত্র* শ্যামল সুন্দর।
অর্জুনেরে কহিতেছে হিত উপদেশ,
তাহা দেখি হয় মোর আনন্দ আবেশ।—চৈঃ চঃ

'প্রভু! যতক্ষণ পাঠ করি ততক্ষণই এই নয়নাভিরামের দর্শন পাই, তাই পাঠ ছাড়িতে আমার মন চায় না।' পরমানন্দে সেই বিপ্রকে হৃদয়লগ্ন করিয়া প্রভু বলিলেন, 'ওগো ব্রাহ্মণ! তুমি মূর্খ নও, তুমি দ্বিজোত্তম, গীতাপাঠে তোমারই অধিকার!'

পুলকে, আনন্দে পরিপ্লুত হইয়া ব্রাহ্মণ প্রভুর চরণে লুটাইয়া পড়িলেন; বলিলেন, 'কিন্তু তুমি কে গো ? আমার মন যে বলে যাঁহার প্রতিরূপ আমি দর্শন করি, তিনিই রূপ ধরিয়া আসিয়াছেন আমার সম্মুখে! বলো তুমি কি তিনিই ?' সরল, সৌভাগ্যবান বিপ্রকে প্রভু স্বরূপ দেখাইলেন। প্রভুর চরণে নিজেকে নিঃশেষে বিলাইয়া দিয়া বিপ্র ধন্য হইলেন।

বেঙ্কটভট্ট লক্ষ্মীনারায়ণ বিগ্রহের উপাসক; ঐশ্বর্যময় ভজন, মাধুর্য রসের আস্বাদনে তিনি বঞ্চিত। প্রভু একদিন পরিহাস ছলে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভট্ট তোমার লক্ষ্মীঠাকুরাণী পতিব্রতা সাধ্বীশিরোমণি, বিষ্ণুবক্ষবিহারিণী হইয়াও তিনি কৃষ্ণ-সঙ্গম লালসা করিলেন কেন ?'

ভট্ট বলিলেন, 'প্রভু! তাহাতে দোষ কি ? তুমিই তো জানো কৃষ্ণ নারায়ণ একই স্বরূপ!'

প্রভু বলিলেন, 'তবে রাসস্থলীতে, শ্রুতিগণ, গ্রাম্য আহিরিণী গোপীগণ কৃষ্ণসঙ্গম পাইলেন, কিন্তু লক্ষ্মী পাইলেন না কেন ?'

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজসুন্দরীনাম্।—ভাঃ ১০।৪৭।৬০

---

* চাবুক।

রাসোৎসবে ভগবানের ভুজলতাদ্বারা কণ্ঠালিঙ্গিতা ব্রজসুন্দরীগণ যে পরম প্রসাদ লাভ করিলেন, বিষ্ণুবামবক্ষঃস্থিতা লক্ষ্মীদেবী কেন তাহা পাইলেন না ?

ভট্ট বলিলেন, 'প্রভু ! তোমার সুগভীর লীলারহস্য তুমিই জানো এবং কৃপা করিয়া যাহাকে জানাও সেই জানে। ক্ষুদ্র জীবাধম, ঈশ্বরকৃপালেশহীন আমাকে কেন ইহা জিজ্ঞাসা করিতেছ ?'

প্রভু হাসিয়া বলিলেন, 'ভট্ট ! কৃষ্ণ ও বিষ্ণু একই স্বরূপ, কিন্তু বিষ্ণু ষড়ৈশ্বর্যময় বিরাট, আর কৃষ্ণ শৃঙ্গাররসরাজমূর্তি, মাধুর্যময় ! ব্রজে তাঁহার মাধুর্যের পূর্ণ বিকাশ, ঐশ্বর্যের স্থান সেখানে নাই। ব্রজজনের হৃদয়ধন—কেহ তাঁহাকে বন্ধন করেন, কেহ তাঁহার স্কন্ধে আরোহণ করেন, কেহ তাঁহাকে দিয়া নিজের চরণ ধারণ করাইতেও কুণ্ঠিত হন না।

ব্রজের ভজন শুদ্ধ রাগানুগা, কেবলারতিময়, তাহার কাছে কৃষ্ণের ভগবত্তা সম্পূর্ণ লুক্কায়িত ! নিজের ঈশ্বরত্বের কথা ভুলিয়া থাকিবার জন্য যোগমায়ার কাছে কৃষ্ণের কত না মিনতি—'দেবী আমাকে ভুলাইয়া দাও, আমার ঐশ্বর্যের, আমার ক্ষমতার হাত হইতে তুমি আমাকে মুক্তি দাও, যেন, "আমিহ না জানি না জানে গোপীগণ," আমি যে ঈশ্বর তাহা আমাকেও বুঝিতে দিও না, গোপীগণকেও বুঝিতে দিও না। আমার এই বাহিরের আবরণটিকে বাহিরেই ফেলিয়া রাখিয়া ব্রজের নিভৃত মাধুর্যসিন্ধুতে একবার আমাকে নিমজ্জিত হইতে দাও।'

সেই ব্রজের গোপন মধুর রসে নিমজ্জিত হইয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণ—পূর্ণব্রহ্ম, আপনাকে ভুলিয়া, ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য লইয়া লক্ষ্মী কেমন করিয়া ডুবিবেন সেই রসে ? গোপী-অনুগত না হইলে সেখানে কাহারও তো প্রবেশাধিকার নাই। লাবণ্যামৃত, কারুণ্যামৃতধারায় স্নিগ্ধ-স্নাতা গোপীগণ, কৃষ্ণ তাঁহাদের পরমধন ; ব্রজের "গোপবেশ বেণুকর নবকিশোর নটবর"ই তাঁহাদের কাম্য, ঐশ্বর্যময় নারায়ণে তাঁহাদের কোনও প্রয়োজন নাই এবং মাধুর্যময় কৃষ্ণেরও ঐশ্বর্যময়ী লক্ষ্মীতে কোনও প্রয়োজনই নাই !'

প্রভুর কথায় ভট্টের মুখখানি বোধ করি করুণ হইয়া উঠিল, তাই করুণাময় হাসিয়া বলিলেন, 'ভট্ট ! তুমি পরম বিজ্ঞ, পরম ভক্ত, দুঃখ পাইলে কেন ? তুমিই তো বলিলে কৃষ্ণ আর নারায়ণ একই স্বরূপ—তবে লক্ষ্মী আর গোপী ভিন্ন হন কেমন করিয়া ? "ঈশ্বরেতে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ', ঈশ্বরে ভেদ নাই, লক্ষ্মীই গোপীরূপে কৃষ্ণসঙ্গ-সুধা আস্বাদন করেন, তাহাতে সংশয় নাই।

ভট্ট শান্ত হইলেন, মাধুর্যরসে তাঁহার চিত্ত আপ্লুত হইয়া গেল।

এইবার যাত্রার পালা ; বিচ্ছেদকাতর ভট্টকে শ্রীরঙ্গনাথে রাখিয়া প্রভু চলিলেন আরও দক্ষিণে। ঋষভ পর্বতে আসিয়া প্রভু শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর প্রিয় শিষ্য শ্রীপরমানন্দপুরীর চরণ দর্শন পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। পুরীজিকে নীলাচলে গিয়া থাকিবার অনুরোধ জানাইয়া প্রভু যাত্রা করিলেন এক পথে, পুরীজি অন্য পথে।

শ্রীশৈলে আসিয়া প্রভু এক ব্রাহ্মণদম্পতির সাক্ষাৎ লাভ করিলেন, তাঁহাদের নিমন্ত্রণে তিন দিন তাঁহাদের গৃহে পরমানন্দে ভিক্ষা করিলেন, নিভৃতে বসিয়া কি আলাপ করিলেন তাঁহাদের সঙ্গে কে জানে? তিন দিন পরে তাঁহাদের অনুমতি লইয়া প্রভু চলিলেন দক্ষিণে। সঙ্গী কৃষ্ণদাস বা অপর কেহই জানিল না ব্রাহ্মণদম্পতির ছদ্মবেশে যাঁহারা প্রভুকে বিদায় দিলেন তাঁহারা হরপার্বতী।

কামকোষ্ঠী হইয়া প্রভু দক্ষিণ মথুরায় উপস্থিত হইলেন। প্রভুর আকৃতি-দর্শনে আকৃষ্ট হইয়া রামভক্ত এক বিপ্র মধ্যাহ্নভিক্ষার নিমন্ত্রণ করিয়া স্বগৃহে প্রভুকে লইয়া গেলেন। মধ্যাহ্ন অতিক্রান্তপ্রায়, অথচ ভিক্ষার কোনও আয়োজন নাই দেখিয়া বিস্মিত প্রভু ব্রাহ্মণকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কি যেন এক নেশায় আচ্ছন্ন বিপ্র উত্তর দিলেন, 'প্রভু! আমি অরণ্যবাসী, এখানে কিছুই মিলে না, লক্ষ্মণ বন্য ফলমূল আনিবেন তবে তো সীতাদেবী রন্ধন করিবেন?' বিপ্রের ইষ্টতন্ময়তা দর্শনে প্রভু পরম প্রীত হইলেন। বহুক্ষণ পরে, যেন ক্ষণিকের জন্য আবেশমুক্ত হইয়া, সামান্য আয়োজন করিয়া বিপ্র প্রভুকে ভিক্ষা করাইলেন, কিন্তু নিজে রহিলেন উপবাসী! তখন প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ব্রাহ্মণ! কি আপনার গভীর বেদনার কারণ ; কেন আপনি উপবাস করিতেছেন, কৃপা করিয়া আমাকে বলিবেন কি?'

বেদনাহত কণ্ঠে, গভীর দুঃখে বিপ্র বলিলেন, 'প্রভু! জগৎ-মাতা সীতাদেবীকে মত্ত অসুর রাবণ তাহার কামনাকলুষিত হস্তে স্পর্শ করিল, এই কথা শ্রবণ করিয়াও, আজও কেন নির্লজ্জ এই প্রাণ বাহির হইতেছে না, তাই এই প্রাণ বিসর্জন করিব স্থির করিয়াছি।'

অভয়রূপী প্রভু বলিলেন, 'বিপ্র! তুমি ভক্তশ্রেষ্ঠ হইয়াও এত বড় ভুল করিতেছ কেন? জগৎলক্ষ্মীর চিন্ময় দেহে কামনাকলুষিত রাবণের স্পর্শ? স্পর্শ দূরে থাকুক প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দ্বারা তাঁহার দর্শনও যে অসম্ভব! তুমি শান্ত হও, রাবণ চিন্ময়ী সীতাদেবীর চরণরেণু স্পর্শ করিবারও অধিকারী নয়, সে মায়া-সীতাকে স্পর্শ করিয়াছিল।'

প্রভুর বাক্যে বিপ্র যেন কিছু আশ্বাস ও সান্ত্বনা লাভ করিলেন।

তারপর প্রভু যাত্রা করিলেন সেতুবন্ধ ও রামেশ্বরের পথে। ভারতের এক প্রান্ত হইতে পদযাত্রা করিয়া প্রভু আসিয়া পৌঁছিলেন অপর প্রান্তে, কলিহত জীবের দুঃখে হৃদয় কাঁদিতেছিল তাই দেশে দেশে, দ্বারে দ্বারে গিয়া নামপ্রেম বিতরণ করিলেন, ভক্তগণের প্রাণধন, বিষ্ণুপ্রিয়ার জীবনবল্লভ গৌর!

যদি গৌর না হইত কি দশা হইত
কেমনে ধরিতাম দে!

কষিতকাঞ্চনবর্ণ তনুখানি ম্লান হইয়া গিয়াছে দুর্গম দূর তীর্থপথ অতিক্রমণে, দুই সুকোমল রক্তচরণে লাগিতেছে কত কঠিন রুক্ষ পাষাণের আঘাত, তথাপি বিরামবিহীন চলিতেছেন প্রভু দুর্গম অজানিতের পথে!

রামেশ্বরে পৌঁছিলেন। সেখানে একদিন বিপ্রসভায় পুরাণ পাঠ শুনিতেছেন, সহসা কর্ণে আসিল 'পতিব্রতা উপাখ্যানে'র এক হৃদয়গ্রাহী ব্যাখ্যা। উৎকর্ণ প্রভু শুনিলেন—'রাবণ যাহাকে হরণ করিয়াছিলেন তিনি প্রকৃত সীতা নহেন, রাবণের আগমন মাত্রই সীতা অগ্নির স্মরণ গ্রহণ করেন, এবং অগ্নি অপ্রাকৃতা জগৎলক্ষ্মীকে নিয়া এক মায়া সীতাকে রাখিয়া যান, রাবণ তাঁহাকেই হরণ করেন। রাবণবধের পর শ্রীরাম যখন মা জানকীর অগ্নিপরীক্ষা গ্রহণ করেন, তখন প্রজ্বলিত অনলশিখা হইতে উঠিয়া আসেন শুচিস্মিতা কল্যাণী বিশ্বলক্ষ্মী, মায়া-সীতা অন্তর্হিতা হন।'

পরমানন্দে প্রভু পুঁথি হইতে ঐ পৃষ্ঠাটি লইয়া ইহার এক প্রতিলিপি করেন এবং তাহা পুঁথিতে সন্নিবিষ্ট করিয়া দক্ষিণ-মথুরাবাসী রামভক্ত বিপ্রের প্রত্যয়ার্থে পুঁথির পৃষ্ঠাখানি লইয়া পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন দক্ষিণ-মথুরায়। পুঁথি দেখিয়া এতদিনে বিপ্রের হৃদয় হইতে সকল দ্বিধা, সকল সংশয় মুহূর্তেই দূরীভূত হইয়া গেল। প্রভুর চরণ বক্ষে ধারণ করিয়া বিপ্র কাঁদিতে লাগিলেন, বলিলেন, "ওগো দয়াল! তুমি স্বয়ং রঘুনাথ, দুর্বাদলশ্যাম রাম, গৌর সন্ন্যাসীবেশে আমার কাছে আসিয়াছ আমাকে কৃপা করিতে। সেদিন মনের গভীর দুঃখে তোমাকে আমি ভালো করিয়া ভিক্ষা দিই নাই, আজ তুমি আমার ভিক্ষা অঙ্গীকার কর।'

বিপ্রের বাসনা পূর্ণ করিয়া পরদিন প্রভু আবার যাত্রা করিলেন পথে। কন্যাকুমারী দর্শনান্তে মল্লারতীর্থে আসিলেন। সেই দেশে, ভট্টমারী নামে একদল বামাচারী সন্ন্যাসী থাকিতেন, 'স্ত্রী-ধন' দেখাইয়া তাঁহারা প্রভুর সঙ্গী কৃষ্ণদাসকে প্রলুব্ধ করিলেন বোধহয়, প্রভুকে না বলিয়া এক রাত্রিতে কৃষ্ণদাস তাঁহাদের দলে

প্রবেশ করিলেন। যিনি বিশ্বের পরিত্রাতা তাঁহার নিকট হইতে কৃষ্ণদাস কোথায়, কোন্ মোহগর্তে পড়িয়া নরকদাহ ভোগ করিবেন? প্রভু তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিলেন। কিন্তু ভট্টমারীগণ কৃষ্ণদাসকে ছাড়িবেন না। অনেক অনুরোধ করিলেন, কিন্তু প্রভুর অনুরোধে কর্ণপাত করা দূরে থাকুক, তাঁহারা অস্ত্র লইয়া প্রভুকে আক্রমণ করিলেন। কিন্তু নিজেদের অস্ত্র যখন নিজেদেব মস্তকে পড়িতে লাগিল, তখন তাঁহাদের সেই বিভ্রান্তির সুযোগে কেশাকর্ষণ করিয়া প্রভু কৃষ্ণদাসকে উদ্ধার করিয়া লইয়া আসিলেন।

সেখান হইতে পয়স্বিনী-তীরে আসিয়া আদিকেশব দর্শন করিয়া প্রভু প্রেমে মগ্ন হইলেন। অপরূপ এই পবমপুরুষেব অলৌকিক প্রেমদর্শনে সেখানকার ভক্ত বৈষ্ণবগণ আনন্দে বিস্ময়ে অধীর হইলেন। ঐ স্থানে বৈষ্ণবেব পরমপ্রিয়, পরমারাধ্য 'ব্রহ্মসংহিতাধ্যায়' গ্রন্থখানি পাইয়া প্রভুর আনন্দেব যেন সীমা বহিল না। তিনি সযত্নে তাহা নকল করাইয়া সঙ্গে লইয়া চলিলেন। সেইখান হইতে শৃঙ্গেরী মঠ, মৎস্যতীর্থাদি দর্শনান্তে প্রভু শ্রীমৎ মধ্বাচার্য-প্রতিষ্ঠিত নর্তক গোপালের স্থানে আসিলেন। কিন্তু অদ্বৈতমার্গী সন্ন্যাসী মনে করিয়া গোপালেব সেবকগণ প্রভুকে কোনরূপ সম্ভাষণই করিলেন না, কিন্তু পরে প্রভুব অলৌকিক প্রেম দর্শনে তাঁহারা মুগ্ধ হইলেন। মধ্বাচার্যের শিষ্যগণ তত্ত্ববাদী, দ্বৈতবাদী, কিন্তু সারূপ্য, সালোক্য, সাযুজ্যাদি পঞ্চবিধ মুক্তিকেই সাধনশ্রেষ্ঠ এবং কর্মকেই সাধনা বলিয়া তাঁহারা জানেন; তত্ত্ববাদী আচার্যের কাছে সাধ্যসাধনতত্ত্ব জানিতে চাহিয়া প্রভু তাঁহাদের এই মতই শুনিলেন।

'কিন্তু, শ্রীপাদ!' বিনয়নম্রসুরে প্রভু বলিলেন, 'ভাগবত বলিয়াছেন—

শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্। ভাঃ ৭।৫।২৩,২৪

শ্রবণ, কীর্তন প্রভৃতি নববিধা ভক্তিই সাধন, কর্ম নয় এবং এই সাধন দ্বারা লভ্য শ্রীকৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তিই সাধ্য, মুক্তি নয়! তবে, মায়াবাদী সন্ন্যাসী দেখিয়া আপনি আমাকে বুঝি বঞ্চনা করিতেছেন? নতুবা আপনি ভক্ত হইয়া কি জানেন না যে, মুক্তি ভক্তের কাছে নরকযন্ত্রণা-তুল্য এবং কৃষ্ণসেবা ছাড়া ভক্তের কাম্য কিছুই নাই? ভগবান নিজে দিতে চাহিলেও ভক্ত যে তাহা গ্রহণ কবে না তাহা কি আপনি জানেন না? তথাহি—

সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ। ভাঃ ৩।২৯।১৩

প্রভুর বাক্যে আচার্য লজ্জিত হইয়া বলিলেন, 'প্রভু! তুমি যাহা কহিতেছ তাহা সত্যই কিন্তু সম্প্রদায়-অনুরোধেই আমাদের পূর্বসিদ্ধান্ত মানিতে হয়।' অবশেষে প্রভু বলিলেন, 'যাহাই হোক মায়াবাদী সন্ন্যাসীগণের মতো শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহকে মায়িক বলিয়া উপেক্ষা না করিয়া যে আপনারা চিন্ময়রূপে সেবা করেন ইহাই পরম শুভ, পরম মঙ্গলের চিহ্ন।'

সেস্থান হইতে ক্ষীরভগবতী, গোকর্ণাশিব প্রভৃতি দর্শনান্তে প্রভু বিট্ঠলদেব দর্শনে আসিলেন। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরী সেস্থানে আছেন জানিয়া দ্রুত অধীর চরণে প্রভু পুরীজির চরণপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া দণ্ডপ্রণাম করিলেন। গুরু-সম্বন্ধ স্মরণ মাত্রই প্রভুর শ্রীঅঙ্গ পুলকিত হইয়া উঠিল, নয়নে আসিল প্রেমাশ্রু। এই প্রেমদর্শনে পুরীজি বিস্মিত হইলেন, প্রভুকে উঠাইয়া বলিলেন, 'তুমি কে? নিশ্চয়ই তুমি আমার পরম প্রেমময় গুরুর সম্বন্ধে কেহ, নতুবা এই অলৌকিক প্রেম তুমি কোথা হইতে লাভ করিলে? মাধবেন্দ্রজী ছাড়া পৃথিবীতে অপর কাহারও তো এইরূপ প্রেম নাই।'

প্রভুর পরিচয় পাইয়া আনন্দে পুরীর হৃদয় ফুল্লকমলের মতো বিকশিত হইয়া উঠিল, নিবিড় আলিঙ্গনে প্রভুকে বক্ষে বদ্ধ করিলেন পুরী। কৃষ্ণ-প্রেমানন্দে ভাসিতে ভাসিতে কয়েকদিন কাটিয়া গেল। কৌতুকে একদিন পুরী প্রভুর পূর্বাশ্রম কোথায় জানিতে চাহিলে প্রভু যখন নবদ্বীপের নাম করিলেন, তখন বহুকালবিলুপ্ত একটি চিত্র ভাসিয়া উঠিল পুরীর মনের গহনে।—'একবার গুরুর সঙ্গে তিনি নবদ্বীপে গিয়া ভিক্ষা করিয়াছিলেন এক ভক্ত ব্রাহ্মণের গৃহে; জগন্নাথ মিশ্র তাঁহার নাম, আর পরম ভক্তিমতী, কল্যাণী তাঁহার পত্নী শচীদেবী, সর্বোত্তম পরমসুন্দর তাঁহাদের এক পুত্র, নাম বিশ্বরূপ। সেই শচীদেবীর হাতের রন্ধনই বা কি অপূর্ব! তাঁহার হাতের মোচার ঘণ্টের স্বাদ আজও যেন পুরী ভুলিতে পারেন নাই!

আর সেই যে তাঁহাদের সুন্দর কিশোর পুত্র বিশ্বরূপ তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন এবং এই তীর্থেই দেহত্যাগ করেন। তাঁহার সন্ন্যাসের নাম ছিল শ্রীশঙ্করারণ্য।'

যেই উদ্দেশ্যে প্রভু দক্ষিণদেশ ভ্রমণে বাহির হইবেন বলিয়াছিলেন যেন আজ তাহা সিদ্ধ হইল—প্রভু অগ্রজের সঠিক সংবাদ জানিলেন এবং পুরীজির কাছে নিজ পরিচয়ও জানাইলেন। পুরীজির আনন্দ দ্বিগুণিত হইল।

পুরীজির আজ্ঞা লইয়া প্রভু কৃষ্ণবেণ্বাতীরে উপস্থিত হইলেন, সেখানে পাঠ হইতেছিল 'কৃষ্ণকর্ণামৃত'। ভক্তগণের শ্রবণমঙ্গল এই গ্রন্থ, লীলাশুক-রচিত শ্রীকৃষ্ণলীলাকাহিনী। মাধুর্যের সার এই গ্রন্থখানি পাইয়া প্রভু আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন এবং ইহাও লেখাইয়া সঙ্গে লইলেন ভক্তগণকে দিবেন বলিয়া।

তারপর ঋষ্যমূকপর্বত, দণ্ডকারণ্য প্রভৃতি তীর্থ ভ্রমণ, সপ্ততাল বিমোচন করিয়া ক্রমে নাসিক, ত্র্যম্বক পঞ্চবটী পরিক্রমা করিয়া পুনরায় আসিলেন গোদাবরীতীরে, রায় রামানন্দের কাছে—বিরহক্লিষ্টতনুখানি শীতল করিবার আশায়। আপন অন্তরতমকে পাইয়া রায়ের অন্তরও পূর্ণ হইল সুধারসে! স্থির হইয়া প্রভু নিজের সংগৃহীত গ্রন্থ-দুইখানি রায়ের হস্তে দিয়া বলিলেন, 'রায়, কৃষ্ণমাধুর্যের যে বর্ণনা, রাধাকৃষ্ণের পরমগুহ্য তত্ত্বের যে ইঙ্গিত দিয়া তুমি আমাকে অমৃতরসে সিক্ত করিয়াছিলে, সেই সমস্ত রস, সমস্ত সিদ্ধান্তই এই দুই গ্রন্থে আছে।' রায় সাগ্রহে গ্রন্থ-দুইখানি মাথায় তুলিয়া লইলেন। ক্রমে নীলাচলে, গৌড়ে, সমগ্র ভক্ত সমাজে এই দুই গ্রন্থের বিস্তার হইতে লাগিল।

রায়ের সঙ্গ ত্যাগ করিতে প্রভুর মন চাহে না, কিন্তু গৌড় ও নীলাচলের ভক্তগণের বিচ্ছেদ-তাপ অন্তরে উপলব্ধি করিয়া প্রভু যাত্রা করিলেন নীলাচলের পথে, রায়কে শীঘ্র আসিবার অনুরোধ করিয়া।

দীর্ঘ দুই বৎসর পদযাত্রার পরে প্রভু ফিরিয়া আসিলেন আলালনাথে এবং কৃষ্ণদাসকে পাঠাইলেন শ্রীনিত্যানন্দাদি ভক্তের কাছে। মুহূর্তে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিল প্রাণ, সর্বত্র বহিতে লাগিল পুণ্য মধুগন্ধবহ বায়ু, বায়ুর অগ্রে প্রভুর বার্তা। গভীর অন্ধকারাবৃত রুদ্ধ গৃহকোণ হইতে সহসা যেন ভক্তগণ নবারুণ রাগলেখার অভ্যুদয় দেখিলেন আকাশে! দ্রুত অধীর চরণে ছুটিয়া চলিলেন আলালনাথে প্রভুদর্শনের আশায়।

পথেই মিলন হইল—সিন্ধুতে আসিয়া মিলিল স্রোতোধারা; কাহারও যেন পৃথক অস্তিত্ব রহিল না।

ধীরে সকলকে লইয়া প্রভু আসিলেন প্রাণনাথ জগন্নাথের দ্বারে। দুই তৃষিত নয়নে চাহিয়া আছেন প্রভু প্রিয়তমের দিকে—ভক্তগণ চাহিয়া আছেন তাঁহাদের প্রিয়তম প্রভুর দিকে—

বহুদিন পরে বঁধুয়া এলে,
দেখা না হইত পরাণ গেলে।

সাধ্য-সাধনতত্ত্ব

[রায় রামানন্দ-মহাপ্রভু-সংবাদ]

দক্ষিণভারত তীর্থ-পরিক্রমার পথে বিদ্যানগরে গোদাবরী নদীর তীরে এক তরুণ গৌরকান্তি অপরূপ সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইলেন, হাতে জপমালা, কমলনয়ন-দুইটি যেন কাহার প্রতীক্ষায় ইতস্ততঃ ধাবিত।

সেদিন বিদ্যানগরে আপন ইষ্ট-মন্দিরে বসিয়া ধ্যানস্থ রায় রামানন্দ, উড়িষ্যা-রাজের অধীন এ-প্রদেশের শাসনকর্তা। পরমভক্ত রসিকশ্রেষ্ঠ রায় রামানন্দ; কিন্তু আজ মন রাধাকৃষ্ণধ্যানে কিছুতেই সমাহিত হইতে চাহিতেছে না, হৃদয়ে বারে বারেই চপলা-চমকের মতো এক গৌর সন্ন্যাসীর অপরূপ লাবণ্যঘন অঙ্গকান্তি যেন ঝলসিত হইয়া উঠিতেছে। কে এই সন্ন্যাসী, দীনকরুণ-নয়নে চাহিয়া? কি চাহেন তিনি রায় রামানন্দের কাছে?

পূজা-ধ্যান সমাপন করিয়া একটু বা বিক্ষিপ্ত চিত্তে রায় উঠিলেন। মধ্যাহ্ন-স্নানের আয়োজন প্রস্তুত; অগ্রে পশ্চাতে বাদ্য, ভাট পুরোহিত লইয়া দোলায় আরোহণ করিয়া রায় গোদাবরী-তীরে উপনীত হইলেন।

সন্ন্যাসীর ব্যাকুল দৃষ্টি রায়ের প্রতি ধাবিত হইল, রায়ের চিত্তও চমকিত, আলোড়িত হইয়া উঠিল। এ কি, এই তো সেই ধ্যানে দেখা সন্ন্যাসী? কে ইনি? দোলা হইতে নামিয়া দ্রুত অধীর চরণে রায় সন্ন্যাসীর পদপ্রান্তে আসিয়া প্রণত হইলেন। সন্ন্যাসী ব্যাকুল বাহু বাড়াইয়া রায়কে হাত ধরিয়া উঠাইলেন, বলিলেন, 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলো, তুমি কি রায় রামানন্দ?' রামানন্দ কহিলেন, 'হাঁ, আমিই সেই অধম দাস।'

শুভলগ্নটি যেন এতক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়াছিল; এইবার সময় হইল, রায় রামানন্দ ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু পরস্পর প্রগাঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ হইলেন। ভক্ত ও ভগবানের সত্তা হৃদয়ে-হৃদয়ে মিশিয়া গেল। অসহ্য আনন্দের আবেশে, অশ্রু-স্তম্ভ-পুলকের আবেগে দুইজনে দীর্ঘকাল বিবশ হইয়া রহিলেন। সঙ্গের লোকজন বিস্মিত হইলেন—'এ কি, এই পরমসুন্দর সন্ন্যাসী কেন শূদ্রকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন? আর এই পরম মান্য, পরম ধীর আমাদের রাজাই বা কেন এই সন্ন্যাসীর স্পর্শে অধীর হইয়া ক্রন্দন করিতেছেন?'

মহাপ্রভুর স্থৈর্য ফিরিয়া আসিল। চারিদিকে যাহারা, তাহারা বহিরঙ্গ; প্রভু

তাই ধীরে ধীরে নিজেকে আলিঙ্গনমুক্ত করিয়া বলিলেন, 'রায়, নীলাচলে বাসুদেব সার্বভৌম তোমার অপূর্ব কৃষ্ণপ্রেমের কথা আমাকে বলিয়াছেন, তিনিই তোমাকে দর্শনের জন্য আমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন। আজ এত সহজে তোমার দর্শন পাইয়া আমি কৃতার্থ হইলাম।'

রায় বলিলেন, 'সার্বভৌম আমাকে ভৃত্যজ্ঞান করেন, তাই আমার চিত্ত শোধনের জন্য কৃপাময় আপনাকে এই অধমের কাছে পাঠাইয়াছেন। তাঁহার অনুগ্রহে আপনার রাতুল চরণ দর্শন করিলাম। আজ আমার সমস্ত দুর্দিনের অবসান হইল, আমার জন্ম সফল হইল। নিশ্চয়ই আপনি সাক্ষাৎ নারায়ণ। আপনার আকৃতিতে, প্রকৃতিতেও পূর্ণ অবতার-লক্ষণ দেখিতেছি। আমি বিষয়ী শূদ্র, আপনার অস্পৃশ্য, তথাপি স্পর্শ করিয়া আপনি আমাকে ধন্য করিলেন। শুধুমাত্র আপনার উপস্থিতি দ্বারা আপনি সমবেত এই সমস্ত লোকের চিত্ত দ্রবীভূত করিয়া কৃষ্ণনাম স্ফূরণ করাইতেছেন।'

প্রভু স্বভাবসিদ্ধ নম্র বচনে বলিলেন, 'না রায়, আমি সন্ন্যাসী, আমার চিত্ত নীরস কঠিন, তাই তাহা কৃষ্ণপ্রেমামৃতে স্নিগ্ধ দ্রবীভূত করিবার জন্যই সার্বভৌম আমাকে তোমার কাছে পাঠাইয়াছেন।'

মধ্যাহ্ন অতিক্রান্তপ্রায়, এক বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ আসিয়া প্রভুকে ভিক্ষার নিমন্ত্রণ করিলেন। অত্যন্ত অনিচ্ছায় চিত্তের প্রবল উৎকণ্ঠাকে দমিত করিয়া প্রভু উঠিলেন, রায়ও গৃহে ফিরিলেন।

কোনরূপে দিবস অতিক্রান্ত হইল, সন্ধ্যা আসিল। বন্দনাদি সমাপ্ত করিয়া প্রভু প্রতীক্ষমাণ, একজন মাত্র ভৃত্য সঙ্গে করিয়া রায় আসিয়া প্রভুর সঙ্গে মিলিত হইলেন।

এক নিভৃত নির্জন স্থানে বসিলেন দুইজনে—একজনে পিপাসার্ত, আর একজন তৃষ্ণাহর, দুইজনেই কৃষ্ণ-রসে রসিক।

সাধ্য-সাধনতত্ত্বের বহিঃসীমানায় প্রথম পদক্ষেপ হইল, অভ্রভেদী হর্ম্যের নিভৃত মণিময় প্রকোষ্ঠে রত্নবেদীর উপরে প্রতিষ্ঠিত এক অপূর্ব মনোহর মূর্তির পদতলে রায় ধীরে ধীরে প্রভুকে লইয়া যাইবেন। আরম্ভ হইল প্রথম পরিক্রমা।

প্রভু বলিলেন, ' "রায়, পড় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়।' 'রায় কহে, স্বধর্মাচরণে বিষ্ণুভক্তি হয়।" '

প্রভু রায়ের কাছে শাস্ত্রীয় প্রমাণ-সহ সাধ্য-সাধনতত্ত্ব জানিতে চাহিলেন। রায় তাঁহার উক্তির সমর্থনে বিষ্ণুপুরাণ হইতে বলিলেন—

বর্ণাশ্রমাচারবতা পুরুষেণ পরঃ পুমান্।
বিষ্ণুরারাধ্যতে পন্থা নান্যত্তোষকারণম্॥ —বিষ্ণুপুরাণ ৩।৮।৯

—'পরমপুরুষ বিষ্ণু বর্ণাশ্রমাচার-সম্পন্ন পুরুষ কর্তৃক আরাধিত হইয়া থাকেন, বস্তুতঃ বর্ণাশ্রমাচার ভিন্ন বিষ্ণুপ্রীতি-সাধনের অন্য উপায় নাই।'

"প্রভু কহে, এহো বাহ্য আগে কহ আর।"

প্রভু যাহা জানিবার জন্য এতদূরে আসিয়াছেন, রসিকশ্রেষ্ঠ রায় রামানন্দ ছাড়া যে-তত্ত্বের আর দ্বিতীয় বক্তা নাই, তাহা এত স্থূল, এত বাহিরের নয়; তাহা অকৈতব শুদ্ধ প্রেম, ঐশ্বর্যের নামগন্ধ তাহাতে নাই।

অল্প-অধিকারীর জন্যই কেবল বর্ণাশ্রমধর্ম আচরণের ব্যবস্থা। বিষ্ণু ষড়ৈশ্বর্যময় ভগবান, বিশ্বধাতা; তিনি ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ দান করিতে সক্ষম, কিন্তু কৃষ্ণ-প্রেম দেওয়া তাঁহার কাজ নয়। কাজেই প্রভু বলিলেন, 'রায়, এত বাহিরের কথা শুনাইও না—অগ্রসর হইয়া চলো।'

রায় বলিলেন, "কৃষ্ণে কর্মার্পণ সর্বসাধ্যসার।" নিজের মতের সমর্থনের জন্য তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতে বলিলেন—

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্। —গীতা ৯।২৭

—'হে কৌন্তেয়, যাহা কিছু কর্ম কর, যাহা কিছু ভোজন কর, হোম-দান-তপস্যাদি যাহা যাহা কর, তৎ সমস্তই আমাতে অর্পণ কর।'

প্রভু বলিলেন, 'না রায়, এও বাহিরেব কথা, তুমি আরও অগ্রসর হও।'

স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে যে কর্ম ও কর্মফল ত্যাগের উপদেশ দিলেন, প্রভু তাহাকে 'বাহ্য' বলিলেন কেন?

অর্জুন ক্ষত্রিয়; যুদ্ধ আসন্ন, ধর্মযুদ্ধ। আকস্মিক বৈরাগ্যের উদয়ে অর্জুন আজ যে যুদ্ধে নিরুদ্যম ও নিরাসক্তি দেখাইতেছেন, তাহা তাঁহার স্বভাবধর্ম নয়। জ্ঞানমিশ্রা কর্মেই তাঁহার অধিকার, শুদ্ধ প্রেমে ব্রজে প্রবেশের কোন অভিরুচি বা অধিকার তাঁহার নাই, কাজেই তাঁহার জন্য কর্ম তথা কর্মফলত্যাগের ব্যবস্থা।

যাঁহারা সংসারী—যাঁহারা বৈধী ধর্মের আচরণকারী, তাঁহাদের জন্যও এই ব্যবস্থা। কিন্তু যাঁহারা শুদ্ধা অনন্যা ভক্তির অধিকারী, তাঁহাদের স্বকীয় কোন কর্মই নাই, তাঁহাদের দেহ-ইন্দ্রিয়-মন-প্রাণ দ্বারা অনুষ্ঠিত যত কর্ম সকলই কৃষ্ণময়। কেবল কৃষ্ণ-প্রীত্যর্থেই তাহা অনুষ্ঠিত, কাজেই কৃষ্ণময় কর্ম আর কৃষ্ণে অর্পণ করিবার কোন প্রয়োজন তাঁহাদের হয় না।

প্রভু সন্তোষ লাভ করিলেন না। রায় এইবার বলিলেন, "স্বধর্ম-ত্যাগ ভক্তি সাধ্যসার"। প্রমাণ-স্বরূপে তিনি ভাগবত হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিলেন—

আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্বান্ মাং ভজেৎ স তু সত্তমঃ॥ —ভাঃ ১১।১১।৩২

—'শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিলেন, 'হে উদ্ধব, ধর্মশাস্ত্র আমাকর্তৃক আদিষ্ট হইয়াছে. তথাপি তাহার দোষগুণ জানিয়া স্বীয় বর্ণাশ্রম-ধর্ম অতিক্রমপূর্বক যে ব্যক্তি আমাব ভজন করে, সেই ব্যক্তিই সাধুত্তম।'

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শবণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ —গীতা ১৮।৬৬

—'হে অর্জুন, সকল ধর্ম পবিত্যাগ করিয়া তুমি একমাত্র আমাব শবণ লও আমি তোমাকে সমস্ত পাপ হইতে উদ্ধাব কবিব।

প্রভু বলিলেন, 'এহো বাহ্য।'

কর্ম, যোগ, জ্ঞান—সমস্ত সাধনাব কথা বর্ণনা কবিয়া, সমগ্র গীতার শেষে শ্রীকৃষ্ণ সারাৎসার সর্বগুহ্যতম কথাটি যেন পবমপ্রিয় অন্তরঙ্গ অর্জুনের কানে কানে বলিলেন, 'অর্জুন! এতক্ষণ এত পথ, এত সাধনাব কথা বলিয়াছি, কিন্তু এইবার তোমাকে, শুধু তোমাকেই বলি, আমাকে পাওয়াব উপায়টিব কথা; সব ধর্মাধর্ম, সবকিছু ত্যাগ করিয়া তুমি আমার শবণ লও, একবাব শুধু বলো, "হে কৃষ্ণ, আমি তোমার।" তাহা হইলে সব মলিনতা, সব ধুলা ঝাড়িয়া আমি তোমাকে বক্ষে তুলিয়া লইব।'

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের সখা—শ্রীকৃষ্ণেরই অংশ, পার্থ আর পার্থসাবথি। তাই শ্রীকৃষ্ণ ইঙ্গিতে যে দূরস্থিত দেউলের স্বর্ণচূড়াগ্রেব দীপ্তির আভাসমাত্র তাঁহাকে দেখাইলেন, সে দেউল মথুরা, দ্বারকা, ইন্দ্রপ্রস্থে নয়, দেউল বৃন্দাবনে।

কি করিয়া সর্বধর্ম, কুল-শীল-মান, আর্যধর্ম, বেদধর্ম, লোক-লজ্জা, দেহ-মন-প্রাণ নিজ সুখবাঞ্ছা, এমন কি মুক্তিবাঞ্ছা পর্যন্ত অবহেলায় বিসর্জন দিয়া একমাত্র তাঁহারই শরণ লইতে হয়, তাহা দেখাইয়াছেন ব্রজগোপীগণ, আর কেহ নয়।

অর্জুন সখা, গোপীভাব তাঁহার নয়। তাঁহাব সর্বধর্ম-ত্যাগজনিত আশঙ্কার (!) পশ্চাতে আছে কৃষ্ণেব আশ্বাস-বাক্য, "অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।"

অর্জুনের আশ্বাসের প্রয়োজন আছে, কিন্তু গোপীব তাহা নাই; তাই গোপী সকল কলঙ্ককে অঙ্গের ভূষণ কবিতে পাবেন।

প্রভুর কর্ণ তৃষিত হইয়া আছে সেই সব দেওয়া প্রেমের সুধা পান করিবার আশায়, তাই বলিলেন, 'রায়, এ-ও বাহিরের, আরও ভিতরে চলো।'

রায় বলিলেন, 'জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সাধ্যসার।'—সমর্থক শ্লোক

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্॥ —গীতা ১।৮।৫৪

—'ব্রহ্মস্বরূপ-প্রাপ্ত প্রসন্নাত্মা ব্যক্তি নষ্ট বস্তুর জন্য শোক করেন না, অপ্রাপ্ত বস্তুর জন্য আকাঙ্ক্ষা করেন না, সর্বভূতে সমদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া তিনি আমাতে পরা-ভক্তি লাভ করেন।'

প্রভু বলিলেন, 'ইহাও বাহিরের কথা।'

মুণ্ডক উপনিষদ্ ১।১।১৫ শ্লোকে বলা হইয়াছে, "পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে", পরাবিদ্যা দ্বারাই অক্ষর ব্রহ্মকে জানা যায়। শ্রুতি-মতে বিদ্যা দুইটি, অপরা ও পরা। অপরা, মায়াশক্তির বৃত্তি এবং পরাবিদ্যা ব্রহ্মের স্বরূপশক্তির বৃত্তি। পরাবিদ্যা শুদ্ধসত্ত্বস্বভাবা, যাহা হৃদয় হইতে অবিদ্যার আবরণ দূর করিয়া ব্রহ্মকে প্রকাশ করে।

পরাবিদ্যা ও পরাভক্তি একই বস্তু। মূলতঃ দুইটি অভিন্ন, প্রভেদ কেবল আস্বাদন-বৈচিত্র্যে। যিনি ব্রহ্মভূত, তিনি সর্বত্র সমদর্শী, তিনি ব্রহ্মনির্বাণ তথা ব্রহ্মবিহার-জনিত এক সমাধিরসে মগ্ন থাকেন। ভক্তির সাহচর্য ব্যতীত পরাবিদ্যা লাভ করা দুষ্কর। পরাবিদ্যায় সংবিদ্ তথা শুদ্ধজ্ঞানেরই প্রাধান্য, কিন্তু হ্লাদিনী তথা ভক্তির আনন্দদায়িনী শক্তিরও যথেষ্ট বিকাশ থাকে, নতুবা ব্রহ্মানন্দের অনুভূতিই অসম্ভব হইত।

আর পরাভক্তির যে পরিণতি কৃষ্ণবিহার, তাহাতে হ্লাদিনীর প্রাধান্য, কিন্তু সংবিদ্ তথা জ্ঞানের সাহচর্যেরও যথেষ্ট প্রয়োজন, নতুবা অদ্বয় জ্ঞানতত্ত্ব কৃষ্ণ-স্বরূপের জ্ঞান লাভ করাও অসম্ভব।

প্রভু এই পরাবিদ্যা তথা পরাভক্তিকে 'বাহ্য' বলেন নাই, বলিয়াছেন, ঐশ্বর্য-জ্ঞানমিশ্রা, মমত্ব-বুদ্ধিহীন, সঙ্কুচিত যে কৃষ্ণভক্তি, তাহাই বাহ্য।

ভাদ্র মাস; কৃষ্ণা অষ্টমীর গভীর মেঘাচ্ছন্ন আকাশতলে, মধ্য-নিশীথের নীরব কারাগৃহে, কঠিন লৌহশৃঙ্খলের ব্যথার মধ্যে যখন সর্বদুঃখহর শ্রীকৃষ্ণ দেবকীর ক্রোড়ে আবির্ভূত হইলেন, তখন পুত্র জানিয়াও বাসুদেব ও দেবকী নবজাত শিশুকে বিষ্ণু-জ্ঞানে স্তুতি করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভুজ সম্বরণ করিয়া দ্বিভুজ হইলেন, তথাপি যেন দেবকীর সশঙ্ক হৃদয় ব্যগ্র ব্যাকুল দুই বাহু বাড়াইয়া পুত্রকে বক্ষোলগ্ন

করিতে দ্বিধা করিতেছিল। দেবকী জানেন, তাঁহার পুত্র বিশ্বের অধীশ্বর; কাজেই তাঁহার মমত্ব-জ্ঞান দ্বিধাগ্রস্ত, সঙ্কুচিত।

শুধু মথুরায় নয়, দ্বারকায়ও দেখিতে পাই এই ঐশ্বর্যজ্ঞান-মিশ্রা ভক্তির প্রকাশ।

একদিন শ্রীকৃষ্ণ প্রধানামহিষী স্বয়ং লক্ষ্মীরূপা রুক্মিণীকে পরিহাস করিয়া বলিয়াছিলেন, 'দুষ্ট শিশুপালের হাত হইতে রুক্মিণীর অনুরোধে তিনি তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছেন সত্য, কিন্তু রুক্মিণীতে তাঁহার কোন স্পৃহা নাই; তিনি অকিঞ্চন, নিরাসক্ত, অসংসারী। কাজেই তিনি রুক্মিণীর পতি হওয়ার অযোগ্য। তিনি রুক্মিণীকে মুক্তিদান করিতেছেন, রুক্মিণী যাঁহাকে ইচ্ছা পতিত্বে বরণ করুন।'

পতির পরিহাস শুনিবামাত্র রুক্মিণীর মন ভয়ে ও আশঙ্কায় কাঁপিয়া উঠিল, সত্যিই তো তিনি কেবল আমার পতি নহেন, তিনি যে জগৎ-পতি। মায়ার সংসার কি ইহাকে বাঁধিতে পারে কোন দিন? তবে কি তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিলেন?' ভয়াতুরা কপোতী মূর্ছিতা হইয়া ধূলিতে লুণ্ঠিতা হইলেন।

মহাপ্রভু এই ঐশ্বর্য-জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিকেই বলিলেন, 'এহো বাহ্য'।

রায় এবার বলিলেন, 'জ্ঞানশূন্যা ভক্তি সাধ্যসার'। প্রমাণ-শ্লোক—

জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্ মনোভির্যে
প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্। —ভাঃ ১০।১৪।৩

ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, 'হে অজিত, তোমার স্বরূপের বা ঐশ্বর্যাদি মহিমার বিচারের কিঞ্চিন্মাত্র চেষ্টা না করিয়াও যাঁহারা কেবলমাত্র সাধুগণের আবাসস্থানে অবস্থানপূর্বক সাধুগণের মুখোচ্চারিত এবং আপনা হইতেই শ্রুতিপথে প্রবিষ্ট তোমার রূপগুণ-লীলাদির কথা, তোমার চরিতকথা বা তোমার ভক্তদের কথায় কায়মনোবাক্যে সৎকারপূর্বক জীবন ধারণ করেন, ত্রিলোকের মধ্যে তাঁহাদের দ্বারাই প্রায়শঃ তুমি বশীভূত হও।'

প্রভু বলিলেন, 'এহো হয়।'

সুনিপুণ সুদক্ষ পথিকৃৎ রায় রামানন্দ এতক্ষণ যেন পাষাণময় নানা রুক্ষপথের মধ্য দিয়া প্রভুকে লইয়া আসিয়াছিলেন, এবারে ছায়াঘন কুসুমাস্তীর্ণ পথে প্রভুসহ আসিয়া পৌঁছাইলেন—অদূরে প্রেম-দেউলের চূড়া দৃষ্ট হইতে লাগিল, আর বেশী দূর নয়। এই জ্ঞানশূন্যা ভক্তিই প্রেমে রূপান্তরিত হইয়া অচিরেই পৌঁছাইয়া দিবে সেইখানে, যেখানে বালগোপাল যশোদার স্নেহবন্ধনে ধরা পড়িয়াছেন।

কচি মুখখানি ভরিয়া মাটির দাগ ; সখা, ভ্রাতা, সব সাক্ষী উপস্থিত, তবুও দুষ্ট, ভীত বালক বলিতেছে, 'আমি মাটি খাই নাই, মাগো, এরা মিথ্যা কথা বলিতেছে, এই দেখ না আমার মুখ ?'

গোপাল হাঁ করিলেন, যশোদা দেখিলেন তাঁহার গোপালের মুখবিবরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ; মুহূর্তের জন্য পুত্রজ্ঞান তিরোহিত হইল, নারায়ণ-জ্ঞানে স্তুতি করিলেন ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরকে। কিন্তু পরমুহূর্তেই চমকিত হইয়া উঠিলেন! কি সর্বনাশ! কোন যক্ষ, রক্ষ না প্রেতাশ্রিত হইল আমার গোপাল ? রক্ষাকবচ বাঁধিয়া দিলেন পুত্রের কণ্ঠে, পুত্রের মঙ্গলকামনায় বারে বারে প্রার্থনা জানাইলেন নারায়ণের পায়।

ঘরে ঘরে ননী-চুরি! রোজ অভিযোগ কানে আসে। আজ চোর ধরা পড়িয়াছে। আর নয়, আর প্রশ্রয় দেওয়া চলে না গোপালকে ; তাহাকে শাসন করিতে হইবে, কিন্তু তাহাও তো প্রাণ চায় না!

কিন্তু একদিন মাতাও আর সহ্য করিতে পারিলেন না ; গোপালকে বন্ধন করিতে হইবে, মাতা রজ্জু লইলেন।

ঐটুকু তো কোমল অঙ্গ, বেষ্টন করিতে কতটুকুই বা রজ্জুর প্রয়োজন ? কিন্তু কি আশ্চর্য! রজ্জুর পর রজ্জু সংগৃহীত হইতে লাগিল, তবু ঐ পরিমিত শিশু-তনুখানি বেষ্টিত হইল না। যাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই, ভিতর নাই, বাহির নাই, তাঁহাকে বন্ধন করিবে কে, কিসের দ্বারা ? শ্রান্ত ক্লান্ত, ঈষৎ বা ক্রুদ্ধ যশোদার বদন হইতে স্বেদধারা নির্গত হইতে লাগিল, তথাপি চলিল বন্ধনের চেষ্টা। একবার মনে হইল না, এ তো গোপাল নয়, এ যে বিশ্বপালক বিশ্বধাতা!

মায়ের ক্লান্তির বেদনার ছোঁয়া বুঝি স্পর্শ করিল ঈশ্বরকে, তাই ক্রন্দনরত ভীত-চোখেমুখে অপরূপ মায়ার কাজল মাখিয়া বন্ধনে ধরা দিলেন গোপাল।

অঘাসুর, বকাসুর, পুতনাবধ, কালীয়দমন, ঐশ্বর্যের কত লীলাই তো ঘটিল বৃন্দাবনে, কিন্তু নন্দ-যশোদা, গোপ-গোপী তাঁহাদের কানাই-এর উপরে নারায়ণের কৃপার প্রকাশই প্রত্যক্ষ করিলেন মাত্র ?—'গোপাল তো সাধারণ বালক, তাহার আবার কোথা হইতে আসিবে এই অলৌকিক ক্ষমতা ? তাহাকে রক্ষা করিতেছেন নারায়ণ।'

শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া গেলে সমস্ত ব্রজধাম যখন শোকসাগরে মগ্ন, তখন শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার পরমপ্রিয় উদ্ধবকে একবার ব্রজে পাঠাইলেন, সখা-সখী, গোপ-গোপী ও মাতা-পিতাকে সান্ত্বনা দিতে।

রাজরথে আরোহণ করিয়া রাজপ্রতিনিধি কৃষ্ণের সংবাদ লইয়া ব্রজে প্রবেশ করিলেন ; মনে আছে গুরুদায়িত্বের গৌরব। জ্ঞানী-ভক্ত উদ্ধব, সর্বত্র তাঁহার ব্রহ্মদৃষ্টি, জানেন না কৃষ্ণবিরহের তীব্রতা কত দূর। শোকাচ্ছন্ন ব্রজে প্রবেশ করিয়া মন বিচলিত হইয়া উঠিল, কিন্তু নন্দগৃহে প্রবেশ করিয়া বিরহের যে তীব্র রূপ দেখিলেন, তাহাতে তিনি স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। কথা কহিবার সাহস হইল না। দীর্ঘকাল সেই সীমাহীন শোকের সম্মুখে নীরব থাকিয়া শেষে ধীরে ধীরে বলিলেন, 'নন্দ-মহারাজ ! ধন্য আপনার ভাগ্য, ধন্য আপনার কৃষ্ণপ্রেম ! কত জন্ম-জন্মান্তরের পুণ্যফলে আপনি কৃষ্ণকে পুত্ররূপে লাভ করিয়াছেন, যিনি স্বয়ং ভগবান, এ নিখিল বিশ্ব যাঁহার সৃষ্টি !'

যে প্রবল মানসিক শক্তিতে নন্দ আপন উদ্বেলিত হৃদয়ের গভীর শোককে এতক্ষণ দমিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, উদ্ধবের কথা শুনিয়া অবধি তাহা আর বাধা মানিল না, প্রবলবেগে উৎসারিত হইয়া উঠিল। বলিলেন, 'উদ্ধব, জানিতাম, মহাজ্ঞানী মহাশাস্ত্রজ্ঞ আপনি, কিন্তু কি অজ্ঞের মত কথা বলিতেছেন আজ ? কে স্বয়ং ভগবান, আমার গোপাল ? উদ্ধব মহাশয় ! আপনি কি জানেন না, সে যে আমার কত অবোধ, কত বা তাহার শিশুসুলভ চঞ্চলতা ? সারাদিন ঘরে ঘরে ননী ক্ষীর চুরি করিয়া খায়, কতদিন তাহার মায়ের কাছেও তো ধরা পড়িয়াছে ? চুরি তো করেই, আবার ধরা পড়িয়া মিথ্যা কথাও বলে ; বলে, "আমি ননী খাই নাই।" বলুন তো মহাজ্ঞানী উদ্ধব ! ভগবান কি চুরি করেন, না মিথ্যা কথাও বলেন ?'

মহাজ্ঞানী উদ্ধব নীরব হইলেন। কি বলিবেন তিনি এই বাৎসল্যকাতর নন্দ-মহারাজকে ? এই প্রেমের রাজ্যের খবর তো তাঁহার জানা নাই !

আর এক ভক্ত দেবর্ষি নারদ, একদিন কৃষ্ণ-দর্শনের আকাঙ্ক্ষায় দ্বারকায় আসিয়াছেন ; দেখেন অপরিসীম শিরঃপীড়ায় শ্রীকৃষ্ণ কাতর। নারদ বিস্মিত হইলেন, তথাপি ব্যাকুলচিত্তে প্রতিকারের উপায় জানিতে চাহিলেন। শ্রীকৃষ্ণ ব্যগ্র বাহু বাড়াইয়া নারদের পদধূলি ভিক্ষা করিলেন, বলিলেন, 'শিরঃপীড়ার এই একমাত্র মহৌষধ, ভক্ত-পদধূলি মস্তকে ধারণ।'

শ্রীবিষ্ণু স্মরণ করিয়া, জিহ্বা দংশন করিয়া নারদ শতহস্ত দূরে সরিয়া গেলেন। দ্বারকার মহিষীবৃন্দ, উদ্ধবাদি ভক্তবৃন্দ, ত্রিভুবনের সমস্ত দেব, ঋষি সকলের কাছেই শ্রীকৃষ্ণ নারদকে পাঠাইলেন, ভক্ত-পদধূলির আশায়। শূন্যহস্তে বিষণ্ণচিত্তে নারদ ফিরিয়া আসিলেন, কে দিবেন ভগবানের মস্তকে পদধূলি, কাহার আছে সেই মহাপাপ হইতে পরিত্রাণ পাওয়ার পথ ?

পথে পড়িল বৃন্দাবন, গোপপল্লী। কি যে আকর্ষণ শ্রীকৃষ্ণের এই মূঢ় গ্রাম্য গোপ-গোপীর প্রতি, দেবর্ষি তাহা বুঝিতে পারেন না। তথাপি আজ হতাশার শেষ সীমায় আসিয়া ভাবিলেন, 'একবার দেখিয়াই যাই না?'

ব্রজধামে আসিয়া দাঁড়াইলেন দেবর্ষি, অমনি চতুর্দিক হইতে তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইলেন ব্রজগোপীগণ, তাঁহাদের কণ্ঠে ব্যাকুল প্রশ্ন : 'বলুন দেবর্ষি! শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া আসিয়াছেন কি? তাঁহার কুশল বলিয়া আমাদের উৎকণ্ঠা দূর করুন।'

নারদ শ্রীকৃষ্ণের পীড়া ও অদ্ভুত ঔষধের কথা বলিলেন ; এবং ত্রিভুবন ঘুরিয়াও যে তাহা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, তাহাও জানাইলেন। সঙ্গে সঙ্গে সুন্দর কিশলয়তুল্য শত শত চরণ মহাপূজ্য দেবর্ষির সম্মুখে প্রসারিত হইল, গোপীগণ কাতরকণ্ঠে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন—'নিন মহর্ষি, এই মুহূর্তে আমাদের পদধূলি নিয়া শীঘ্র কৃষ্ণকে আগে সুস্থ করিয়া তুলুন, আমাদের পাপের কথা পরে ভাবা যাইবে!'

ইহাই শুদ্ধ অকৈতব কৃষ্ণ-প্রেম, স্বার্থগন্ধহীন ভালবাসা। এই প্রেম যেন মধ্যাহ্ন-জ্ঞানসূর্যের প্রখরজ্বালার পর্যবসান গোধুলির স্নিগ্ধ প্রেমের আলোতে, যেন প্রজ্বলিত ধূপকাঠির শিখাটি স্তিমিত করার পরে স্নিগ্ধ সুগন্ধ-বিস্তার।

তাই একদিন ব্রজকান্তাদেব এই প্রেমেব পদমূলেই মহাজ্ঞানী উদ্ধব আপনাকে নতলুণ্ঠিত করিয়া বলিয়াছিলেন, 'আমি যেন বৃন্দাবনেব লতা, গুল্ম, তৃণ হইয়া জন্ম লাভ করি ; গোপীগণের চরণধুলায় সেদিন আমি যেন অভিষিক্ত হইতে পারি।'

প্রভু আনন্দেব সন্ধান পাইয়াছেন ; প্রসন্ন স্মিতহাস্যে বলিলেন, 'এহো হয়, আগে কহ আর,' 'রায় কহে প্রেমভক্তি সর্বসাধ্য-সাব।' প্রমাণ-স্বরূপ 'পদাবলী' হইতে তিনি দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করিলেন। দ্বিতীয় শ্লোকটি এই—

কৃষ্ণভক্তিরসভাবিতা মতিঃ
ক্রীয়তাং যদি কুতোঽপি লভ্যতে।
তত্র লৌল্যমপি মূল্যমেকলং
জন্মকোটিসুকৃতৈর্ন লভ্যতে। —পদ্যাবল্যাং ১৪

—'যদি কোনক্রমে (সৌভাগ্যাতিশায্যা) কোন কারণবশতঃ মিলিয়া যায়, তবে (যেমন করিয়াই হ'ক) কৃষ্ণভক্তিরসের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত (জারিত) মতি (বুদ্ধি) ক্রয় করিবে। কৃষ্ণে তাদাত্ম্য-বুদ্ধি ক্রয় করিতে গেলে লালসাই হইবে একমাত্র মূল্য। কিন্তু কোটি জন্মের সুকৃতির ফলেও সেই লালসা পাওয়া যায় না।'

প্রেমরাজ্যের সীমানায় আসা গেল; অদূরেই সেই প্রেম-দেউল। শ্রবণ, কীর্তন, সাধুসঙ্গ প্রভৃতির অনুষ্ঠান করিতে করিতে হৃদয় যখন শ্রদ্ধাভক্তি-লাভের যোগ্য হইবে, তখনই সাধক এই প্রেমভক্তি লাভ করিয়া ধন্য হইবেন; এবং তখনই সাধকের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধজ্ঞানের স্ফুরণ হইবে। তখন সাধক দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যাদি নিজ ভাবানুযায়ী ভজনের জন্য উন্মুখ হইয়া উঠিবেন এবং ব্রজে প্রবেশ করিয়া ব্রজ-পরিকরদের আনুগত্যে কৃষ্ণ-ভজন তথা কৃষ্ণ-সেবার অনুষ্ঠান আরম্ভ করিবেন।

প্রভু বলিলেন, 'এহো হয় আগে কহ আর',
রায় কহে, 'দাস্যপ্রেম সর্বসাধ্যসার ॥'

উক্তির সমর্থনে রায় যামুনমুনি-বিরচিত একটি শ্লোক ও ভাগবত হইতে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করিলেন—

যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্মলঃ।
তস্য তীর্থপদঃ কিং বা দাসানামবশিষ্যতে ॥ —ভাঃ ৯।৫।১৬

দুর্বাসা ঋষি অম্বরীষ মহারাজকে বলিয়াছিলেন, 'যাঁহার নাম শ্রবণমাত্র জীব সর্বোপাধিনির্মুক্ত হইয়া নির্মল হয়, সেই তীর্থপদ ভগবানের দাসদিগের পক্ষে কি প্রাপ্য বস্তুই বা অবশিষ্ট থাকে? বাস্তবিক জীবের পক্ষে দাস্যভক্তি হইতে অধিক সুখকর, অধিক আনন্দদায়ক বস্তু আর কি থাকিতে পারে?'

"জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য-দাস"। জীব এই দাসত্বের আনন্দ পায় না বলিয়াই বহির্মুখী হইয়া নানা দিকে আনন্দের সন্ধানে ধাবিত হয়। কাজেই দাস্যভক্তিই জীবের কাম্য।

প্রভু বলিলেন, "এহো হয় আগে কহ আর।"

প্রভু রায়কে আরও গভীরে যাওয়ার ইঙ্গিত দিলেন। দাস্যভাব জীবের স্বরূপগত ধর্ম হইলেও দাস্যেরও প্রকারভেদ আছে। দ্বারকা-মথুরা-বৈকুণ্ঠাদি ধামের যাঁহারা পরিকর, তাঁহাদের দাস্য ঐশ্বর্যজ্ঞানজনিত, সঙ্কোচ ও কিছুটা ভীতি-দ্বারা খণ্ডিত, নির্বাধ মমত্বময় দাস্য নয়। ব্রজের দাসত্বে ঐশ্বর্য জ্ঞান নাই, কিন্তু তাহাও গৌরব-বুদ্ধি ও প্রভু-ভৃত্য-সম্বন্ধজ্ঞানে খণ্ডিত। ভৃত্যের সাধ্য নাই যে, সে প্রভুর মুখে উচ্ছিষ্ট ফল তুলিয়া দিতে পারে—সখার মতো। তাই প্রভু আরও অগ্রসর হইতে চাহিলেন।

রায় বলিলেন, সখ্য-প্রেম সর্বসাধ্যসার।' সমর্থক শ্লোক—

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা
দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন

মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ
সার্ধং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ॥ —ভাঃ ১০।১২।১১

—জ্ঞানমার্গিগণ যাঁহার নির্বিশেষ সত্তামাত্র অনুভব করেন, লীলায় তাঁহারা প্রবেশ করিতে পারেন না, কর্মযোগীরাও যাঁহার আনন্দচঞ্চল লীলার কোন অনুভূতিই লাভ করিতে সক্ষম হন না, সেই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সহিত যাঁহারা তুল্যরূপে ক্রীড়া করেন, আহা! তাঁহাদের না জানি কতই পুণ্য!

রায় রামানন্দ ব্রজের শুদ্ধ সখ্যরসের কথা বলিলেন। ব্রজ-সখাগণের এতটুকু ঐশ্বর্যবুদ্ধি নাই, তাই নিঃসঙ্কোচে উচ্ছিষ্ট ফল তাঁহারা কৃষ্ণের মুখে তুলিয়া ধরেন, তাঁহাকে কাঁধে চড়ান, তাঁহার কাঁধে চড়েন। তাই এই সখাদের সঙ্গ কৃষ্ণের বড় মধুময় মনে হয়।—

আপনারে বড় বলে আমারে সম হীন,
সর্বভাবে হই আমি তাহার অধীন॥

প্রভু হর্ষোৎফুল্ল মুখে বলিয়া উঠিলেন, 'এহোত্তম, রায়,! এতক্ষণে তুমি আমার কাছে শুদ্ধ মাধুর্যের দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিলে। এখানে আসিয়া নীরব হইও না, আরও ভিতরে চলো।

রায় বলিলেন, 'বাৎসল্য-প্রেম সর্বসাধ্যসার।'—

নন্দঃ কিমকরোদ্ ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ম্।
যশোদা চ মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ॥ —ভাঃ ১০।৮।৪৬

—'নন্দ মহারাজ এমন কি মহাপুণ্যজনক মঙ্গলকার্য করিয়াছিলেন যে, শ্রীহরি (তাঁহাদের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া) যশোদার স্তনপান করিলেন?

নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া।
প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ॥ —ভাঃ ১০।৯।২০

মুক্তি-দাতা শ্রীকৃষ্ণ হইতে যে প্রসাদ গোপী যশোদা লাভ করিলেন, ব্রহ্মা, শিব এমন কি তঁাহার নিজের অঙ্গাশ্রিতা লক্ষ্মীও সেই প্রসাদ লাভ করেন নাই।'

কি সেই প্রসাদ—যাহার প্রভাবে সর্বকারণ বিভুতত্ত্বকে পর্যন্ত পালন, শাসন, তাড়ন করা যায়? পূর্ণতম শুদ্ধ বাৎসল্য-প্রেম, ইহাই সেই প্রসাদ, যাহা তাঁহার জন্মদাত্রী দেবকীও লাভ করেন নাই।

প্রভুর আনন্দ-বারিধি ক্রমেই উদ্বেলিত হইয়া উঠিতে লাগিল; বলিলেন, 'রায়, কর্ণতৃষ্ণা মিটিতেছে না। ইহার চেয়ে আরও অন্তরের কথা শোনাও।'

রায় বলিলেন, 'কান্তাপ্রেম সবসাধ্যসার। এই স্থানে ভাগবতের দুইটি ও 'ভক্তিরসামৃত সিন্ধু' হইতে একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিলেন রায়।—

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ ব্রজসুন্দরীণাম্॥ —ভাঃ ১০।৪৭।৬০

—'রাসোৎসবে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভুজলতা দ্বারা কণ্ঠে আলিঙ্গিতা হইয়া তাঁহাদের মনোরথ পূর্ণ হওয়ায় ব্রজসুন্দরীগণ যে প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সে প্রসাদ কৃষ্ণের (বিষ্ণুর) বাম বক্ষ-স্থলে নিয়ত-বর্তমান লক্ষ্মীদেবীও লাভ করেন নাই, আর অন্যান্য কামিনীগণের তো কথাই নাই।

এই কান্তাপ্রেমে শান্তের নিষ্ঠা, দাস্যের সেবা, সখ্যের প্রীতি, বাৎসল্যের মমতাধিক্য তো আছেই, তদুপরি আছে কায়মনপ্রাণ জাতিকুলমান, সর্বস্ব দিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সেবন। অন্যান্য সমস্ত প্রেম সম্বন্ধের অপেক্ষা রাখে, কিন্তু এই একটি মাত্রই প্রেম, যাহা সম্বন্ধের অপেক্ষা রাখে না, কোন সীমার বন্ধন মানে না। কান্তাপ্রেমে তথা মধুর রসেই সকল রসের পূর্ণতা। কৃষ্ণ রসস্বরূপ, যে প্রেমের যতটুকু বিকাশ, কৃষ্ণেরও ততটুকুই প্রকাশ, দর্পণে প্রতিবিম্বিত বিম্বের ন্যায়।

ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যকান্তা, কিন্তু ব্রজে তাঁহাদের পরকীয়া অভিমান। বৈধী কান্তাপ্রেম হইতে পরকীয়া প্রেমে প্রতিবন্ধক অনেক বেশী, তাই মিলনের উৎকণ্ঠাও সেখানে প্রবল, মিলনের আনন্দও অপরিসীম, 'গোপন মিলন অমৃত গন্ধ-ঢালা।' শ্রীকৃষ্ণের বাঁশীর সুরে স্বজন, আর্যধর্ম, বেদধর্ম, কুলশীলমান, লজ্জা সমস্ত বিসর্জন দিয়া যেদিন গোপীগণ কৃষ্ণের কাছে ছুটিয়া আসিলেন, সেদিন গীতার 'সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ, এই অস্ফুট ইঙ্গিতের উজ্জ্বল রূপায়ণ জগতের সম্মুখে প্রকটিত হইল।

গীতায় ভগবান প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্। —৪।১১
কিন্তু এই প্রেমের* অনুরূপ না পারে ভজিতে।
অতএব ঋণী হয়—কহে ভাগবতে।

বেদান্তের ভাষ্য ভাগবত, ভাগবতের রূপায়ণ শ্রীকৃষ্ণে। রাসমণ্ডলের মধ্যে যত

---

* গোপীপ্রেমের।

গোপী তত কৃষ্ণ ; পুরুষ আর প্রকৃতি, শক্তি ও শক্তিমান্. ব্রহ্ম আর তাঁহার সৎ-চিৎ-আনন্দের লীলাবিলাস !

প্রভু অধীর আনন্দে বলিলেন, 'রায় ! সাধ্যের অবধি এই পর্যন্তই, কিন্তু তোমার অক্ষয় ভাণ্ডারে আর কি কিছুই নাই ? যদি আরও কিছু থাকে তবে বলো।'

রায় বিস্মিত হইলেন, ইহারও পর ? কি আর আছে ইহার পরে ? এই পৃথিবীতে এমন কথা আর তো কেহ কখনও জিজ্ঞাসা করে নাই !

তবুও বলিলেন, গোপীদের মধ্যেও শ্রীমতী রাধিকা শ্রেষ্ঠা এবং তাঁহার প্রেমই 'সাধ্যশিরোমণি।' প্রমাণ-স্বরূপ ভাগবত হইতে শ্লোক তুলিয়া রায় দেখাইলেন, শারদীয় রাসমণ্ডলে শত শত গোপীর মধ্য হইতে শ্রীকৃষ্ণ যখন গোপনে অন্তর্ধান করিলেন, তখন একমাত্র রাধিকাই তাঁহার সঙ্গিনী হইয়াছিলেন, কাজেই রাধিকা প্রেয়সীশ্রেষ্ঠা।

প্রভু বলিলেন, শ্রীকৃষ্ণ শারদীয় রাসে রাধিকাকে সঙ্গিনী করিয়া অন্তর্হিত হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু প্রকাশ্যে তিনি রাধার জন্য অন্য গোপীদের ত্যাগ করেন নাই ; কাজেই যেখানে গোপনতা, সেখানে শ্রেষ্ঠতা কোথায় ? রাধিকার মহিমা স্বীকার করিব তখনই, যখন দেখিব রাধার জন্য কৃষ্ণ সাক্ষাতে অন্য গোপীদের ত্যাগ করেন।

জয়দেব-কবির গীতগোবিন্দ হইতে বসন্তরাস বর্ণনা করিয়া রায় রাধিকার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করিলেন। দেখা গেল, একমাত্র রাধিকার অন্তর্ধানেই শ্রীকৃষ্ণ শতকোটি গোপীকে সাক্ষাতে পরিত্যাগ করিয়া ক্ষুণ্ণ ক্ষুব্ধ মনোবাধিকার অন্বেষণে রাস ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন।

প্রভু বলিলেন, 'রায় তোমার কাছে আসা আমার সার্থক হইল। আর একটু কৃপা কর। কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব আমাকে বল। আমি সন্ন্যাসী, কৃষ্ণ-কথা জানি না, তুমি আমাকে কৃপা কর।'

রায়ের মন বার বার বলিতেছে, 'না না, ইনি সাধারণ সন্ন্যাসী নহেন, ইনি নিশ্চয়ই স্বয়ং কৃষ্ণস্বরূপ', কিন্তু প্রভুর প্রবল ইচ্ছাশক্তিতে রায় যেন রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন করিতে গিয়াও করিতে পারিতেছেন না। তবুও বলিলেন—

আমি নট তুমি সূত্রধার।
যেমত নাচাহ তৈছে চাহি নাচিবার॥
মোর জিহ্বা বীণাযন্ত্র তুমি যন্ত্রধারী।
তোমার মনে যেই উঠে তাহাই উচ্চারি॥

'যাহা হউক', রায় বলিলেন, 'ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান, সর্বশক্তিমান্ সর্বৈশ্বর্যময়, সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ। বেদে যাঁহাকে বলা হইয়াছে 'রসো বৈ সঃ', শ্রীকৃষ্ণই সেই রসের ঘনীভূত মূর্তি, অখিলরসামৃত-বারিধি। বৃন্দাবনে তিনি অপ্রাকৃত নবীন-মদন, সাক্ষাৎ-মন্মথ মন্মথরূপে প্রকাশিত। তাঁহার সেই ঘনীভূত রস-স্বরূপের অপরূপ মাধুর্য পতিব্রতা লক্ষ্মী, বিশ্বভুবনের দেব-গন্ধর্ব স্থাবর-জঙ্গমাদি সমস্ত প্রাণীর, এমন কি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের নিজের চিত্ত পর্যন্ত হরণ করে।

অন্তরঙ্গা, বহিরঙ্গা ও তটস্থা—সৎ-চিৎ-আনন্দ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের এই তিনটি প্রধানা শক্তি; সদংশে সন্ধিনী, চিদংশে সম্বিত, আর আনন্দাংশে হ্লাদিনী অর্থাৎ আনন্দদায়িনী শক্তি, যিনি কৃষ্ণকে নিজ মাধুর্য-রস আস্বাদন করান। হ্লাদিনীর সার প্রেম, প্রেমের পরম সার মহাভাব; শ্রীরাধিকা মহাভাব-স্বরূপিণী, লাবণ্যামৃত, কারুণ্যামৃত ও তারুণ্যামৃত-ধারায় শুচিস্নাতা, স্নিগ্ধ, কুঙ্কুম-চন্দনে সুরভিতা, পবিত্রগাত্রা, কৃষ্ণময়ী শ্রীমতী রাধিকা; দেহ-মন, ইন্দ্রিয়-চিত্ত কেবল কৃষ্ণ-সেবায় উন্মুখ, তদ্ভাব-ভাবিতা, তাদাত্ম্য-প্রাপ্তা।'

উল্লসিত আনন্দে প্রভু বলিলেন, 'রায় কৃপা কর, দোঁহার বিলাস-মহত্ত্ব বর্ণনা করিয়া আমাকে অমৃতময় করিয়া তোল।'

রায় স্তম্ভিত হইলেন, নীরব হইলেন, বলিবার তো আর কিছু নাই? সহসা কি যেন মনে পড়িল, বলিলেন, 'আর আমার কিছু বলিবার সাধ্য নাই, তবে একটি প্রেমবিলাস বিবর্তসূচক সঙ্গীত আছে, তাহা যদি শুনিতে চাও, তবে শোনাইতে পারি, জানি না ইহাতে তোমার সুখ হয় কিনা।'

তারপর গভীর রজনীর নিস্তব্ধ আকাশকে তরঙ্গায়িত করিয়া গম্ভীর সুললিত কণ্ঠে রায় এই সঙ্গীতটি গাহিলেন:

পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল।
অনুদিন বাঢ়ল অবধি না গেল॥
ন সো রমণ, ন হাম রমণী।
দুঁহু মন মনোভব পেষল জানি॥
এ সখি! সে-সব প্রেমকাহিনী।
কানু ঠামে কহবি, বিছুরল জানি॥
ন খোঁজলু দূতী, ন খোঁজলু আন।
দুঁহুক মিলন মাঝত পাঁচবাণ॥

অব সোঈ বিরাগে তুঁহু ভেলি দূতী।
সুপুরুখ-প্রেমক ঐছন রীতি॥

প্রভু এই সঙ্গীতের মর্মকথা—'ন সো রমণ, ন হাম রমণী' শুনিয়া আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না, স্বহস্তে প্রেমের সহিত রায়ের মুখ আচ্ছাদন করিলেন, যেন বলিতে চাহিলেন পরম প্রেমের এই পরমতম গুহ্য তত্ত্বটি প্রকাশ করিও না, অন্তরের ধনকে বাহিরে আনিও না।

এই প্রেমবিলাস-বিবর্ত, প্রেমের প্রগাঢ় পরিণতি, ইহাতে কান্ত ও কান্তার পরৈক্য হয়। কে কান্ত আর কে কান্তা, কে পুরুষ আর কে প্রকৃতি, কে আমি আর কে তুমি, এই ভেদজ্ঞান থাকে না। এইভাব একমাত্র মাদনাখ্য প্রেমেই সম্ভব।

একমাত্র শ্রীরাধিকাই মাদনাখ্য ভাবময়ী, অন্য কোন গোপীতে, এমন কি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেও এই ভাব নাই। মাদনাখ্য প্রেমের অথবা প্রেমবিলাস-বিবর্তের আরও একটি অপূর্ব বৈশিষ্ট্য আছে। পরম গভীরতম মিলনের মধ্যেও ইহা বিরহের জ্ঞান জন্মায়, 'দুহু কোরে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ* ভাবিয়া', আবার বিরহের অতলস্পর্শী শূন্যতার মধ্যেও ইহা মিলনের গভীর আনন্দানুভূতির সঞ্চার করে। ইহারই নাম প্রেম-বৈচিত্ত্য।

জ্ঞানী বলিয়াছেন: 'নেতি, নেতি', ইহা নয় ইহা নয়, জগৎ মিথ্যা, সৃষ্টি মিথ্যা, 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন', একমাত্র ব্রহ্মই সত্য। সাধক যখন সেই ব্রহ্মানন্দে প্রবেশ করেন, তখন সেখানে উপাসক নাই, উপাস্য নাই, ধ্যান-ধ্যাতা-ধ্যেয় নাই; আমি নাই, তুমি নাই; আছে এক নিরবচ্ছিন্ন সমাধি-সত্তা, ইহাই ব্রহ্মবিহার!

আর প্রেম, তথা শ্রীমতী বলিতেছেন, 'ইতি, ইতি, ওগো শ্যাম! তুমি আছ তাই এই বিশ্ব আছে, তুমি সুন্দর, তাই তোমার বিশ্ব সুন্দর, সুন্দর তোমার রূপ, সুন্দর তোমার বাঁশীর সুর! তুমি রস, আমি প্রেম; তোমার আশ্রয় আমি, আমার আশ্রয় তুমি।'

রস আর প্রেমের মিলন হইল, অণুতে পরমাণু গলিয়া গেল, তখন 'ন সো রমণ, ন হাম রমণী', কেই বা প্রকৃতি, কেই বা পুরুষ?

ইহাই সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণ-বিহার! 'রসো বৈ সঃ রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।' লীলারসে জারিত, উজ্জ্বলিত হইয়া বহু-আকাঙ্ক্ষিত তীর্থমন্দিরে প্রবেশ করিলেন

---

* পাঠান্তর—'ভজিয়া'।

প্রভু। গভীর আলিঙ্গনে রায়কে হৃদয়ে বদ্ধ করিলেন, কিন্তু রায়ের চরম পাওয়া এখনও রহিল বাকী।

রায় রামানন্দের প্রার্থনায় কয়েকদিন বিদ্যানগরে কৃষ্ণ-কথায় কাটাইয়া এবারে প্রভু বিদায়ের জন্য প্রস্তুত হইলেন। বিদায়ের পূর্বসন্ধ্যা; যথানিয়মিত আসিলেন রায়। দশদিন যাবৎ যে সন্দেহ মনের কোনায় উঁকি দিতেছিল, আজ তাহা প্রকট হইয়া উঠিল। রায় বিস্মিত হইয়া প্রভুর দিকে তাকাইয়া বলিলেন, 'প্রভু, যাওয়ার আগে আমার সন্দেহের নিরসন করিয়া যাও। তোমাকে প্রথমে দেখিলাম সন্ন্যাসীরূপে, এখন দেখি তোমার শ্যাম গোপরূপ, তোমার হাতে বাঁশী, চঞ্চল তোমার নয়ন! আর তোমার সম্মুখে এক কাঞ্চনপ্রতিমা দেখিতেছি, তাঁহার গৌর কান্তিতে তোমার সর্ব অঙ্গ যেন আচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে, বলো তুমি কে?'

প্রভু বলিলেন 'রায়! তুমি মহাপ্রেমিক, তাই সর্বত্রই তোমার ইষ্টদর্শন হয়।'

রায় বলিলেন, 'প্রভু, আমার চিত্ত শোধন করিতেই যদি কৃপা করিয়া আসিয়াছ, তবে, "এবে কপট কর, ইহা কোন্ ব্যবহার?"' পরম ভক্ত রায়, মহা-অধিকারী, তাই দ্বিধাহীন কণ্ঠে জোর দিয়া বলিলেন—

প্রভু! তুমি ছাড় ভারি ভুরি,
মোর আগে নিজরূপ না করিহ চুরি।

তখন প্রভু হাসিলেন, রসিকোত্তম পরমভক্ত রামানন্দের কাছে আর স্বরূপ লুকাইতে পারিলেন না—

তবে প্রভু হাসি তাঁরে দেখাইলা স্বরূপ,
রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ।

রায় এই অপূর্ব রূপ-দর্শনে আনন্দে মূর্ছিত হইয়া ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন।

রায় রাধাকৃষ্ণ-যুগলরূপের উপাসক, ব্রজলীলার বিশাখা সখী, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-লীলা দর্শন করিয়াছেন, আজও ধ্যানে সমস্ত লীলাই তাঁহার অন্তরে প্রতিভাত হয়, কিন্তু আজ তিনি কি দর্শন করিলেন, যাহার আনন্দের গভীরতায় একেবারে নিজেকে হারাইয়া ফেলিলেন?

রায় সুদক্ষ পথিকৃৎ। তিনি মাদনাখ্য মহাভাবের দেউলে প্রভুকে লইয়া আসিলেন, কিন্তু জানিতেন না সে মন্দিরে আজ কোন্ রূপ দর্শন করিবেন। সম্মুখে চাহিয়া দেখেন, রাধা নাই, কৃষ্ণ নাই, কান্তা নাই, কান্ত নাই; আছে শুধু একীভূত, দ্রবীভূত প্রেম আর রস, একের অণুতে পরমাণুতে অপরটি মিশ্রিত, জারিত। বস্তু ও ধর্ম, সৎ ও সত্তা, শক্তি ও শক্তিমান্ অবিচ্ছিন্ন, অভেদ, অখণ্ডিত।

আবার চাহিয়া দেখেন সম্মুখে দাঁড়াইয়া, অন্তঃকৃষ্ণ-বহির্গৌর রাধারসজারিত-তনুমন শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য।

শ্রীবৃন্দাবন-যাত্রার প্রাক্কালে

দক্ষিণ দেশ হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে বাসুদেব সার্বভৌম প্রভুর সঙ্গে শিখি মাহাতী, মুরারি মাহাতী, রায় ভবানন্দ প্রভৃতি বৈষ্ণবের পরিচয় করাইলেন।

সংবাদ পাইয়া গৌড়ীয় ভক্তগণও দীর্ঘ বিচ্ছেদের অবসানে তাঁহাদের প্রাণবল্লভের সঙ্গে মিলনের আশায় জননী শচীর আজ্ঞা লইয়া যাত্রা করিলেন নীলাচলের পথে। ভক্তগণ নীলাচলে আসিয়া পৌঁছিলেন। দূর হইতে তাঁহাদের সংকীর্তন-ধ্বনি শুনিয়া বিস্ময়াপ্লুত চিত্তে রাজা প্রতাপরুদ্র প্রাসাদশিখরে আরোহণ করিলেন ভক্ত-দর্শনের আশায়, সঙ্গে বাসুদেব সাবভৌম। রাজা দেখিলেন, প্রথমে জগন্নাথ দর্শন না করিয়া ভক্তগণ দ্রুত অধীর চরণে ছুটিয়া চলিয়াছেন প্রভুর কুটিবাভিমুখে। তিনি বিস্মিত হইয়া ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সার্বভৌম বলিলেন, 'সচল জগন্নাথকে অর্থাৎ গৌড়ীয় ভক্তগণের আরাধ্যতম গৌরকে পূর্বে দর্শন না করিয়া দারুব্রহ্ম দর্শন করা তাঁহাদের অসাধ্য।'

স্বরূপ দামোদর আসিয়া ভক্তদের সম্বর্ধনা করিয়া লইয়া গেলেন প্রভুর কাছে।

স্বরূপ দামোদর প্রভুর দ্বিতীয় স্বরূপ, সঙ্গীতে বৈদগ্ধ্যে অদ্বিতীয় পরম রসবেত্তা ভক্ত! প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণে অপরিসীম ব্যথা পাইয়া চলিয়া গিয়াছিলেন, বারাণসী, প্রভুর প্রতি অভিমানে! সেইখানে এক সন্ন্যাসীর কাছ হইতে ব্রহ্মচর্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রভুকে ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণভজন করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইল। নীলাচলে আসিয়া 'হা চৈতন্য! দয়ানিধি! আমাকে গ্রহণ কর' বলিয়া যখন প্রভুর পদতলে পড়িয়া রোদন করিতে লাগিলেন—অধীর আনন্দে দুই বাহুতে জড়াইয়া প্রভু স্বরূপকে বক্ষে ধারণ করিলেন। ভক্ত, ভগবান দুইজনেরই হৃদয় শান্ত হইল।

ব্রহ্মানন্দপুরী, পরমানন্দপুরী, রায় রামানন্দ, একে একে অন্তরঙ্গগণও উপস্থিত হইলেন নীলাচলে। কত নব অঙ্কুর, কত মঞ্জরিত লতা, কত ছায়াশীতল বনস্পতিতে পূর্ণ হইল জগন্নাথ-ক্ষেত্র, পুণ্য সৌগন্ধ্যে ভরিয়া উঠিল নীলাচলের আকাশ, সিন্ধুতে খেলিতে লাগিল লীলারসতরঙ্গ!

শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর সেবক গোবিন্দও আসিয়া প্রভুর সম্মুখে দাঁড়াইলেন একদিন।

দেহান্তকালে গুরু তাঁহাকে আদেশ দিয়া গিয়াছেন প্রভুর সেবা করিবার জন্য। প্রভু কুণ্ঠিত হইয়া সার্বভৌমকে জিজ্ঞাসা করিলেন, গুরুর সেবক দ্বারা সেবা গ্রহণ এবং তাহা না করিলে গুরুর আজ্ঞা লঙ্ঘন, দুইটিই অপরাধ, এখন কোন্‌টি গ্রহণীয়?'

সার্বভৌম বলিলেন, 'গুরুর আদেশই গ্রহণীয়, সর্বশাস্ত্রের ইহাই বিধান, কিন্তু একটি কথা আমি বুঝিতেছি না, শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরী শূদ্র সেবক রাখিলেন কেমন করিয়া?

প্রভু বলিলেন,' ঈশ্বর প্রীতি ও ভক্তির অধীন, জাতিকুলের বিচার তাঁহার কাছে নাই, তিনি ভালোবাসার কাঙ্গাল, মর্যাদা বা গৌরবের নহে।

গোবিন্দকে প্রভু আলিঙ্গন করিলেন, অঙ্গীকার করিলেন। প্রভুর সেবক-পদ লাভ করিয়া গোবিন্দের জীবন ধন্য হইল।

রথযাত্রার প্রভাত। মহারাজ প্রতাপরুদ্র জগন্নাথের সেবক, পথের ধুলায় নামিয়া আসিয়া সম্মার্জনী-হস্তে রথচলার পথের মলিনতা দূর করিতেছেন। দূর হইতেই দর্শন করিলেন প্রভু; রাজার প্রতি চিত্ত প্রসন্ন হইয়া উঠিল; কিন্তু তাহা রহিল প্রচ্ছন্ন।

রথ আসিয়া দাঁড়াইল পথে, রথী উপবিষ্ট হইলেন, প্রভু গাহিতে লাগিলেন গান 'জগন্নাথ পরিমুণ্ডাযাউ'। সাত সম্প্রদায়ের কীর্তন হইতে লাগিল—প্রভু নৃত্য করিতে লাগিলেন, অন্তরঙ্গ ভক্তগণের মতোই জগন্নাথসেবক রাজা প্রতাপরুদ্রও বিস্মিত দুই নয়নে দেখিতে লাগিলেন, একি অপরূপ! এ কি অলৌকিক, সাত সম্প্রদায়ের সঙ্গেই যে নৃত্য করিতেছেন দীর্ঘ তপ্তকাঞ্চনবর্ণ গৌর সন্ন্যাসী! প্রতাপরুদ্রের উজ্জ্বল দুই নয়নের দিকে চাহিয়াই সার্বভৌম বুঝিলেন, কৃপা হইয়াছে, তাই সানন্দে মহারাজকে বলিলেন, 'শীঘ্রই আপনি প্রভুর সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করিবেন। মণ্ডলীবন্ধনে নৃত্য করিতে করিতে সহসা প্রভু মহারাজের সম্মুখে মূর্ছিত হইয়া পড়িয়া যাইতেছেন, নিষেধ ভুলিয়া মহারাজ ব্যাকুলভাবে বাহু বাড়াইয়া প্রভুর পতনোন্মুখ সুন্দর তনুখানি ধরিয়া ফেলিলেন, আনন্দ শিহরণে মহারাজের অন্তর স্পন্দিত হইতে লাগিল; কিছুক্ষণের মধ্যেই চৈতন্য লাভ করিয়া প্রভু উঠিয়া দাঁড়াইলেন, রাজস্পর্শে যেন শিহরিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, 'ছিঃ ছিঃ! বিষয়ীর স্পর্শ হৈল আমার?' লজ্জায় অপরাধভয়ে মহারাজ মরমে মরিয়া গেলেন, কিন্তু সার্বভৌম প্রভৃতি ভক্তগণ তাঁহাকে অভয়দান করিলেন।

রথযাত্রা, চাতুর্মাস্য সমস্তই শেষ হইয়াছে, এইবার গৌড়ের ভক্তগণ বিদায় গ্রহণ

করিবেন। শ্রীপাদ নিত্যানন্দের সঙ্গে একদিন নিভৃতে প্রভু কি যুক্তি করিলেন কেহই জানিলেন না।

প্রতি বৎসর রথযাত্রার উৎসবে যোগদান করিবার আমন্ত্রণ জানাইয়া, মায়ের জন্য প্রসাদ ও জগন্নাথের প্রসাদী বহুমূল্য বস্ত্র দিয়া, মায়ের পায়ে শতকোটি প্রণাম জানাইয়া প্রভু ভক্তগণকে বিদায় দিলেন ; যাইতে প্রাণ চাহে না, যাইতে দিতেও প্রাণ চাহে না, তথাপি যাইতে হয়। যাত্রাকালে অন্তরঙ্গগণকে বলিয়া দিলেন, 'আমার দুঃখিনী মাতাকে বলিও তিনি যেন তাঁহার অধম পুত্রকে মার্জনা করেন। মতিচ্ছন্ন হইয়াছিল, তাই মাকে ছাড়িয়া আসিয়াছি, কিন্তু বিষ্ণুর কাছে ভোগ নিবেদন করিয়া মা যখন তাঁহার নিমাইএর কথা স্মরণ করিয়া কাঁদিতে থাকেন, তখন আমিই তো গিয়া তাহা গ্রহণ করিয়া আসি, সহসা চেতনা পাইয়া মা শূন্যপাত্র দেখিয়া চমকিত হন—'তবে কি আমি ভোগ নিবেদন করি নাই ? না, কি খাইয়া গেল কিছুতে ?' অশ্রুমার্জনা করিয়া তাড়াতাড়ি রন্ধনগৃহে গিয়া দেখেন, পরিপূর্ণ রহিয়াছে পাকপাত্র, নিজের ভুল মনে করিয়া পুনবায় নিবেদন করেন ভোগ! মাকেও বলিও, আমিই তাঁহার কাছে যাই, তাঁহাব বন্ধনে আমার কত আনন্দ, মা কেন বোঝেন না ?'

ভক্তগণ বিদায় গ্রহণ করিলেন। যাত্রার সময়ে 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'-গ্রন্থ প্রণেতা গুণরাজ খানের (শ্রীমালাধব বসুর) পুত্র শ্রীসত্যবাজ খান জিজ্ঞাসা করিলেন, 'প্রভু, আমবা গৃহস্থ, বিষয়ী, আমাদের সাধনা কি ?'

প্রভু বলিলেন—"কৃষ্ণসেবা বৈষ্ণব সেবন
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্তন।

সত্যরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বৈষ্ণব চিনিব কেমতে ?'

প্রভু বলিলেন, 'যাঁহার মুখে একবার কৃষ্ণনাম শুনিবে তিনিই পূজ্যশ্রেষ্ঠ। নাম হইতেই নববিধা ভক্তি হয়, নাম দীক্ষাদির অপেক্ষা রাখে না, জিহ্বায় স্পর্শমাত্রে আচণ্ডাল সকলকে উদ্ধার করে, তাহাতেই কৃষ্ণপ্রেমোদয় হয়।'

গৌড়ীয় ভক্তগণ চলিয়া গেলে সার্বভৌম একদিন মিনতি করিয়া বলিলেন, 'প্রভু, আমার এক প্রার্থনা, আমার গৃহে তুমি দয়া করিয়া একমাস ভিক্ষা গ্রহণ কর।'

'প্রভু কহে ধর্ম নহে করিতে না পারি।'

ভট্টাচার্য মিনতি করিতে লাগিলেন, কিন্তু প্রভুর এক কথা। ভট্টাচার্য তখন বলিলেন, 'আচ্ছা বিশ দিন কর'। প্রভু বলিলেন, 'না ইহাও সন্ন্যাসীর ধর্ম নহে।'

'পঞ্চদশ দিন দয়া করিয়া আমাকে দাও।'

'না, একদিন'। দশদিনের প্রার্থনা জানাইলেন ভট্ট, প্রভু তাহাতেও সম্মত হইলেন না। অবশেষে ভট্টের আগ্রহাতিশয্যে পাঁচদিন তাঁহার গৃহে ভিক্ষা করিতে সম্মত হইলেন।

বহুদিন ধরিয়াই একলা প্রভুকে ভোজন করাইবার সাধ ভট্টের, আজ বহু চেষ্টায় সেই সুযোগ মিলিয়াছে, ভট্টের গৃহিণী রন্ধনে দ্রৌপদীতুল্যা, মনের সাধ মিটাইয়া শত ব্যঞ্জন, পিষ্টক মিষ্টান্নাদি প্রস্তুত করিলেন।

স্নানান্তে প্রভু ভট্টের গৃহে আসিলেন। উপচার ও আয়োজনের প্রাচুর্যে, গন্ধে পবিত্রতায় প্রভুর মন প্রসন্ন হইয়া উঠিল,—শ্রীকৃষ্ণ-সেবায় ভট্টের কি গভীর নিষ্ঠা, বলিলেন 'ভট্ট! তুমি পরমভক্ত তাই কৃষ্ণ তোমার নিবেদিত ভোগ গ্রহণ করিয়াছেন, আমার পরম সৌভাগ্য যে শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃত প্রসাদ লাভ করিব। শ্রীকৃষ্ণের এই শুভ্র সুন্দর আসনখানি তুলিয়া রাখো আমাকে অন্য আসনে, ভিন্ন পাত্রে কিঞ্চিৎ প্রসাদ দাও।

ভট্ট বলিলেন, প্রভু! অন্ন যাঁহার প্রসাদী এই আসনও তাঁহারই প্রসাদী, তুমি ইহাতে বসিয়াই প্রসাদ গ্রহণ কর, দ্বিধা করিও না।

প্রভু বলিলেন, 'ভালো কথা, প্রসাদ গ্রহণ করিব কিন্তু এত অন্ন দিয়াছ কেন সরাইয়া লও।

অভিমানে পূর্ণ হইয়া ভট্ট বলিলেন 'ওগো প্রভু! নীলাচলে বাহান্ন বার শত শত ভার অন্নভোগ গ্রহণ করিতে পারো, তাহার তুলনায় এই একগ্রাস তুমি আহার করিতে পারিবে না, একথা তুমি বলিলেই কি আমি বিশ্বাস করিব?'

ভট্টের ভয়ে আর কিছু না বলিয়া হাসিয়া প্রভু অন্ন স্পর্শ করিলেন। ভট্টের কন্যা ষাঠীর স্বামী 'অমোঘ, কুলীন-কুলপ্রদীপ—শ্বশুরান্নে পালিত অত্যাজ্জ্য-জীব। জামাতার স্বভাব ভালো করিয়াই জানে, তাই ভট্ট লাঠি-হাতে দ্বারে বসিয়া আছেন, পাছে শ্রীমান আসিয়া প্রভুর কোনও অসম্মান করেন সেই আশঙ্কায়।

হঠাৎ ভট্টের সামান্য অনবধানতার ফাঁকে কোথা হইতে অমোঘের আবির্ভাব হইল, আসিয়াই প্রভুর পাত্রের দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, 'বাবা! একলা এক সন্ন্যাসীর পাতে এত অন্ন! এই অন্নে যে দশ বারো জনকে পরিপূর্ণ ভোজন করানো যাইত।

শুনিবা মাত্র লজ্জায় ক্ষোভে ষাঠীর মাতা কপালে করাঘাত করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন—'রাণ্ডী হোক ষাঠী!' দুর্বার ক্রোধে লাঠি লইয়া ভট্ট জামাতাকে

তাড়া করিলেন, দ্রুতগতিতে অমোঘ অপসৃত হইল, কিন্তু রাখিয়া গেল দুঃসহ লজ্জার ভার।

কৌতুকে একটু হাসিয়া নির্বিকার প্রসন্নমুখে প্রভু আহার সমাপন করিলেন। কাঁদিতে কাঁদিতে ভট্ট আসিয়া প্রভুর পদতলে পড়িলেন, 'অসম্মান করিবার জন্যই আজ তোমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আমার গৃহে আনিয়াছিলাম! কি বলিয়া আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাহিব? আমার মৃত্যু হোক্, ইহা ছাড়া আর কিছু কামনা আজ আমাব নাই।'

হাসিয়া প্রভু বলিলেন, 'কেন বৃথা অধীর হইতেছ ভট্ট! অমোঘ তো মিথ্যা বলে নাই।'

ভট্টকে বহু প্রবোধ দিয়া প্রভু চলিয়া গেলেন। ভট্ট আসিয়া গৃহিণীকে বলিলেন, 'চৈতন্যনিন্দা যে করে তাহাকে হত্যা করাই বিধি; তাহা না পারিলে আত্মহত্যা করিতেই হয়, কিন্তু কোনোটিই আমি করিতে পারিব না; করিলে আমাকে ব্রহ্মবধের ভাগী হইতে হয়। কাজেই ষাঠীকে বল, এই পতিত অধম স্বামীকে সে ত্যাগ করুক, ইহাতে তাঁহার বিন্দুমাত্র অপরাধও হইবে না।'

দুঃখে ও বেদনায় ভট্ট ও তাঁহার পত্নী উপবাসী হইয়া রহিলেন!

কিন্তু কি ঈশ্বরের লীলা, কি তাঁহার অমোঘ বিধান। পরদিন সকালেই অমোঘের প্রবল বিসূচিকা ব্যাধি হইয়া প্রাণসংশয় হইল। মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া ভট্ট বলিলেন, 'ঈশ্বর আছেন, তাই আমার কার্য তিনিই সম্পন্ন করিতেছেন। আজ ইহার মৃত্যু হইতে অধিক কাম্য আমার কিছু নাই।' অমোঘের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা দূরে থাকুক ভট্ট অমোঘের প্রতি ফিরিয়াও চাহিলেন না।

আচার্য গোপীনাথের নিকট হইতে এই সংবাদ পাইয়া প্রভু দ্রুত আসিয়া মৃত্যুপথযাত্রী আমোঘের শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইলেন। আপন কল্যাণ-দক্ষিণ হস্তখানি অমোঘের বক্ষে রাখিয়া বলিলেন, 'এই হৃদয় সহজ নির্মল, কৃষ্ণ অধিষ্ঠানযোগ্য, কৃষ্ণকে প্রতিষ্ঠিত না করিয়া মাৎসর্য-চণ্ডালকে কেন এই স্থানে বসাইলে? উঠ অমোঘ! ভক্তশ্রেষ্ঠ ভট্টের সঙ্গগুণে তোমার কলুষ ক্ষয় হইয়াছে। তুমি কৃষ্ণনাম কর, অচিরেই তাঁহার কৃপালাভ করিবে।'

শুনি কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি অমোঘ উঠিল।
প্রেমোন্মাদে মত্ত হৈয়া নাচিতে লাগিল॥

অমোঘের মোহ দূর হইল। প্রভুর স্পর্শে নবজীবন লাভ করিয়া অমোঘ উঠিয়া প্রভুর চরণে পতিত হইয়া আত্মসমর্পণ করিলেন। প্রভু তাঁহাকে উঠাইয়া আশ্বাস

ও আলিঙ্গন দান করিয়া সার্বভৌমের গৃহে গেলেন, বলিলেন, 'সার্বভৌম! অমোঘ বালক, তাহার অপরাধ ধরিয়া উপবাস করিয়া আছ, ইহা কি তোমার মত বিজ্ঞজনের উচিত? এখন উঠিয়া উপবাস ভঙ্গ কর। তোমার আর দুঃখ নাই, অমোঘ পরম বৈষ্ণব হইয়া গিয়াছেন। আমি এইখানে বসিলাম, তুমি উপবাস ভঙ্গ করিলে তবে যাইব।' অশ্রুসিক্ত রুদ্ধকণ্ঠে ভট্ট বলিলেন, 'অমোঘ মরিতেছিল, কেন তুমি তাহাকে বাঁচাইলে?' 'না, না' প্রভু বলিলেন, 'তুমি এইরূপ কথা বলিও না, তাহার অপরাধ সম্পূর্ণ দূর হইয়াছে, তুমি উঠ।'

ভট্ট এতক্ষণে যেন আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, 'আচ্ছা প্রভু, তুমি আর কষ্ট করিয়া এইখানে বসিও না, গিয়া জগন্নাথ দর্শন কর, আমি কথা দিতেছি ভোজন করিব।'

প্রভু উঠিলেন, কিন্তু গোপীনাথ আচার্যকে রাখিয়া গেলেন, ভট্ট প্রসাদ পাইলে পরে যেন তিনি গিয়া প্রভুকে জানাইলেন।

চরম অমঙ্গলের মধ্য দিয়া আসিল পরমমঙ্গল। কত সহজে অমোঘের রূপান্তর ঘটিয়া গেল, প্রভুর কৃপায় ধন্য, কৃতার্থ অমোঘ হইয়া উঠিলেন পরমভক্ত।

এবার প্রভু বৃন্দাবন-যাত্রার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন। কিন্তু এতকাল পরে আরাধ্যতমকে একান্ত কাছে পাইয়াছেন রায় রামানন্দ, দিনরাত্রি সুধা-সিঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে কৃষ্ণরসে, প্রভুকে ছাড়িতে মন চাহে না, তাই তিনি এবং সার্বভৌম 'আজ নহে, কাল, রথযাত্রা দর্শন কর, এখন বর্ষা, কোথায় যাইবে? কার্তিক মাসে যাইও, এইরূপে নানা আপত্তির ছল পাতিয়া প্রভুকে আরও কিছুকাল কাছে রাখিলেন। ভক্তের ইচ্ছার কাছে প্রভুও যেন কতকটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজেকে সমর্পণ করিলেন।

আবার রথযাত্রার সময় আসিল। আবার আসিলেন গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দ, এইবার সঙ্গে আসিলেন ভক্তিমতী বৈষ্ণব গৃহিণীগণ। প্রভুসেবার মানসে বৈষ্ণবীগণ নানা দ্রব্যসম্ভার সঙ্গে লইয়া দীর্ঘ পথ পরিক্রমান্তে নীলাচলে উপস্থিত হইয়া নয়ন মনের তৃষ্ণা মিটাইয়া প্রভুর চরণসুধা পান করিতে লাগিলেন। পূর্ববৎসরের ন্যায় এইবারও নৃত্য-কীর্তনাদিতে মহানন্দে স্নানযাত্রা, রথযাত্রা-উৎসব সম্পন্ন হইল। মাতৃসমা বৈষ্ণবীগণের দীর্ঘলালিত কামনা পূর্ণ করিয়া প্রতি গৃহেই প্রভু ভিক্ষা গ্রহণ করিলেন। সুদূর নবদ্বীপের একখানি দীপ্তিহীন কুটির হইতেই পুত্রহারা জননী শচীর সমগ্র মন-প্রাণ-সত্তার সবটুকুই ভাবময় রূপ লইয়া আশ্রয় করিয়াছে মাতৃসমা বৈষ্ণবীগণের অন্তরে, তাঁহাদের স্নেহে পরিচর্যায় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিজেকে হারাইয়া হইয়া

গেলেন নদীয়ার নিমাই, শচীমাতার অঞ্চলের ধন। বাৎসল্যের অমৃতধারায় পূর্ণ হইয়া উঠিল জননীগণের বক্ষ,অন্তরঙ্গ-লীলার একখানি চিত্র ফুটিয়া উঠিল নিভৃতে।

বিদায়সময় আসন্ন, আবার শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে লইয়া প্রভু বসিলেন গোপনে, নিভৃতে আবারও কি কথা হইল, আচার্য অদ্বৈতই বা কি প্রহেলী বলিলেন কেনই বা যেন কোন প্রার্থনা পূর্ণ হইল বলিয়া আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন, তাহা কেহই বুঝিলেন না। শ্রীনিত্যানন্দকে প্রতি বৎসর নীলাচলে না আসিয়া, গৌড়ে থাকিয়া ভক্তি বিলাইবার অনুরোধ করিলেন প্রভু। গৌড়ে থাকিয়া গৌরবিচ্ছেদ দুঃসহ হইবে। হোক্, তবুও প্রাণগৌরের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক শ্রীনিত্যানন্দ বলিলেন 'আমি দেহ, তুমি প্রাণ, যে ভাবে চালাও সেই ভাবেই চলি অচল দেহের সাধ্য কি প্রাণের ইচ্ছায় সাড়া না দিয়া ?

এইবারও কুলীন গ্রামবাসী সত্যরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন গৃহস্থ বিষয়ীর কর্তব্য কি ? প্রভু বলিলেন, 'বৈষ্ণব সেবন ও নামকীর্তন।

'বৈষ্ণব চিনিব কেমন করিয়া ?

'নিরন্তর যাঁহার বদনে কৃষ্ণনাম স্ফুরিত হয়, তিনিই বৈষ্ণব।

রায় রামানন্দ ও সার্বভৌম প্রভৃতি ভক্তের আগ্রহে ও আকুলতায় দুই বৎসর কাটিল, বর্ষান্তরে অর্থাৎ তৃতীয় বর্ষেও রথযাত্রাদির উৎসবের শেষ বিদায়কালে সত্যরাজ আবার প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

'বৈষ্ণব কে, কেমন করিয়া চিনিব ?

প্রভু এইবার বলিলেন—

যাঁহার দর্শনে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম,
তাঁহারে জানিহ তুমি বৈষ্ণব প্রধান। —চৈঃ চঃ

এই ভাবে— ক্রম করি কহে প্রভু বৈষ্ণব লক্ষণ
বৈষ্ণব, বৈষ্ণবতর আর বৈষ্ণবোত্তম। —চৈঃ চঃ

বৈষ্ণবের পরিচয়ে প্রভু বলিলেন, যাঁহার দর্শনমাত্রই কলুষিত মানবচিত্ত দ্রবীভূত হইয়া শ্রীকৃষ্ণনামের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তিনিই বৈষ্ণব ঈশ্বরদর্শী মহামানব।

দুই বৎসর কাটিয়া গেল, এইবার প্রভু যখন জননী জাহ্নবীকে দর্শন করিয়া বৃন্দাবন-যাত্রার সংকল্পে দৃঢ় হইলেন, তখন রায় আর ভট্ট আপত্তি করিতে পারিলেন না।

বৃন্দাবন-যাত্রা

বিজয়া-দশমীর দিন প্রভু যাত্রা করিলেন। নীলাচল হইতে যাত্রা করিয়া প্রভু যখন কটকে পৌঁছিলেন, পশ্চাতে দোলায় আরোহণ করিয়া রায়ও আসিয়া প্রভুর আগমন-বার্তা মহারাজ প্রতাপরুদ্রের নিকট নিবেদন করিলেন। আপন রাজধানীতে পরমদেবতার পদধূলি পড়িয়াছে জানিয়া, মহাসৌভাগ্যের উদয়ে পুলকিত, আনন্দিত মহারাজা প্রতাপরুদ্র সসম্ভ্রমে ছুটিয়া আসিয়া প্রভুর পদতলে লুণ্ঠিত হইলেন। এইবার আর ছদ্মবেশের আশ্রয় লইতে হইল না, বিষয়ী বলিয়া প্রভুর অবজ্ঞাও সহিতে হইল না, প্রভু মহারাজকে নিবিড় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিলেন। প্রভুর কৃপাশ্রুতে রাজদেহ সিক্ত হইতে লাগিল, পুলকে আনন্দে রাজা আত্মহারা হইয়া গেলেন। এতদিন "হিয়ার পরশ লাগি হিয়া" কাঁদিতেছিল, এইবার পরমলগ্নের অভ্যুদয়ে সেই পুণ্যস্পর্শ লাগিল দেহে, মন-প্রাণ সুশীতল হইয়া গেল। প্রভু কায়মনোবাক্যে রাজা প্রতাপরুদ্রকে কৃপা করিলেন, সেইদিন হইতে প্রভুর নাম "প্রতাপরুদ্র-সংত্রাতা"।

রাজবধূ-রাজমহিষীগণও হস্তীর উপরে "তাম্বুগৃহে" আরোহণ করিয়া দূর হইতেই প্রভুকে দর্শন-প্রণাম করিয়া মনে মনে প্রভুর চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন, হয়তো বা অন্তরলোকে অন্তরতমের আশীর্বাদও পৌঁছাইল। প্রতাপরুদ্রের রাজ্যসীমা পর্যন্ত স্থানে স্থানে প্রভুর জন্য বিশ্রামগৃহ নির্মিত হইল, নদী পার করিবার জন্য এক নূতন তরণী প্রস্তুত হইল; সেই ঘাটে প্রভু স্নান করিলেন, প্রভুদেহ-স্পর্শপুণ্য সেই জলে যেন দেহান্তকালে প্রাণত্যাগ করিতে পারেন,—রাজা সেই ঘাট চিহ্নিত করিয়া রাখিলেন।

প্রভুর সঙ্গে স্বরূপ, জগদানন্দাদি বহু ভক্ত চলিয়াছেন, পণ্ডিত গদাধরও আসিয়া দাঁড়াইলেন। প্রভু বলিলেন, গদাধর! ক্ষেত্র-সন্ন্যাস পরিত্যাগ করিয়া তুমি আমার সঙ্গে আসিও না।'

প্রভুর বিচ্ছেদশঙ্কাতুর গদাধর বলিলেন, 'তুমি যেখানে তাহাই নীলাচল-ক্ষেত্র, আমার ক্ষেত্র-সন্ন্যাস রসাতলে যাক্, আমি যাইব।'

'কিন্তু তোমার গোপীনাথ বিগ্রহ আছেন, তাঁহার সেবা তো তুমি ত্যাগ করিতে পার না?'

'তোমার পদ-দর্শনে গোপীনাথের সেবা হইতে কোটিগুণে অধিক সেবা হয়।'

'কিন্তু সেবাত্যাগ-অপরাধের জন্য যে আমি দায়ী হইব ?'

'না, তোমার কোনও দায় নাই, আমার অপরাধের দায়িত্ব আমারই! তাহা ছাড়া তোমার সঙ্গেও আমি যাইতেছি না, একলাই গৌড়ে গিয়া জননী শচীদেবীকে দর্শন করিব।'

এই বলিয়াই পণ্ডিত প্রভু ও ভক্তগণের সঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একা চলিতে লাগিলেন। বিগ্রহের যিনি প্রাণ তিনি চলিয়াছেন পথে, তাঁহার চরণ-সঙ্গ ত্যাগ করিয়া বিগ্রহসেবার জন্য নীলাচলে থাকা গদাধরের পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হইল না।

কটকে আসিয়া প্রভু প্রিয়তম গদাধরকে ডাকিয়া আনাইলেন, প্রণয়রুদ্ধ গদ্‌গদ স্বরে বলিলেন, 'গদাধর! প্রতিজ্ঞাসেবা ত্যাগ করিবে বলিয়াছিলে, তাহা তো করিয়াছ, এতদূর আসিয়াছ আমার সঙ্গে! বিগ্রহসেবা ও ক্ষেত্র-সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়া আসিয়াছ, আমার সঙ্গে থাকিয়া নিজে আনন্দ পাইবার আশায়! কিন্তু নিজের দুই ধর্ম ত্যাগ করিয়া, আমাকে দুঃখ দিয়া কি তোমার সুখ হইবে? যদি আমাকে সুখী করিতে চাও, তবে আমার শপথ, আর কিছু বলিও না, তুমি ফিরিয়া নীলাচলে যাও।' বলিয়াই প্রভু গিয়া নৌকায় উঠিলেন, নৌকা ছাড়িয়া দিল, পণ্ডিত মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন, সার্বভৌমকে প্রভু বলিয়া গেলেন গদাধরকে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়ার জন্য।

নিজের অসহ্য ব্যথা বক্ষে চাপিয়া বৃদ্ধ সার্বভৌম বহু কষ্টে, বহু প্রবোধ দিয়া গদাধরকে লইয়া ফিরিয়া গেলেন নিবানন্দ নীলাচলে।

চলিতে চলিতে প্রভু যাজপুর আসিলেন। রায় রামানন্দ এই পর্যন্ত প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে আসিতেছেন, রাত্রিদিন কৃষ্ণকথায় মগ্ন হইয়া আছেন দুইজনে, কিন্তু এইবার বিদায়ের পালা। রায়কে বিদায় সম্ভাষণ জানাইতে প্রভুর বক্ষও বিদীর্ণ হইতে চায়, তবুও বিদায় লইতে হইল, রায় মূর্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িলেন। এইবার পরম নিষ্ঠুরের মত প্রভু ভক্তকে ফেলিয়া যাইতে পারিলেন না, রায়কে ক্রোড়ে লইয়া প্রভু ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

তারপর দুই হাতে যেন সমস্ত কোমলতা ত্যাগ করিয়া প্রভু উঠিয়া আসিলেন; আরম্ভ হইল একক পরিক্রমা।

উড়িষ্যা রাজ্যসীমান্ত শেষ হইল—ইহার পরেই যবন অধিকারীর রাজ্য। ভয়ে কেহই সীমান্ত অতিক্রম করে না, উড়িষ্যারাজ-অধিকারী প্রভুকে দুই চারি দিবস নিজের নিকটে রাখিয়া পার করিবার উপায় খুঁজিতে লাগিলেন। কিন্তু যিনি ভবপারের কাণ্ডারী তাঁহার 'পারে'র জন্য অধিকারীকে অধিক ভাবিতে হইল না।

প্রভুর আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই সহস্র সহস্র লোক প্রভুর কাছে আসিতে লাগিলেন, ক্রমে যবন অধিকারীও প্রভুর কথা শুনিলেন। কিছুটা বিস্ময় কিছুটা বা কৌতূহল, যবনরাজ একজন গুপ্তচরকে গোপনে প্রভুর খবর জানিতে পাঠাইলেন। সেই গুপ্তচর গিয়া যখন প্রভুর দিব্য প্রেম, অলৌকিক রূপ ও ভাবের কথা বলিলেন—তখন কেন কে জানে অপূর্ব এই মানুষটিকে দর্শন করিবার আবেদন জানাইয়া শত্রু উড়িষ্যারাজ-অধিকারীর নিকটে লোক পাঠাইলেন। শুনিয়া উড়িষ্যারাজ-অধিকারী বিস্মিত হইলেন, একি অদ্ভুত। অত্যাচারী যবন অধিকারীর কেন প্রভু-দর্শনের জন্য এই উৎকণ্ঠা ? কেবল নাম শুনিয়াই কি চিত্তের এতখানি পরিবর্তন ?

অধিকারী খবর পাঠাইলেন, 'নিরস্ত্র হইয়া, মাত্র কয়েকটি ভৃত্য সঙ্গে লইয়া যদি তিনি আসেন তবে প্রভু-দর্শনে কোনও বাধাই হইবে না।'

হিন্দুবেশ ধারণ করিয়া যবন অধিকারী আসিলেন, কে যেন অন্তর হইতে তাঁহাকে নির্দেশ দিতেছিলেন, 'যিনি স্রষ্টা, যিনি আল্লা তাঁহারই প্রকাশ দেখিবে তুমি সন্ন্যাসীর মধ্যে।' সসম্মানে তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়া আসিলেন হিন্দু অধিকারী। প্রভুর সম্মুখে তাহাকে আনা হইল, দূর হইতে প্রভুকে দর্শন করা মাত্রই যবনের অন্তর পুলকে আনন্দে শিহরিয়া উঠিল, হিন্দু ভক্তের মতোই ভূমিতে শির লুটাইয়া তিনি দণ্ড-প্রণাম করিলেন, বলিলেন, 'প্রভু। আমি যবনকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি বলিয়া তোমার চরণলাভ করিতে পারিলাম না, হিন্দু হইলে তো লাভ করিতাম।'

তাঁহার অকপট ভক্তি-দর্শনে প্রভু পরম সন্তোষ লাভ করিলেন—কৃপায় তাঁহাকে অঙ্গীকার করিলেন, অধিকারী ধন্য হইলেন। বিনয়-নম্র সুরে অধিকারী, গোব্রাহ্মণ-হত্যারূপ অপরাধের দায় হইতে উদ্ধার কামনা জানাইলেন প্রভুর পায়ে।

মুকুন্দ সেই সময়ে অধিকারীকে বলিলেন, 'গঙ্গাতীর পর্যন্ত প্রভুর গমন করিবার ইচ্ছা, আপনি যদি এই যাত্রার কিছু সহায়তা করিতে পারেন তবে বড়োই ভালো হয়।'

অধিকারী সানন্দে সম্মত হইলেন, দীর্ঘকালের বিরোধের অবসান হইল, যবন ও হিন্দু দুই রাজঅধিকারী প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ হইলেন।

পরের দিন দশটি নৌকায় সৈন্য ও সমরসজ্জাদি পূর্ণ করিয়া অপর এক নবনির্মিত নৌকায় প্রভুকে লইয়া যবন অধিকারী তাঁহার রাজ্যসীমা পিছলদা পর্যন্ত গেলেন। জলদস্যুর ভয়ে এই সমরসজ্জা।

নির্বিঘ্নে বিপজ্জনক এলাকা পার করিয়া দিয়া এইবার অধিকারী প্রভুর নিকটে অশ্রুসজল নয়নে বিদায় গ্রহণ করিলেন। প্রভুর ক্ষণিক দর্শন ও সান্নিধ্য লাভ করিয়াই তাহার জীবনে ঘটিল এক নব রূপান্তর!

প্রভু ঐ নৌকাতে করিয়াই পানিহাটি আসিয়া পৌঁছিলেন। পারে উঠিয়া মাঝিকে একখানি বস্ত্র দান করিলেন।

মুহূর্তে বার্তা রটিয়া গেল, "প্রভু আসিয়াছেন', জলে স্থলে আর স্থান রহিল না। দেখিতে দেখিতে লোকে পূর্ণ হইয়া গেল! রাঘবপণ্ডিত আসিয়া পরম সমাদরে প্রভুকে নিজগৃহে লইয়া গেলেন। অকস্মাৎ এই পরম-আবির্ভাবে দেশবাসীর চিত্ত আনন্দে পূর্ণ হইল। পানিহাটিতে একদিন থাকিয়া প্রভু কুমারহট্টে শ্রীবাসের গৃহে উপস্থিত হইলেন, আনন্দে আবেগে চারিভ্রাতাসহ শ্রীবাস প্রভুর চরণে লুটাইয়া পড়িলেন।

শ্রীশিবানন্দ সেনের গৃহেও আতিথ্য গ্রহণ করিয়া তাহাদের ধন্য করিয়া প্রভু আসিলেন সার্বভৌমের ভ্রাতা বাচস্পতির গৃহে। আনন্দে বাচস্পতির কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল; কি বলিবেন, কোথায় এই পরম ধনটি রাখিবেন যেন বুঝিতে পারিলেন না। প্রভু তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, 'বাচস্পতি। কয়েকদিন আমি একটু নিভৃতে থাকিতে চাই, আমাকে একটি নির্জন গৃহ দাও।'

যুক্তকরে বাচস্পতি বলিলেন, 'প্রভু! আমার বংশের ভাগ্যে আমার এ দীনকুটিরে তোমার সুমঙ্গল চরণ-ধূলির উদয় হইয়াছে, এ-গৃহ ও গৃহের যাহা কিছু সমস্তই তোমার, তুমি নিভৃতে থাক, কেহই জানিবে না।'

সূর্যের প্রখর উজ্জ্বল কিরণ হস্তদ্বারা আবৃত করার চেষ্টার মতোই চেষ্টা হইল বাচস্পতির! চতুর্দিক হইতে শত, সহস্র, লক্ষ, অর্বুদ লোক আসিতেছেন, গৃহ, পথ, বন ভাঙ্গিয়া লোক আসিতেছেন; দিবারাত্রি বাচস্পতির গৃহের চারিদিকে হরিধ্বনি আর প্রভুর প্রতি আহ্বান, 'ওগো গৌরহরি! একবার বাহিরে আসিয়া দর্শন দাও, দয়াল!'

গঙ্গার ঘাটে-আঘাটে শত শত তরণীর ব্যবস্থা হইল, কিন্তু অসম্ভব হইল এত লোক পার করা, কেহ কলসী বুকে লইয়া, কেহ সাঁতার দিয়া পার হইতে লাগিলেন। লোকের আর্তি ও হরিধ্বনি শুনিয়া করুণাসাগর প্রভু বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন—

কি সে শ্রী বিগ্রহের সৌন্দর্য মনোহর,
সে রূপের উপমা সেই সে কলেবর!

সর্বদায় প্রসন্ন শ্রীমুখ বিলক্ষণ,
আনন্দধারায় পূর্ণ দুই শ্রীনয়ন !
ভক্তগণ লেপিয়াছে সর্বাঙ্গে চন্দন,
মালায় পূর্ণিত বক্ষ, গজেন্দ্র গমন ।
আজানুলম্বিত দুই শ্রীভুজ তুলিয়া,
হরিবলি সিংহনাদে করেন গর্জন । —চৈঃ ভাঃ

দর্শনমাত্রে সকল কলুষ, সকল মলিনতা দূর হইয়া গেল, ভক্ত, অভক্ত, দোষী সকলের চিত্ত-মন মোহিত করিয়া উঠিল গগনভেদী হরিধ্বনি, আনন্দে রোমাঞ্চিত হইলেন ধরণী ।

সকলে বলিতে লাগিলেন, 'প্রভু ! তুমি আমাদের এত কাছে ছিলে, আমরা পাপী তাই তোমাকে চিনিতে পারি নাই, আমাদের উদ্ধারের জন্যই তোমার অবতরণ, তোমার এই সন্ন্যাস-গ্রহণ । আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর, তুমি কৃপা করিয়া আমাদের উদ্ধার কর ।' দুই হাত তুলিয়া সকলকে আশীর্বাদ করিলেন প্রভু, — 'তোমাদের সকলের কৃষ্ণে মতি হোক, বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, শোন কৃষ্ণ নাম ।'

বাচস্পতির গৃহদ্বার গৃহ, প্রাঙ্গণ এবং সমগ্র গ্রামেও আর তিলধারণের স্থান নাই, বৃক্ষে, গৃহের ছাতে, সর্বত্রই লোক ।

অকস্মাৎ কৌতুকময় প্রভুর কি মনে হইল, অথবা 'নিভৃতে'র স্বরূপ দেখিয়া কোথায় লুকাইয়া চলিয়া গেলেন, কেহই, এমন কি বাচস্পতিও তাহা জানিলেন না ।

এদিকে লোকের পর লোক আসিয়া কাতর আর্তনাদ করিতেছেন, কেহ বা বাচস্পতির পায়ে ধরিয়া মিনতি করিতেছেন, 'শুধু আমাকেই একলা একবার দর্শন করাও বাচস্পতি, আমি তোমার ভৃত্য হইয়া থাকিব ।' কেহ বা বিরক্ত হইয়া বলিতেছেন, 'উত্তম জিনিসটি পাইয়াছ, সকলকে অংশ না দিয়া একাই কেন তুমি ভোগ করিতে চাও, বাচস্পতি ? আমরা একটু পাইলে তোমার কি ক্ষতি ?'

বাচস্পতি চারিদিকে খুঁজিয়াও প্রভুকে না পাইয়া মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, সকলকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে সত্যই প্রভু তাঁহার ঘরে নাই । কিন্তু নিষ্ফল চেষ্টা, কেহই বিশ্বাস করিলেন না, ক্রুদ্ধ হইয়া বলিতে লাগিলেন, 'ঘরে লুকাইয়া রাখিয়া কেন মিথ্যা বলিতেছ, বাচস্পতি ? তাঁহার দর্শনে আমরা উদ্ধার পাই তাহা কি তুমি চাও না ?'

বাচস্পতি অস্থির হইয়া পড়িলেন, কি করিবেন তিনি? অন্তর্যামী প্রভু বোধ করি তাঁহার অবস্থা বুঝিয়াই এক ব্রাহ্মণকে পাঠাইলেন। ব্রাহ্মণ আসিয়া বলিলেন, কুলিয়ানগরে মাধবদাসের গৃহে প্রভু আছেন। খবরটি পাইবামাত্র বাচস্পতি জনতার সম্মুখে গিয়া বলিলেন, 'বৃথা আপনারা আমাকে দোষারোপ করিতেছেন, প্রভু কুলিয়ানগরে আছেন, সাক্ষী এই ব্রাহ্মণ, চলুন সেখানে আমরা যাই।' আর বলিতে হইল না, লক্ষ কোটি লোক দ্রুত ধাবিত হইলেন কুলিয়ানগরের পথে। নগরে, প্রান্তরে, গঙ্গাবক্ষে, সর্বত্রই কেবল লোক, নরনারী আর কেহই বাদ নাই। মাধবদাসের গৃহে গিয়াও বাচস্পতি লোকারণ্যের মধ্যে প্রভুকে খুঁজিয়া পাইলেন না।

কৌতুক বোধহয় পূর্ণ হইল, কৌতুকী প্রভু গোপনে একজনকে দিয়া বাচস্পতিকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। এতক্ষণে প্রভুর দর্শন পাইয়া আশ্বাস, আনন্দে ও ভক্তিতে বাচস্পতির হৃদয় পূর্ণ হইয়া উঠিল, বাচস্পতি প্রভুর চরণে পতিত হইলেন। প্রভু তাহাকে কাছে বসিতে বলিলেন, কিন্তু বাচস্পতি বসিলেন না, যুক্তকরে ব্যাকুল স্বরে বলিতে লাগিলেন, 'প্রভু, তুমি ইচ্ছাময়, স্বতন্ত্রপুরুষ, যাহা তোমার ইচ্ছা তাহা তুমি কর, তুমি কৃপা করিয়া যদি নিজেকে জানাও তবেই তোমাকে জানা যায়, তুমি না জানাইলে কে তোমাকে জানিতে পারে? আমাকে কৃপা করিয়া দর্শন দিয়াছ নাথ, এখন আরও একটু কৃপা কর, এই লক্ষ লক্ষ লোক আমাকে দোষারোপ করিতেছেন, আমি তোমাকে লুকাইয়া রাখিয়াছি, তাই প্রার্থনা করি তুমি ইহাদের একবার দর্শন দাও।'

তুমি প্রভু তিলার্ধেক বাহির হইলে,
তবে মোরে ব্রাহ্মণ করিয়া লোকে বলে। —চৈ. ভা.

প্রভু হাসিয়া উঠিলেন, প্রসন্ন শ্রীমুখে বহির্বাঙ্গণে আসিয়া দাঁড়াইলেন; হরিধ্বনিতে, নৃত্য-কীর্তনের রোলে কুলিয়া ভরিয়া গেল, ভরিয়া গেল আকাশ, বাতাস, বিশ্বভুবন।

পণ্ডিত দেবানন্দ আসিয়া একদিন প্রভুর পায়ে পড়িলেন, যতদিন প্রভু নবদ্বীপে ছিলেন ততদিন পাণ্ডিত্যাভিমানে দেবানন্দ প্রভু-সম্ভাষণ করেন নাই, কিন্তু এখন গৃহত্যাগী তরুণ সন্ন্যাসীকে দেখিয়া দেবানন্দের বক্ষ বিদীর্ণ হইতে লাগিল, কিন্তু শ্রীবাসের প্রতি পূর্বকৃত এক অপরাধের ভয়েই হয়তো নীরবে এক কোণে বসিয়া রহিলেন। প্রভু সস্নেহে তাঁহাকে আহ্বান করিয়া আপন একান্ত সন্নিকটে আনিলেন, দেবানন্দের হৃদয়ে আসিল আনন্দ ও ভক্তির প্লাবন, সেই প্লাবনে ধুইয়া

গেল সমস্ত অপরাধ, সমস্ত মলিনতা। পণ্ডিতের মনে যতদিন অভিমান অহঙ্কার ছিল ততদিন প্রভু তাঁহাকে কাছে ডাকেন নাই। আজ তাঁহাকে অঙ্গীকার করিয়া ভাগবতের ভক্তিসম্মত ব্যাখ্যা করিবার আদেশ দিলেন।

তারপরে শান্তিপুরে অদ্বৈত-গৃহে কয়েকদিন এবং অন্যান্য ভক্তগৃহে কয়েক দিন বাস করিয়া চলিলেন বৃন্দাবনের পথে, সঙ্গে চলিল অগণিত লোক।

শ্রীনৃসিংহানন্দ প্রভুর পরম ভক্ত, ধ্যাননিষ্ঠ তাঁহার মন। তিনি দূর হইতে মনে মনে প্রভুর বৃন্দাবন-যাত্রার পথ সজ্জিত করিতেছেন, 'কুসুমাস্তীর্ণ ছায়াশীতল পথ দিয়া রাতুল দুই চরণকমল ফেলিয়া চলিতেছেন প্রভু, স্থানে স্থানে কাকচক্ষু স্বচ্ছ সরোবর, তাহাতে রত্নবেদিকা, প্রভু মাঝে মাঝে তাহাতে বিশ্রাম করিতেছেন, সুপক্ক অমৃত ফল ধরিয়া আছে বৃক্ষে বৃক্ষে, প্রভুর সেবায় লাগিতেছে সেব সব—যেন নৈবেদ্যর মতো। ক্রমে ক্রমে ধ্যানে নৃসিংহানন্দ প্রভুকে 'কানাই-এর নাটশালা' পর্যন্ত আনিলেন, কিন্তু মন আর অগ্রসর হইল না। ভক্তগণের কাছে দ্বিধাহীন চিত্তে নৃসিংহানন্দ বলিলেন, 'এইবার প্রভুর কিছুতেই বৃন্দাবনে যাওয়া হইবে না, কানাই-নাটশালা হইতে তিনি ফিরিয়া আসিবেন।'

সত্যই তাহা ঘটিল। রামকেলি গ্রামে পৌঁছিয়া শ্রীরূপ-সনাতনকে দর্শন দান করিয়া তাঁহাদের জীবন ধন্য করিলেন। প্রভুর পদস্পর্শ মাত্রেই সাকরমল্লিক ও দবীরখাসের জীবন রূপান্তরিত হইয়া গেল, প্রভুই তাঁহাদের নব জীবনে নূতন নামকরণ করিলেন 'রূপ-সনাতন'।

সকলের অলক্ষ্যে বাদশাহের ভয়ে সনাতন এক ফাঁকে প্রভুরে বলিলেন, 'প্রভু লক্ষ লক্ষ লোক সঙ্গে লইয়া বৃন্দাবনে যাইও না, বৃন্দাবন-যাত্রার এই রীতি নয়, একলা কিংবা সঙ্গে দুই-এক জন লইয়া যাওয়াই উত্তম। প্রভু তথাপি অগ্রসর হইয়া "কানাই-নাটশালা পর্যন্ত আসিলেন, কিন্তু মন সহসা বিমুখ হইয়া চলিল প্রভু ফিরিয়া চলিলেন নীলাচলের পথে।

শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈত বসিয়া আছেন, অকস্মাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে প্রভুর শুভ অভ্যুদয় হইল, আনন্দে আবেগে আচার্য দিশাহারা হইয়া গেলেন। নবদ্বীপ হইতে ভক্তগণসহ জননী আসিলেন, জননীর চরণে মাথা লুটাইয়া দিলেন পুত্র। দীর্ঘ বিচ্ছেদ-কাতরা জননীর বক্ষে অশ্রুসিক্ত মুখখানি রাখিয়া দুই হস্তে বৃদ্ধা ক্রন্দনময়ী জননীর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া শিশুর মতো ডাকিতে লাগিলেন—'মাগো, আমার মা! তুমি কাঁদিও না, আমি তোমার অধম পুত্র, আমাকে ক্ষমা কর মা।'

প্রভু যে কয়দিন শান্তিপুরে রহিলেন, ভক্তগণ ভুলিয়া গেলেন জগৎসংসারের কথা, সন্তপ্তা জননী ভুলিয়া গেলেন সমস্ত শোক, সবলে বক্ষের ধনটিকে যেন লুকাইয়া রাখিতে চাহিলেন বক্ষের ভিতরে।

ভক্তগণকে মিনতি করিয়া একটি ভিক্ষা মাগিয়া লইলেন জননী, 'নিমাই যে-কয়দিন থাকে আমি তাহাকে ভিক্ষা দিব, এই প্রার্থনাটি রাখো তোমরা, বাপ।'

জননী জীবনের সাধ মিটাইয়া এই শেষ ভিক্ষা দিলেন, পুত্রও সেই সাধ মিটাইলেন।

জননী, ভক্তগণ সকলেই তাঁহাদের নিমাই-এর দর্শনলাভ করিলেন, কিন্তু বাকী রহিলেন মাত্র একজন, তিনি দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া। জগতে যিনি সবচেয়ে আপন, আজ বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছে তিনিই সবচেয়ে পর, যিনি অতি কাছের তিনিই আজ বহু দূরের। 'জীবনে একবার, এই একটি-বার কি দেখা দিবে না, ওগো দয়িত, ওগো বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রাণধন?'

হয়তো বা প্রভুর হৃদয়ও কাঁদিয়া উঠিল, 'ওগো, জগৎ-লক্ষ্মী, ওগো আমার প্রিয়, তুমি কি আমাকে ছাড়া? আমার সন্ন্যাস কি তোমাকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিয়াছে আমার কাছ হইতে?'

সন্ন্যাসীকে একবার জন্মভূমি দর্শন করিতে হয়, [illegible] দীর্ঘ ছয় বৎসর পরে মাতৃভূমির ক্রোড়ে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

নবদ্বীপের পরিচিত পথ, ঘাট—প্রতি বৃক্ষ, লতা সকলেই পরমানন্দে তাহাদের নিমাইকে যেন আকুল ভাবে জড়াইয়া রাখিতে চাহিল, থামিয়া থামিয়া প্রত্যেক চেতন, অচেতন বস্তুর সঙ্গে আত্মার একান্ত নৈকট্য অনুভব করিয়া, কাহারও গায়ে স্নেহের পরশ বুলাইয়া, প্রভু ধীর পদক্ষেপে চলিতেছেন, ক্রমে আপন গৃহের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন রাজপথে, সঙ্গে লক্ষ লক্ষ মানুষ।

বিষ্ণুপ্রিয়া আজ আর কিশোরী নহেন, পূর্ণ যুবতী। দুরু-দুরু কম্পিত বক্ষে গৃহকোণে বসিয়া প্রহর গণিতেছেন, কখন দয়িত আসিয়া দাঁড়াইবেন সম্মুখে, অতি নিকটে। আবার আশঙ্কায় আকুল হইতেছে প্রাণ, যদি দর্শন না দেন?

প্রভু গৃহে গেলেন না, আসিয়া দাঁড়াইলেন গৃহের বাহিরে পথে। মলিনবসনা, তপঃকৃশা বিষ্ণুপ্রিয়ার অন্তর কম্পিত হইতে লাগিল, মুহূর্তের দ্বিধা, 'বাহিরে রাজপথে আমি যাইব? কিন্তু আর তো সময় নাই, আর তো শুভক্ষণ আসিবে না এই জীবনে!' নিভৃত অন্তঃপুর হইতে বাহির হইয়া লক্ষ চক্ষুর সম্মুখে আসিয়া

দাঁড়াইলেন, নতমুখী বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া। জনতা স্তম্ভিত, মর্মাহত হইয়া নিমেষ-বিহীন অশ্রুপ্লুত চোখে তাকাইয়া রহিল, মাতা শচীর বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া শতধা হইতে চাহিল. বিষ্ণুপ্রিয়ার জীবনের এই শেষ শুভক্ষণটিকে একটু নিভৃতে, একটু বা আড়ালে রাখিয়া জননী ও জনতার সরিয়া যাওয়াই উচিত ছিল, কিন্তু কাহারও চরণ চলিল না, নয়ন সরিয়া আসিল না—দুইটি বিরহ-বিধুর করুণ-তরুণীর অলৌকিক, অপার্থিব মিলন-দর্শনের আশায়।

যুক্তকরে হৃদয়ের সমস্ত আকুতি লইয়া বিষ্ণুপ্রিয়া তাঁহার প্রাণনাথের পদতলে লুণ্ঠিতা হইলেন, অশ্রুধারায় সিক্ত হইতে লাগিল সেই দুইটি রক্তচরণ। প্রভু স্তব্ধ হইয়া রহিলেন মুহূর্তকাল, হৃদয় উজাড় করিয়া আসিতেছে ভালোবাসা, মধুর স্বরে বলিলেন, 'ওঠো বিষ্ণুপ্রিয়া, বলো তোমার কি প্রার্থনা।

স্নিগ্ধ উজ্জ্বল পদ্মাকোরক-সদৃশ দুই নয়ন প্রভুর মুখে মেলিয়া ধরিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া বলিলেন, প্রভু। আমাকে পাথেয় দাও তুমি জগৎ উদ্ধার করিবে কি কেবল বিষ্ণুপ্রিয়া ছাড়া, আমি কি এ জগতের নই?

প্রভুর দুই আয়ত চক্ষুও সজল হইয়া উঠিল বলিলেন, সাধ্বি। তোমাকে দেওয়ার মতো তো আমার কিছুই নাই, কি আমি তোমাকে দিব? শুধু এই দুইটি পাদুকা মাত্র আছে, ইহাই তুমি লও।'

স্বহস্তে পাদুকা খুলিয়া প্রভু যখন বিষ্ণুপ্রিয়ার হস্তে দিলেন তখন তাঁহার ভাবরসসিক্ত করুণ দুইটি আঁখির মধ্যে বিষ্ণুপ্রিয়া কি আপন আশ্রয় খুঁজিয়া পাইলেন না? সেই পাদুকা বক্ষে ধারণ করিয়া ফিরিয়া গেলেন বিষ্ণুপ্রিয়া, আপন মহিমায় উদ্ভাসিতা হইয়া।

গভীর রজনীর গোপন প্রহরে নিমাই যাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছিলেন, আজ প্রকাশ্য দিবালোকে, উন্মুক্ত রাজপথে, বিশ্বের দরবারে তাঁহাকেই আবার গ্রহণ করিলেন সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। বলিলেন, 'সাক্ষী থাকো সূর্য-চন্দ্র, সাক্ষী থাকো জগতের লোক, বিষ্ণুপ্রিয়া বা যে-কেহ যখনই আমাকে স্মরণ করিবেন, তখনই আমি তাঁহার কাছে উপস্থিত হইব, আমার দেহই থাকিবে দূরে, কিন্তু আমি থাকিব কাছে।'

ধীরে, নবদ্বীপ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন নবদ্বীপচন্দ্র, মূর্ছিতা জননী পড়িয়া রহিলেন রাজপথে। রাজপথ ভাসিয়া গেল জননী, জাহ্নবী ও ভক্তগণের অশ্রুধারায়!

'প্রভু আসিতেছেন' নীলাচলের পথে পথে সংবাদ রটিয়া গেল। বায়ু,

সার্বভৌম, গদাধর প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ অধীর বিস্ময়ে ছুটিয়া অগ্রসর হইলেন, এত শীঘ্র বৃন্দাবন বিজয় করিয়া প্রভু কেমন করিয়া ফিরিয়া আসিলেন আমাদের আনন্দ দান করিতে ?

প্রভু বলিলেন, 'না গো না, বৃন্দাবনে যাওয়ার সৌভাগ্য আমি এখনও লাভ করি নাই, মনে করিয়াছিলাম—

'বৃন্দাবনে যাব আমি গৌড়দেশ দিয়া।
নিজ মাতা আর গঙ্গার চরণ দেখিয়া ॥'
এত মনে করি কৈল গৌড়েরে গমন।
সহস্রেক সঙ্গে হইল নিজ ভক্তগণ ॥
লক্ষলক্ষ লোক আইসে কৌতুক দেখিতে।
লোকের সংঘট্টে পথ না পারি চলিতে ॥
যথা রহি তথা ঘর-প্রাচীর হয় চূর্ণ।
যথা নেত্র পড়ে তথা লোক দেখি পূর্ণ ॥

'এই ভাবেই রামকেলি গ্রামে গেলাম। রূপ-সনাতন সেখানে আমার সঙ্গে মিলিত হইলেন এবং গমনকালে সনাতন আমাকে এক প্রহেলী বলিয়া গেলেন ; আমি তখন তাহা ততটা অবধান করি নাই, কিন্তু পরদিন আমার মনে হইল, ছিঃ ছিঃ ! আমি এ কি করিতেছি, দুর্লভ তীর্থরাজ ব্রজধামে যাইতে হয় একাকী কিংবা সঙ্গে একজন, আর আমি যেন "বাদিয়ার বাজি পাতিয়া" সেখানে চলিলাম—

ধিক্ ধিক্ আপনাকে বলি হইলাঙ্ অস্থির।
নিবৃত্ত হইয়া পুনঃ আইলাঙ্ গঙ্গাতীর ॥

এইবার তোমরা সকলে মিলিয়া যুক্তি করিয়া প্রসন্নচিত্তে আমাকে বৃন্দাবনে যাইবার উপায় করিয়া দাও। গদাধরকে দুঃখ দিয়া গিয়াছিলাম, তাই আমার বৃন্দাবন যাওয়া ঘটিল না।' তখন গদাধর প্রভুর পায়ে ধরিয়া বলিলেন, 'ওগো প্রভু ! বৃন্দাবনে যাওয়ার তো তোমার প্রয়োজন হয় না, তুমি যেখানে থাকো, তাহাই তো বৃন্দাবন। তবুও লোকশিক্ষার জন্য, তুমি যাইবে, বর্ষার চারিমাস কাটিয়া যাক্ তারপরে যাইও।'

বর্ষার চারিমাস কাটিয়া গেল, যেন হারানিধি ফিরিয়া পাইয়া ভক্তগণ মহানন্দে প্রভুসঙ্গে এই চারিমাস কাটাইলেন।

এক শারদনিশীথের সুনীল আকাশে রজতশুভ্র জ্যোৎস্নাধারা বিস্তার করিয়া

চন্দ্র উদিত হইল এবং প্রভুর পুণ্য চিত্তাকাশে উদিত হইলেন বৃন্দাবনচন্দ্রের ফুল্ল মুখ. প্রভু বৃন্দাবন গমনের জন্য অধীর হইয়া উঠিলেন।

রায় ও সার্বভৌমের সঙ্গে নিভৃতযুক্তি করিয়া প্রভু বলিলেন, 'তোমরা প্রসন্নচিত্তে আমাকে অনুমতি দাও, আমি রাত্রে গোপনে নীলাচল হইতে যাত্রা করিয়া বনপথে বৃন্দাবন যাইব, তোমরা আমাকে বাধা দিও না।'

ভট্ট ও রায়ের সনির্বন্ধ অনুরোধেও প্রভু নিজ ভক্তগণ হইতে একজনকেও সঙ্গে নিতে সম্মত হইলেন না, একজনকে নিলে অপর জন দুঃখ পাইবেন। সরল স্নিগ্ধ মন যাঁহার তেমন যদি নূতন সঙ্গী কাহাকেও পাওয়া যায় তবে সঙ্গে লইবেন।

বলভদ্র ভট্টাচার্য নামে এক গৌড়ীয় ভক্তকে রায় ও ভট্ট নির্বাচন করিলে' প্রভু তাঁহাকে সঙ্গে লইতে আপত্তি করিলেন না।

রাত্রে জগন্নাথের আদেশ গ্রহণ করিয়া, শেষ রাত্রিতে প্রভু লুকাইয়া চলিলেন বৃন্দাবনের পথে। সকালে উঠিয়া কেহই আর প্রভুকে খুঁজিয়া পাইলেন না, এব স্বরূপ দামোদরও নিষেধ করিলেন খুঁজিতে।

রাজপথ, নগরপথ ত্যাগ করিয়া প্রভু ঝাড়িখণ্ডের অরণ্যপথ দিয়া যাত্রা করিলেন।

দুর্গম অরণ্যের ঘনবৃক্ষরাজিবেষ্টিত, হিংস্রশ্বাপদপরিপূর্ণ বিপদসঙ্কুল পথে চলিয়াছেন নির্ভয় আনন্দঘন মহাপ্রভু। দূর হইতে ভাসিয়া আসিতেছে ব্যাঘ্রগর্জন, সম্মুখে পশ্চাতে-পাশে আসিয়া দাঁড়াইতেছে মূর্তিমান কাল পশুরাজ সিংহ, ব্যাঘ্র, বন্যহস্তীযথ; প্রভু দুই স্নেহকোমল অভয়-বাহু বাড়াইয়া হিংস্রপশুর কণ্ঠালিঙ্গন করিয়া কানের কাছে মুখ নিয়া বলিতেছেন, 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ বল'। ভীতিবিহ্বল-চিত্তে পশ্চাতে চলিতেছেন বিপ্র বলভদ্র, কৃষ্ণনাম স্মরণ করিবার ক্ষমতাও লুপ্ত হইয়া গিয়াছে—এ কি ভয়ঙ্কর কাণ্ড, মুহূর্তে সংহার করিয়া ফেলিবে, এখনই শেষ হইয়া যাবে ভবলীলা; আতঙ্কে বলভদ্র কম্পিত হইতে লাগিলেন, কিন্তু কি অদ্ভুত! কি আশ্চর্য! পরমানন্দে, পরমস্নেহে প্রভুর হস্তপদ লেহন করিতে করিতে সঙ্গে চলিতেছে বনের ভীষণ হইতে ভীষণতর হিংস্রপশু, কণ্ঠে আনন্দধ্বনি, সুস্পষ্ট কৃষ্ণনাম। আজ পরমপ্রভুর দর্শন পাইয়া হিংসা কোথায় গিয়াছে লুকাইয়া, নির্ভয়ে, পাশাপাশি চলিতেছে ব্যাঘ্র-হরিণ, সিংহ-হস্তী, খাদ্য-খাদকের সম্পর্ক আজ নাই— আজ শুধুই অহিংসা, শুধুই আনন্দ।

বৃক্ষরাজি শাখা দুলাইয়া শীতল করিতেছে প্রভুর শ্রীঅঙ্গ, কৃষ্ণনামে রোমাঞ্চিত হইতেছে বৃক্ষের অঙ্গ, কুসুমস্তবকভারনম্রা লতিকা কোমল পরশ বুলাইয়া দিতেছে

প্রভুর বদনে, মাথায় ঝরিয়া পড়িতেছে পূজার অর্ঘ্য—মালতী, মল্লিকা, যূথিকা! পরমপুরুষের পূজা চলিয়াছে নীরবে, কৃষ্ণনামে সার্থক হইতেছে জীবন-জনম, স্থাবর-জঙ্গম, সকলকে নামরসে সঞ্জীবিত করিয়া প্রভু চলিয়াছেন পথে পথে! কোল, ভীল, বন্য অশিক্ষিত, অর্ধসভ্য, অসভ্য—সমস্ত পতিত জাতি উদ্ধারে বাহির হইয়াছেন পতিতপাবন, কেহ নাই, কিছুই যাহারা জানে না, তাহাদের জন্যই তো এই বনপথ-নির্বাচন, তাহাদের জন্যই এই অবতরণ—এই করুণার প্রকাশ।

বন দেখিলে বৃন্দাবন-ভ্রমে, পর্বত দেখিলে গিরি গোবর্ধন-ভ্রমে, প্রেমে মত্ত হইয়া প্রভু নৃত্যগীত করিতে থাকেন; বহু যত্নে, বহু স্নেহে, বলভদ্র প্রভুকে স্নান-ভোজন করান। গ্রাম হইতে লোক আসিয়া কোনও দিন ভিক্ষা দেন, যেদিন গ্রাম পথে পড়ে না, সেদিন বন্য শাকমূল রন্ধন করিয়াই বলভদ্র প্রভুর সেবা করান।.

বনপথে নির্ঝরের উষ্ণ, শীতল জলে প্রভু তিনবার স্নান করেন, অসহ্য শীতের হাত হইতে মাত্র কৌপীন-বহির্বাসে আচ্ছাদিত শীর্ণ তনুখানি রক্ষা করেন সূর্য ও অগ্নিতাপে

বন্যপ্রকৃতির নিরাবরণ শোভা ও সৌন্দর্যে প্রভুর আনন্দ যেন শতগুণে বাড়িয়া গেল, প্রকৃতির সহজ প্রাণস্পন্দনের সঙ্গে যেন কি গভীর নিবিড় ঐক্যের অনুভবে প্রভু আত্মহারা হইয়া গেলেন। বলভদ্রকে ডাকিয়া বলিলেন, 'বলভদ্র! বহু দেশ আমি ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু এই নির্জন অরণ্যযাত্রার মতো আনন্দ আমি কোথাও পাই নাই, কেবলই লক্ষ লক্ষ লোকের ভীড়ে যেন নিজেকে হারাইয়া ফেলিয়াছি, কৃষ্ণকৃপায় ও তোমার অনুগ্রহে এইবার এইপথে আসিলাম, তোমার প্রসাদে আমার সকল আশা সফল হইল।' প্রগাঢ় আনন্দে প্রভু বিপ্রকে আলিঙ্গন করিলেন।

প্রভুর চরণে পড়িয়া বিপ্র বলিলেন, 'প্রভু! আমি এক তুচ্ছাতিতুচ্ছ ভিক্ষুক, কৃপা করিয়া তুমি আমাকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছ, তোমার কৃপায় অনেক কিছু দর্শন করিবার সৌভাগ্য আমার হইল! তুমি অধম কাককে বিহঙ্গরাজ গরুড়ের সম্মান দিয়াছ, তুমি স্বতন্ত্র-ঈশ্বর, তাই অধমের প্রতি তোমার এই করুণা—

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্।

চলিতে চলিতে প্রভু বারাণসী আসিলেন। মনিকর্ণিকার ঘাটে স্নান করিতেছেন, চাহিয়া দেখেন অদূরে তপনমিশ্রও স্নান করিতেছেন। মিশ্রের বিস্মিত নয়নও প্রভুর প্রতি নিবদ্ধ হইল. ভাবিতে লাগিলেন—'ইনি কে? তপ্তকাঞ্চনবর্ণ, দীর্ঘ গৌরতনু একজনকে পূর্ববঙ্গে দেখিয়াছিলাম, যিনি আমাকে সাধ্য-সাধনতত্ত্ব

শিক্ষা দিয়াছিলেন, ইহাকে দেখিতেছি সেইরূপ ; শুনিয়াছি তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন—তবে ? তবে নয়, নিশ্চিতই তিনি।' মিশ্র দ্রুত গিয়া প্রভুর চরণে পতিত হইলেন, প্রভু তাঁহাকে উঠাইয়া আলিঙ্গন করিলেন। বিশ্বেশ্বর ও বিন্দুমাধব দর্শন করাইয়া মিশ্র স্বগৃহে প্রভুকে আনিয়া ভিক্ষা করাইলেন। বৈদ্য চন্দ্রশেখর প্রভুর আগমনবার্তা জানিয়া দ্রুত আসিলেন মিশ্রের গৃহে। প্রভুর চরণে পড়িয়া চন্দ্রশেখর রোদন করিতে লাগিলেন—'প্রভু। বড়ো কৃপা করিয়া নিজে আসিয়া উদয় হইলে এই বারাণসীতে। বড়ো কঠিন এ স্থান, কেবল "মায়া, ব্রহ্ম, ঈশ্বর মায়া"—ইহা ছাড়া আর কিছুই শুনিতে পাই না। তাই আমি আর মিশ্র কেবল তোমার চরণচিন্তা সার করিয়া পড়িয়া আছি। প্রভু তুমি বৃন্দাবন যাইবে শুনি, কিন্তু দয়া করিয়া কয়েকদিন এই স্থানে থাকিয়া আমাদের তৃষিত হৃদয়কে কৃষ্ণরসামৃতে সঞ্জীবিত করিয়া যাও, ইহাই আমাদের প্রার্থনা।'

ভক্তদ্বয়ের ইচ্ছায় প্রভু দশদিন সেখানে রহিলেন, মিশ্রের অনুরোধে অন্য কোথাও নিমন্ত্রণও গ্রহণ করিলেন না।

দেখিতে দেখিতে প্রভুর অলৌকিক রূপ, গুণ, ভাব ও প্রেম সম্বন্ধে লোক জানাজানি হইতে লাগিল, বাড়িতে লাগিল লোকসংঘট্ট। ব্রাহ্মণগণ আসিয়া প্রভুকে নিমন্ত্রণ করেন আর প্রভু বলেন, 'আজি মোর হয়েছে নিমন্ত্রণ' ; মিথ্যা নহে সত্যই মিশ্রের গৃহেই প্রতিদিনকার নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া লইয়াছেন প্রভু। তা বঞ্চনা হইলেও তাহা সত্য।'

এইমত প্রতিদিন করেন বঞ্চন,
সন্ন্যাসীর সঙ্গ ভয়ে না মানে নিমন্ত্রণ

জগদ্‌গুরু প্রকাশানন্দের কানেও আসিয়াছে প্রভুর কথা, কিন্তু অবজ্ঞায় তিনি রহিয়াছেন দূরে এবং আপন শিষ্যগণকেও সাবধানে রক্ষা করিতেছেন "ভাবক সন্ন্যাসীর "যাদুবিদ্যা" হইতে। অলৌকিক রূপ ও সৌন্দর্যের মোহন ফাঁদ পাতিয়া এই ভাবক দেশে দেশে ঘুরিয়া বেড়ায়, আর মূর্খ লোক রূপমুগ্ধ পতঙ্গের মতো সে ফাঁদে পড়িয়া ধ্বংস হয়! সন্ন্যাসধর্ম ত্যাগ করিয়া, বেদান্ত ভুলিয়া যে নৃত্যকীর্তন লইয়া মত্ত থাকে সেই চৈতন্যের ভাবকালি এই বারাণসীতে বিকাইবে না।

মহারাষ্ট্রীয় ভক্ত বিপ্র প্রভুকে একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন, 'প্রভু! শ্রীপাদ প্রকাশানন্দ আপনার নাম উচ্চারণ করিতে "চৈতন্য চৈতন্য" বলেন, কিন্তু একবার তো বলেন না "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য," ইহার কি কারণ ?'

প্রভু বলিলেন, 'যাঁহারা কৃষ্ণ-স্বরূপকে "মায়িক" বলেন, যাঁহারা ভক্তিলেশহীন মায়াবাদী তাঁহাদের মুখে কৃষ্ণনাম আসে না।'

'যাহা হোক, এইখানে আসিয়াছিলাম পশরা লইয়া বিক্রি করিব বলিয়া, কিন্তু—

গ্রাহক নাহি, না বিকায় লঞা যাব ঘরে,
ভারী বোঝা লঞা আইলাম কেমনে লইয়া যাব ?
অল্পস্বল্প মূল্য পাইলে—এথাই বেচিব।

তখনকার মতো প্রভু নিরস্ত হইলেন, বোঝা ভারীই রহিল, বৃন্দাবনে চলিলেন বলভদ্রকে লইয়া!

প্রয়াগে আসিয়া ত্রিবেণী-সঙ্গমে স্নান করিলেন, তিনদিন রহিলেন প্রয়াগে, নামপ্রেম বিতরণ করিয়া বহু লোক-সঙ্গে যাত্রা করিলেন মথুরার পথে।

পথে যেখানেই যমুনার দর্শন হয় অমনি ঝাঁপ দিয়া পড়েন, অচেতন দেহখানিকে সযত্নে রক্ষা করেন বলভদ্র ভট্ট! ক্রমে মথুরার প্রান্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, মথুরা দর্শনমাত্র অচিন্তনীয় প্রেমের প্রকাশ আরম্ভ হইল দেহে, কতক্ষণ পরে বাহ্যজ্ঞান পাইয়া বিশ্রামঘাটে স্নান করিয়া ভাবমগ্ন হইয়া বসিয়া আছেন, এক বিপ্র আসিয়া প্রভুর চরণ ধারণ করিয়া প্রেমে রোদন করিতে লাগিলেন, তাঁহার দেহেও অপূর্ব প্রেমের প্রকাশ দেখিয়া সুস্থ হইয়া প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি আর্য, সরল বৃদ্ধব্রাহ্মণ, তুমি কোথা হইতে এই অলৌকিক প্রেমধন লাভ করিলে?'

বিপ্র বলিলেন, 'শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী যখন ব্রজধামে আসিয়াছিলেন, তখন তিনি কৃপা করিয়া এই অধমকে শিষ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া আমার হাতেই ভিক্ষা গ্রহণ করিতেন।'

শুনিবামাত্র সসম্ভ্রমে প্রভু বলিলেন, 'বিপ্র! আপনি শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর কৃপাপ্রাপ্ত শিষ্য! তবে তো আপনি আমার গুরু, আমার প্রণম্য', বলিয়াই প্রভু বিপ্রের চরণ বন্দনা করিলেন!

অপরূপ লাবণ্যময় এই নবীন সন্ন্যাসীর অলৌকিক প্রেমের প্রকাশ এতক্ষণ দেখিয়াছেন বিপ্র, তাঁহার মনে হইয়াছে 'ইনি সাধারণ নহেন', তাই ভয় পাইয়া বিপ্র প্রভুর চরণে পতিত হইলেন, প্রভুর নিষেধ শুনিলেন না।

মাধবেন্দ্র পুরীজির সঙ্গে প্রভুর কোনও সম্বন্ধ আছে কিনা, জিজ্ঞাসা করিয়া যখন প্রভুর পরিচয় জানিতে পারিলেন, তখন বিপ্র আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তারপর প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বগৃহে লইয়া গেলেন, কিন্তু রন্ধন

করাইলেন বলভদ্র ভট্টকে দিয়া। প্রভু বলিলেন, 'ব্রাহ্মণ! পুরীজি আপনার হাতে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, আমাকেও আপনার হাতেই ভিক্ষা দিতে হইবে, পুরীজির ইহাই শিক্ষা, ইহাই নির্দেশ।'

সঙ্কুচিত বিপ্র বলিলেন, 'প্রভু! আমি 'সানৌড়িয়া' ব্রাহ্মণ, তোমাকে ভিক্ষা দেওয়ার মতো সুকৃতি আমার নাই, আমার হাতে তুমি ভিক্ষা গ্রহণ করিলে আমি ধন্য হইব, কিন্তু তাহাতে তোমাকে যে লোকে নিন্দা করিবে তাহা আমি সহিতে পারিব না।

প্রভু বলিলেন, 'হোক লোকনিন্দা, শ্রুতি, স্মৃতি, ঋষিগণ কেহই একমত নহেন, কাজেই 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ', আমার পরম গুরুর নির্দেশিত পথই অনুসরণীয় এবং সেই পথেই আমাকে চলিতে হইবে। প্রভু আনন্দিত বিপ্রের হাতেই ভিক্ষা গ্রহণ করিলেন।

মথুরামণ্ডলে স্থাবরজঙ্গম—মানুষ, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা সকলেই, কেন কে জানে পুলকিত হইয়া উঠিলেন। হারানো ধন বুঝি বহুদিন পরে ফিরিয়া আসিয়াছেন, লক্ষ লক্ষ লোক প্রভুকে দর্শন করিতে আসিতেছেন, মন বলিতেছে, 'এই তো সেই, কিন্তু কপট-ঠাকুরটির এ আবার কি অভিনব খেলা! কৃষ্ণবর্ণটি কোথায় লুকাইলেন? এ যে দেখি রাধারূপে ঢাকা, শুধু বদনে কৃষ্ণনাম 'কৃষ্ণবর্ণ'।

বিপ্রকে সঙ্গে লইয়া প্রভু যমুনার ঘাটে ঘাটে অবগাহন করিতেছেন, প্রতি শৈল, বন-উপবন, কুঞ্জ-বিতান, সমস্তই অপরিসীম আনন্দের সঙ্গে দর্শন করিতেছেন। কখনও বা নিজে প্রেমাবিষ্ট হইয়া পড়িতেছেন, কখনও বা প্রেমাবিষ্ট গাভী-বৎসর গায়ে সুশীতল স্পর্শ বুলাইয়া দিতেছেন পরম স্নেহে—গাভীগণ প্রভুকে চারিদিকে বেষ্টন করিয়া, কেহ অঙ্গে অঙ্গ লাগাইয়া রাখিয়াছে, কেহ লেহন করিতেছে প্রভুর অঙ্গ! কত যুগ-যুগান্তর কাটিয়া গিয়াছে। কিন্তু আজ যেন মরমে পশিতেছে সেই প্রাণমনোহর রাখালের মোহনীয়া বাঁশরীর সুর। মৃগমৃগী চলিয়াছে প্রভুর সঙ্গে সঙ্গে, পিক-কোকিল পঞ্চম স্বরে গান গাহিতেছে। শিখিগণ নৃত্য করিতেছে অপূর্ব ছন্দে। বৃক্ষরাজী পুলকাবলী ধারণ করিয়াছে, মঞ্জরিত শাখা দোলাইয়া প্রভুকে ব্যজন করিতেছে লতিকা—

প্রভু দেখি বৃন্দাবনের বৃক্ষলতাগণ।
অঙ্কুর পুলক মধু অশ্রু বরিষণ॥
ফুল-ফল ভরি ডাল পড়ে প্রভু-পায়।
বন্ধু দেখি বন্ধু যেন ভেট লঞা যায়॥

প্রতি বৃক্ষলতাকে বন্ধুর মতো প্রভুও আলিঙ্গন করিতেছেন। পূর্বস্মৃতির আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে অন্তর, মধু-মধুময় হইয়া উঠিতেছে ব্রজধাম, সমস্ত ভুবন !

চিন্ময় বৃন্দাবনে, কল্পবৃক্ষে শাশ্বত শুকসারী তাঁহাদের অনাদি, অনন্ত, আনন্দ-সুন্দরকে দেখিয়া উড়িয়া আসিয়া ডালে বসিল !

প্রভু শুকসারীর মুখে রাধাকৃষ্ণের বর্ণনা শ্রবণ করিতে লাগিলেন।

শুক বলিল—বংশীধারী জগন্নারীচিত্তহারী স শারিকে
বিহারী গোপনারীভির্জীয়ান্মদনমোহনঃ ॥

—শ্রীগোঃ লীলামৃত—১৩।৬

'জগন্নারীগণের মনোহারী, গোপাঙ্গনাগণ-বিহারী, বংশধারী সেই মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণের জয় হোক্।

শারী তখন পরিহাস করিয়া বলিলেন, 'ওগো শুক ! তোমার মদন মোহনের কথা আর বেশী বলিও না। যতক্ষণ আমার রাই কৃষ্ণের পাশে থাকেন ততক্ষণই তিনি মদনমোহন, নতুবা আমার রাধার জন্যই তিনি মদনমোহিত।'

রাধাসঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ।
অন্যথা বিশ্বমোহোঽপি স্বয়ং মদনমোহিত" : ॥ —শ্রী গোঃ লীঃ ৮।৩২

শ্রীরাধাকৃষ্ণমহিমাসূচক শ্লোক শুনিতে শুনিতে ক্রমেই প্রভুর ভাবান্তর হইতেছে, দেহাবেশ ক্রমেই লুপ্ত হইতেছে, আবার সম্মুখে চাহিয়া দেখেন নীলকণ্ঠ ময়ুর নৃত্য করিতেছে ; আর সংজ্ঞা রহিল না, ময়ূরের নীলকণ্ঠ দর্শনমাত্রেই কৃষ্ণস্মৃতি হইল, বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ভূমিতলে মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। বলভদ্র ভট্ট এবং বৃন্দাবনের সেই বিপ্র অধীর হইয়া উত্তরীয়ের অঞ্চল সিক্ত করিয়া প্রভুর ললাট সিক্ত করিতে লাগিলেন ; বস্ত্রাঞ্চলে বাতাস করিতে করিতে, কর্ণে কৃষ্ণনাম শুনাইতে শুনাইতে বহুক্ষণ পরে প্রভুর চেতনা ফিরিয়া আসিল, কিন্তু আবেশ দূর হইল না। কাঁদিতে কাঁদিতে কণ্টকাকীর্ণ, কঙ্করাস্তীর্ণ, ব্রজভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন, শ্রীমতীর কথা বুঝি মনে পড়িল ;—ঘনঘোর আঁধিয়ার, শাঙন বরিষণমুখর নিশীথে কণ্টকাকীর্ণ বৃন্দাবনের দুর্গম বনপথে অভিসারে যাইবেন শ্রীমতী, তাই অভ্যাস করিতেছেন—

কণ্টকগাড়ি কমল সম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি
গাগরি বারি ঢারি করি পীছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি ॥

মাধব ! তুয়া অভিসারক লাগি ।
দুতর (দুস্তর) পন্থ-গমন ধনি সাধয়ে
মন্দিরে যামিনী জাগি ।
করযুগে নয়ন মুন্দি (মুদিয়া) চলু ভামিনি,
তিমির পয়ানক আশে ।
করকঙ্কন পণ ফণিমুখ বন্ধন
শিখই ভুজগ-গুরু পাশে । —গোবিন্দ দাস

ব্রজে, ব্রজনাথের জন্য যত দুঃখ, যত বেদনা পাইয়াছিলেন শ্রীমতী, আজ মানসের শ্রীমতীর ভাবে, কান্তিতে আপনাকে গলিত, মথিত, নিমজ্জিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ আসিয়াছেন ব্রজে গৌররূপে ।

ব্রজের ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছেন গৌর, শ্রীমতীর মতোই কাঁদিয়া কাঁদিয়া ডাকিতেছেন, 'হে নাথ, হে রমণ, হে নয়নাভিরাম দয়িত আমার, হে দীননাথ, একবার দেখা দাও । এইরূপে কখনও চৈতন্য হারাইয়া, কখনও লুপ্তচৈতন্য ফিরিয়া পাইয়া প্রভু ক্রমে বৃন্দাবনের সমস্ত তীর্থ দর্শন করিতে করিতে আরিট গ্রামে আসিয়া যেন সহসাই পূর্ণ বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া পাইলেন । স্থানীয় লোকজনকে শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ডের কথা সুস্থ মানুষের মতোই জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন । কিন্তু কেহই সেই দুইটি কুণ্ডের নির্দেশ দিতে পারিলেন না । অকস্মাৎ কাছেই অল্প জলবিশিষ্ট দুইটি ধান্যক্ষেত্র দেখিতে পাইয়া প্রভু তাহারই সামান্য জলে স্নান করিয়া শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ডের স্তব করিতে লাগিলেন । বহুকাল-লুপ্ত কুণ্ড দুইটির প্রকাশ হইল, লোকে জানিল এই দুইটিই সেই সুবিখ্যাত শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড তীর্থ । কুণ্ডের মৃত্তিকা লইয়া প্রভু তিলক করিলেন ও সঙ্গে লইবার জন্য ভট্টাচার্যের কাছে কিছু মৃত্তিকা দিলেন ।

তারপরে আসিলেন গিরিগোবর্ধনে । গোবর্ধন-শৈলের একটি শিলাখণ্ডকে আলিঙ্গন করিয়া প্রেমে প্রভু নৃত্য করিতে লাগিলেন । রাত্রিতে মনে হইল 'গোবর্ধন গিরি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের দেহস্বরূপ, আমি কিরূপে তাঁহাতে আরোহণ করিব, এবং কিরূপেই বা আমার গোপাল দর্শন হইবে ?

পরদিন প্রাতে এক রব উঠিল, যবনেরা গোপালের গ্রাম আক্রমণ করিতে আসিতেছে, শুনিবামাত্রই গোপালের সেবক গোপালকে নীচে গাঠুলি গ্রামে লইয়া চলিয়া গেলেন । প্রভুর মনোবাসনা পূর্ণ হইল, তিন দিন ধরিয়া পরমানন্দে

গোপালের রূপসুধা পান করিলেন। তিন দিন পরে গোপাল ফিরিয়া গেলেন আপন উচ্চ মহিমময় মন্দিরে!

এইরূপে নন্দীশ্বর-তালবন, ভাণ্ডীরবন, খদিরবন, যমলার্জুনভঙ্গস্থান প্রভৃতি তীর্থ দর্শনান্তে আবার প্রভু মথুরা আসিলেন। সেইখানে লোকসংঘট্ট দেখিয়া অক্রূরতীর্থে গিয়া রহিলেন। অক্রূরতীর্থ হইতেই কালিয়হ্রদ, দ্বাদশ আদিত্যাদি দর্শন করিয়া রাসস্থলীতে আসিলেন। অপ্রাকৃত নবীন-মদন, শৃঙ্গার-রসরাজমূর্তি শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার হ্লাদিনী শক্তি শ্রীমতী রাধিকার মিলনক্ষেত্র এই রাসস্থলীতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন রসরাজ-মহাভাবস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

অক্রূরতীর্থেও ক্রমে প্রভুর দর্শনার্থীর সংখ্যা এত বাড়িতে লাগিল যে, স্বচ্ছন্দে নামকীর্তন করা প্রভুর পক্ষে অসম্ভব হইয়া পড়িল, সরিয়া গিয়া এক নির্জন স্থানে থাকিয়া নামকীর্তন করিতে লাগিলেন।

কৃষ্ণদাস নামক এক রাজপুত একদিন দূর হইতে প্রভুর রূপ দর্শন করিয়া যেন পূর্বদৃষ্ট এক মহাপুরুষের সঙ্গে মিলিত হইবার ব্যাকুলতায় দ্রুত ছুটিয়া আসিলেন, আসিয়াই লুণ্ঠিত হইলেন প্রভুর চরণে।

বিস্মিত প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কে? তোমার ঘর কোথায়?' কৃষ্ণদাস বলিলেন, 'আমি এক অধম রাজপুত জাতি, কাল রাত্রে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দর্শন করিয়াছিলাম, আজ তোমার দর্শনে আমার সেই স্বপ্ন সফল হইল, তুমি কৃপা করিয়া আমাকে গ্রহণ কর।' প্রভু তাঁহাকে কৃপা করিলেন।

বৃন্দাবনে প্রভুর আগমনে সত্যই কৃষ্ণের আবির্ভাব হইয়াছে, প্রকৃত আবির্ভাব কোথায় তাহা না জানিয়াই লোকে রটনা করিতে লাগিল, কালিয়দহে রোজ গভীর রাত্রিতে কালিয়নাগের বিশাল ফণার উপরে শ্রীকৃষ্ণ নৃত্য করেন এবং তাঁহার অঙ্গের রত্নালঙ্কার ঝলমল করিতে থাকে!

কালিয়দহের তীরে অগণিত লোকের ভীড়, কৃষ্ণদর্শনের আশায় সকলে ব্যাকুল। বলভদ্র ভট্টও একদিন সেই কৃষ্ণদর্শনের জন্য প্রভুর অনুমতি চাহিলেন, প্রভু সস্নেহে তাঁহাকে চাপড় মারিয়া বলিলেন, 'পণ্ডিত হইয়া মূর্খের মতো কথা বলিও না, কলিকালে শ্রীকৃষ্ণ এইরূপে দর্শন দেন না। আজ অপেক্ষা কর, কাল "কৃষ্ণ" দেখিতে যাইও।'

পরদিন কয়েকজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি আসিলে প্রভু তাঁহাদের কৃষ্ণদর্শন হইয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিলেন, 'রাত্রে দীপ জ্বালাইয়া কৈবর্তগণ নৌকায় উঠিয়া মৎস্য শিকার করে, সেই নৌকাকে কালিয়নাগ, কৈবর্তকে কৃষ্ণ ও দীপকেই

বস্ত্রালঙ্কার মনে করিয়া লোক ভ্রান্ত হইতেছে, কিন্তু আসল কৃষ্ণের সন্ধান তাহারা পায় নাই, সত্যই শ্রীকৃষ্ণ সম্প্রতি এই বৃন্দাবনে প্রকট হইয়াছেন।'

প্রভু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোথায় আপনারা কৃষ্ণদর্শন করিলেন?'

সসম্ভ্রমে ভক্তিবিগলিত চিত্তে তাঁহারা বলিলেন, 'এই যে, আমাদের সম্মুখে।'

প্রভু 'বিষ্ণু বিষ্ণু' উচ্চারণ করিয়া বলিলেন, 'ছিঃ ছিঃ, জীবাধমকে কৃষ্ণ বলিবেন না। ইহাতে সর্বনাশ হয়।'

তাঁহারা বলিলেন, 'ওগো, গোপনচারী। যতই লুকাও, মৃগমদগন্ধ কি বস্ত্রের বন্ধনে লুকাইয়া রাখিতে পারিবে? তোমার দর্শন দূরে থাকুক, তোমার নাম শ্রবণমাত্রই বৃন্দাবনের স্ত্রী পুরুষ, এমন কি পশু-পাখী, বৃক্ষ-লতা পর্যন্ত যে আনন্দে আকুল হইয়া উঠিয়াছে, তুমি কি তাহা দেখিতে পাও না? তুমিই গৌরবর্ণে আবৃত হইয়া শ্রীকৃষ্ণরূপ গোপন করিয়া আসিয়াছ বৃন্দাবনে পূর্ব-লীলাস্থল দর্শন করিতে।'

প্রভু চুপ করিলেন, ভক্তের কাছে নিজেকে আর লুকাইবার সাধ্য রহিল না, তাঁহাদের কৃপা করিলেন। বৃন্দাবনের লোক ক্রমশঃ প্রভুর প্রতি প্রবল এক আকর্ষণ অনুভব করিতে লাগিলেন, প্রতিদিন দশ-বিশটি নিমন্ত্রণ আসিতে লাগিল, অনুরোধ-উপরোধে বলভদ্র অস্থির হইয়া পড়িলেন, একটি মাত্র নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া অন্য সকলকে নিরাশ করিতে হয়, তাঁহাদের আর্তি ও ব্যাকুলতার কোনও প্রতিকার করিতে না পারিয়া ভট্ট নিরুপায় হইয়া পড়িলেন।

একদিন অক্রূরঘাটে গিয়া হঠাৎ প্রভু জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন, কৃষ্ণদাস কাছে ছিলেন, তাঁহার ও ভট্টের চেষ্টায় কোনও মতে প্রভুকে উঠানো হইল। বলভদ্র অধীর হইয়া উঠিলেন—প্রেমাবেশে কোন্ দিন, কোথায়, কোন্ গভীরে প্রভু ডুবিয়া যান, কে তাঁহাকে উঠাইবে? তাহা ছাড়া অবিশ্রান্ত লোকসংঘট্ট, নিমন্ত্রণের যন্ত্রণা; এইবার প্রভুকে বৃন্দাবন হইতে সরাইতেই হইবে।

প্রভুকে বৃন্দাবন-ত্যাগের কথা বলিবার সাহস হইল না, প্রয়াগে গিয়া মকর-স্নানের প্রার্থনা জানাইলেন ভট্ট, যেন ইহা তাঁহার বহুকালের সাধ। প্রভু করুণ-চিত্তে বলভদ্রের বাসনা পূর্ণ করিতে স্বীকৃত হইলেন।

অশ্রুসজল নয়নে প্রভু বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া চলিয়াছেন, সঙ্গে কৃষ্ণদাস, বলভদ্র আর দুইজন।

বৃন্দাবনের পথে কতকগুলি গাভী চরিতেছিল, দেখিয়াই গোবিন্দনন্দন মনে পড়িয়া গেল, আনন্দের আবেগে প্রভু উল্লসিত হইয়া উঠিলেন, এমন সময়েই এক রাখাল বালক বাঁশী বাজাইল, শোনামাত্রই প্রভু মূর্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন।

এই সময়ে কয়েকজন পাঠান অশ্বারোহী সৈনিক ঐ পথ দিয়া যাইতেছিলেন. তাঁহারা মূর্ছিত প্রভুকে দেখিয়া ভাবিলেন, 'নিশ্চয়ই এই অপরূপ সন্ন্যাসীর নিকটে সুবর্ণ ছিল এবং এই দুষ্ট 'গৌড়ীয়া বাটপার'গণ ধুতুরা খাওয়াইয়া তাঁহাকে অজ্ঞান করিয়া ঐ সুবর্ণ অপহরণ করিয়া লইয়াছে। পাঠানগণ বলভদ্র প্রভৃতিকে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া কঠোর শাস্তিদানের ভয় দেখাইতে লাগিলেন, ভয়ে কম্পিত 'গৌড়ীয়াগণে'র কণ্ঠ হইতে একটি কথাও বাহির হইল না। কিন্তু কৃষ্ণদাস রাজপুত, নির্ভীক, তিনি ক্রুদ্ধস্বরে পাঠানদের বলিলেন, 'ইনি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী, সুবর্ণ ইহার কাছে থাকে না, আমরা ইহার সঙ্গী, কোনও খবর না লইয়াই তোমরা এই সরল গৌড়ীয়দের কোনও ক্ষতি যদি কর তবে আমারও ক্ষমতা আছে, আমিও তোমাদের ছাড়িয়া দিব না। একটু অপেক্ষা করিলেই বুঝিতে পারিবে কি ভুল তোমরা করিয়াছ।'

ইতিমধ্যে চৈতন্যলাভ করিয়া প্রভু উঠিয়া বসিলেন, সসম্ভ্রমে পাঠানগণ বলিলেন, 'এই চারিজন "ঠক" তোমাকে অজ্ঞান করিয়া তোমার ধন অপহরণ করিয়াছে, তাই ইহাদের বাঁধিয়া রাখিয়াছি।'

প্রভু বলিলেন, 'না, ইহারা আমার সঙ্গী, আমার মৃগী ব্যাধি আছে, তাই সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া ইহারা আমাকে রক্ষা করেন।'

বন্ধনমুক্ত হইয়া গৌড়ীয়গণ নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

পাঠানদের মধ্যে একজন পরমধার্মিক পীর ছিলেন, প্রভুর প্রতি তাঁহার মনে পরম শ্রদ্ধার উদয় হইল এবং তিনি 'অদ্বয়বাদ ও নির্বিশেষ ব্রহ্ম' স্থাপন করিবার জন্য শাস্ত্রালোচনা আরম্ভ করিলেন! তাঁহারই শাস্ত্রবাক্যে প্রভু তাঁহার যুক্তি খণ্ডন করিয়া ষড়ৈশ্বর্যময় পূর্ণ ব্রহ্মবাদ স্থাপন করিলেন। ঈশ্বরের সঙ্গে মমত্বময় সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া তাঁহার সেবা লাভ করা এবং প্রেমময় ভগবানের প্রেম লাভ করাই জীবের সাধনা ও কাম্য, প্রভু ইহা প্রতিপন্ন করিলেন। প্রভুর বাক্যে পীরের অন্তর হইতে যেন একটি ব্যবধানের আড়াল ঘুচিয়া গেল, পরমপ্রেমময়ের প্রেমের এক নব অভ্যুদয় হইল অন্তরলোকে, পীর ধন্য হইয়া গেলেন। প্রভু তাঁহাকে নিবিড় আলিঙ্গনে বক্ষোলগ্ন করিলেন, নবজীবনে নূতন নামে তাঁহাকে অভিহিত করিলেন 'রামদাস'।

আর এক পাঠান, নাম বিজুলী খান—অল্প বয়স, সুন্দর রাজকুমার; তিনিই দলের অধিনায়ক! প্রভুর রূপ, লাবণ্য ও অমৃতনিঃস্যন্দী বাক্যে তাঁহার অন্তর যেন এক অজানা আনন্দরসে পূর্ণ হইয়া গেল, প্রভুর পদে আত্মসমর্পণের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল মন, প্রাণ! পরম স্নেহে, পরম প্রেমে আপন শ্রীচরণ দুইখানি প্রভু বিজুলী

খানের মস্তকে তুলিয়া ধরিলেন, মুহূর্তে যেন বিজুলী-প্রবাহ বহিয়া গেল বিজুলী খানের দেহে; দেহের অণুপরমাণু যেন ময়ূরের মতো নৃত্য করিতে লাগিল, সচ্চিদানন্দ-রসসাগরে নিমজ্জিত হইয়া গেলেন বিজুলী খান, নাম হইল পাঠান বৈষ্ণব।

প্রভুর ভুবনমোহন রূপ, মনোহর ভঙ্গী ও অমৃতময় বাক্য কঠোর পাঠানকেও রূপান্তরিত করিল; কৃষ্ণপ্রেমের সুধারসে সঞ্জীবিত হইয়া দ্রবীভূত হইলেন পীর সাহেব আর বিজুলী খান।

এমনই ঘটিয়াছিল নবদ্বীপে। রাজশক্তি ও রাজদণ্ডে পূর্ণ কাজীসাহেব নবদ্বীপে কীর্তন মানা করিয়াছেন। অত্যাচারের ভয়ে শ্রীবাসরাদি অন্তরঙ্গগণের মনেও ভয় ঢুকিয়াছে। তাই, ভয়হারী ভগবান ভক্তের ভয় ভাঙ্গাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন।

প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত চলিল আয়োজন। মৃদঙ্গ, করতাল, মন্দিরা, দেউটি, মশাল থরে থরে সজ্জিত হইল, সজ্জিত হইলেন সমগ্র নবদ্বীপের ভক্ত, সজ্জিত হইলেন প্রভু। মনোহরণ, ভুবনমোহন বেশে প্রভুকে সজ্জিত করিলেন গদাধর; চন্দনে চর্চিত, অলকাতিলকে মণ্ডিত, গন্ধমাল্যবিভূষিত সে গোরা তনু, কুঞ্চিত দীঘল কৃষ্ণকেশে আবৃত সে গোরা বদনের দিকে সমগ্র নগরীর নয়ন নিবদ্ধ হইয়া রহিল; অন্তরাল হইতে কান্তগৌরবে, কত না আনন্দে, মুগ্ধ নেত্রে চাহিয়া রহিলেন বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া।

সন্ধ্যা হইয়াছে, শতসহস্র দীপ জ্বলিয়া উঠিল, মশাল জ্বলিল কত, বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত করিয়া, মৃদঙ্গ-মন্দিরার সুগম্ভীর সুমধুর ধ্বনি করিতে করিতে, সহস্র সহস্র লোক সঙ্গে প্রভু যাত্রা করিলেন কাজীর গৃহের পথে। প্রভু গাহিতেছেন, 'তুঁয়া চরণে মন লাগহুঁরে সারঙ্গধর!', ভক্তগণ গাহিতেছেন, হরয়ে নমো, কৃষ্ণযাদবায় নমো। ...'

রাজপথের দুইপাশে প্রতীক্ষমাণ জনতা; প্রাসাদে, প্রাসাদের অলিন্দে শত শত পুরমহিলা; আনন্দে, মুগ্ধ বিবশ চিত্তে প্রভুর শিরে কেহ বা করিতেছেন লাজবর্ষণ, কেহ বা ফুল। ভক্তসঙ্গে মিশাইয়া যাইতেছে জনতা, পথে জনস্রোত!

প্রভু উপনীত হইলেন কাজীর গৃহে, কয়েক জন ভক্তও রহিলেন সঙ্গে। এদিকে বাহিরে, ক্ষিপ্ত দুর্দমনীয় নাগরিকগণ কাজীর পুষ্পোদ্যান, গৃহ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া দিতে লাগিলেন, অন্তরে প্রভুর ভরসা, কণ্ঠে গর্জন! 'কোথায় কাজী সাহেব! একবার বাহিরে এসো তো, দেখি কেমন করিয়া আমাদের ধর্মে তুমি বাধা দাও।' ভব্য,

সজ্জন ভক্তগণ সকলকে থামাইলেন। প্রভু বসিয়া আছেন কাজীর বহির্মহলে, কিন্তু কাজী সাহেব কোথায়? লক্ষ লক্ষ লোক দেখিয়া হয়তো বা দুশ্চিন্তায়, হয়তো বা ভয়ে তিনি গিয়া লুকাইয়া রহিলেন অন্দরমহলের নিভৃতে। প্রভু তাঁহাকে ডাকাইয়া আনিয়া কৌতুকহাস্যে বলিলেন, 'বেশ কাজী সাহেব! আমি আপনার গৃহে অতিথি হইলাম, আর আপনি গিয়া রহিলেন লুকাইয়া, সুন্দর অভ্যর্থনা!'

প্রভুর দিকে একটু বিক্ষিপ্ত, ভীত চোখে চাহিয়া দেখিলেন কাজী সাহেব, দেখিলেন সেখানে পরম শান্তি ও মাধুর্য, তাই আশ্বাস পাইলেন মনে, বলিলেন, 'নিমাই পণ্ডিত! গ্রামসম্পর্কে, তোমার নানার সম্পর্কে তুমি আমার ভাগিনেয়, আমি তোমার মাতুল—'

কথা শেষ হইল না, প্রভু যেন প্রচ্ছন্ন অভিমানের সুরে বলিলেন, 'তাই বুঝি মামা! ভাগিনেয়ের এই রকম সমাদর!'

লজ্জিত কাজী বলিলেন, 'নিমাই পণ্ডিত! তুমি এত লোক লইয়া, গর্জন, কোলাহল করিতে করিতে আসিতেছ কেন কে জানে? তাই দূরে থাকিয়া তোমাদের ভাব বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম।'

প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি কীর্তন মানা করিলেন কেন? আমরা কি রাজা অথবা রাজ্যের কোনও ক্ষতি করিতেছি? নাম কীর্তন ও শ্রবণে স্থাবর, জঙ্গম সকলেরই পরম কল্যাণ হয় বলিয়া আমাদের বিশ্বাস, আপনি তাহাতে বাধার সৃষ্টি করিতেছেন কেন?'

কাজী সাহেব বলিলেন,' শোন গৌরহরি, তোমাকে এই নামে অনেকেই ডাকেন, আমার মন-প্রাণ চাহিতেছে আমিও তোমাকে এই নামেই ডাকি, আমার অপরাধ নিও না তুমি। তোমারই স্বজাতি, তোমাদেরই সব বিশিষ্ট হিন্দুগণ আসিয়াই আমার কাছে অভিযোগ করিলেন, তুমি হিন্দুধর্মকে গলা টিপিয়া হত্যা করিতেছ, আপামর জনসাধারণকে নামে মত্ত করিয়া নাচাইতেছ, জাতিকুলের মান রাখো না, বিধিধর্ম, তন্ত্রমন্ত্র ত্যাগ করিয়া কণ্ঠ বিদীর্ণ করিয়া করিতেছ হরিনাম, কাজেই তোমার ঐ "স্বৈরাচার" বন্ধ করিবার জন্য তাঁহারাই তো আমাকে উত্যক্ত করিতেছিলেন রাত্রিদিন।'

প্রভু বলিলেন, 'তবে আমাকে বন্দী করিয়া কঠোর শাস্তি দিলেন না কেন, মামা?' কি যেন ভয়ঙ্কর এক চিত্র ভাসিয়া উঠিল চোখের সামনে, শিহরিত হইয়া কাজী বলিতে লাগিলেন, 'বাপরে বাপ! সে কি ভীষণ; কি দংষ্ট্রাকরাল তাহার মুখ, দুই হিংস্র চোখে কি জ্বলন্ত আগুন! এক সিংহাকৃতি নর গভীর রাত্রিতে

আমাব বুকে বসিয়া গর্জন কবিতেছে, "যদি কীর্তন বন্ধ কবিস, যদি গৌবহবিব কোনও ক্ষতি কবিস, তবে এই দেখ, ভীষণ, দীর্ঘ সূচ্যগ্র নখব মেলিয়া ধবিল সেই ভয়ঙ্কব জীব, 'এই নখে তোব বক্ষ বিদীর্ণ কবিযা আমি বক্তপান কবিব।" স্বপ্ন নয়, সত্য সত্যই এই কথা।" আমি আল্লাব নাম স্মবণ কবিযা সেই মহাভয়েব নিকটে মনে মনেই প্রতিজ্ঞা কবিলাম কিছুতেই আমি তোমাব ধর্ম, কর্মে বাধা দিব না।

তাবপবে আবও শোন, কি অদ্ভুত তোমাব শ্রীহবিনাম, যত চেষ্টা, যত নৈনিক, যাহা কেই পাঠাই কীর্তন বন্ধ কবিতে, সেই ফিবিয আসিযা হবি বলিযা নাচিতে থাকে। আমিও পাবি না, তাঁহাব ও পাবে না, তাহা দব ভিক্ষা কিছুতেই শাসন মানে না কেবলই হবি বলিতে থাকে।

গৌবহবি এইবাব পবমপ্রসন্ন দুই আযতনেত্র মেলিযা চাহিলেন কাজীব দিকে। আল্লা আব কৃষ্ণ একই বস্তু, যিনি সগুণ নিবাকাব তিনিই যে আবাব বসিকশেখব পবম মাধুর্যময় শ্রীকৃষ্ণ তাহা কাজীব হৃদযঙ্গম কবাইতে প্রভুব অধিককাল লাগিল না। শুদ্ধআধাব কাজীব সহজেই তিনি দবীভূত হইয়া গেলেন।

নবানন্দ এক মধুব আনন্দেব আবেশে কাজী বলিলেন, 'গৌব! আব আমি তোমাব কীর্তনে বাধা দিব না, আমি তো নহিই আমাব বংশেও কেহই যাহাতে কোনও কালেই বাধা না দেয়, তাহাই থাকিবে আমাব স্থাযী নির্দেশ।

প্রভুব দৃষ্টিতে প্রভুব কৃপায রূপান্তবিত হইল কাজীব জীবন ধর্মান্তবিত নয়। ঈশ্বব আল্লাব ভেদ গেল ঘুচিযা শাশ্বত আনন্দেব সন্ধান দিয়া আসিলেন প্রভু তাই তো হইল চবম পাওযা।*

পাঠান বৈষ্ণব বিজুলী খান ও পীব সাহেবও সেই পবমানন্দ ও পবমবসেব সন্ধান পাইলেন, স্বধর্ম ত্যাগ নয়, স্বধর্ম—স্বভাবধর্মও লাভ কবিযা কৃতার্থ হইলেন সেই সৌভাগ্যবান পাঠানদ্বয়।

কি সে ভবনভুলানো রূপ, কি সে মায়া, যাহাব প্রভাবে অলঙ্কাবেব লোভে চুবি কবিযা নিযাও আবাব কাঁধে কবিয়া চোবেবাই বাখিয়া যাইতে হইল শিশু নিমাইকে তাঁহাবই গৃহদ্বাবে, কেনই বা বিষ্ণুব জন্য আযোজিত নৈবেদ্য একাদশী তিথিতে

* সেই পরম ভক্ত কাজীর পুণ্য সমাধি আজও নবদ্বীপে বর্তমান বৈষ্ণব ভক্তগণ সেই পবিত্র তীর্থে আজও মাথা ঠেকাইয়া আসেন পরম ভক্তি ও শ্রদ্ধায়।

শিশু নিমাইয়ের সম্মুখে নিবেদন করিলেন প্রতিবেশী. তাহা, সে রূপ যে না দেখিয়াছে সে কেমন করিয়া বলিবে ?

চৈতন্যলীলার ব্যাসদেব শ্রীবৃন্দাবনদাস তাই-না কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিয়াছেন—

হৈল পাপিষ্ঠ জন্ম

না হৈল তখন।

'সেই তো জন্ম হইল, কিন্তু প্রভুর লীলা-দর্শন তো হইল না, একবার তো সেই শীতল, রাতুল চরণে মাথা লুটাইতে পারিলাম না, কেন বৃথা গেল পাপিষ্ঠের জীবন ?'

রূপ, রূপ! "একই অঙ্গে এত রূপ, নয়নে না ধরে"। একদিন এই রূপের পাথারে হিল্লোল তুলিয়া হাসিতে হাসিতে নবদ্বীপ-ভ্রমণে বাহির হইলেন প্রভু, সঙ্গে কয়েকজন অন্তরঙ্গ।

তন্তুবায়-পল্লীতে গেলেন, মুখে হাসি, চোখে কৌতুক, পরিধানে সূক্ষ্ম ধুতি, অঙ্গে সুন্দর উত্তরীয়, তাহারই ফাঁকে ফাঁকে গৌরকান্তি উঁকি দিতেছে। তন্তুবায়গণ কৃতার্থ, আহ্লাদিত হইয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। প্রভুর সম্মুখে সূক্ষ্ম, সুন্দর, শ্রেষ্ঠ শান্তিপুরী বস্ত্রভার স্তূপীকৃত হইল ; যুক্তকরে তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি চাই পণ্ডিত, কোনটি আপনার পছন্দ ?' বসিয়া বসিয়া ধীরে সুস্থে কতকগুলি ধুতি, শাড়ী (গৃহবাসিনী বন্ধুটির কথা বুঝি মনে পড়িল) নির্বাচন করিলেন, রাখিলেন একপাশে। ঐ সুন্দর দুই হস্তে সসম্ভ্রমে পশারী আপন দ্রব্যসম্ভার সাজাইয়া দিতে গেলেন। কৌতুকী প্রভু হাসিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'না আজ তো নিতে পারিব না ভাই, ভারী সুন্দর লাগিল কিনা, তাই পছন্দ করিয়া গেলাম. আজ যে হাতে কড়ি নাই, কি দিয়া কিনিব বলো !'

ব্যগ্র, ব্যাকুল স্বরে পশারী কহিলেন, 'না, না পণ্ডিত! এই আপনার পছন্দের জিনিস আমরা আর ফিরাইয়া নিব না, আপনার ঘরে পাঠাইয়া দিতেছি, দাম দিতে হয় পরে দিবেন, আর না দিলেও '—বলিয়া ঐ পরমমনোহর, উজ্জ্বল, সুন্দর মুখের দিকে তাকাইলেন. মনে হইল 'না দিলেও বঞ্চিত হইব না, ওগো সুন্দর তোমার কাছ হইতে কি পাইলাম জানি না, কিন্তু কড়ি চাওয়ার প্রয়োজনই যে গেল মিটিয়া !' বস্ত্রভার প্রভুর গৃহে প্রেরিত হইল।

তারপরে আসিলেন শঙ্খবণিকের গৃহে, প্রিয়াজীর জন্য শঙ্খও নির্বাচিত হইল কয়েক জোড়া ; সেখান হইতে গন্ধবণিক, মালাকার, এমনি করিয়া ঘুরিলেন সমস্ত বণিকপাড়া। তেমনই রূপের পশরা লইয়া গিয়া হাটের পশরা শূন্য করিয়া

আসিলেন, বিনামূল্যের দ্রব্যসম্ভারে পূর্ণ হইল প্রভুর গৃহ। কেহই প্রভুকে প্রত্যাহারে ফিরাইয়া দিতে পারিলেন না। সঙ্গীদের দিকে চাহিয়া প্রভু হাসিলেন, নিজের রচিতের গৌরবে নিজেই যেন মুগ্ধ হইয়া গেলেন। কিন্তু বিনামূল্যে কি গ্রহণ করেন ভগবান? প্রভু তাঁহাদের কি দিলেন, কেন মনোপূর্ণ করিয়া দিলেন উঁহাদের, তাহা জানিলেন তাঁহারাই, অন্তর উজাড় করিয়া যাহারা আপন শ্রেষ্ঠ ধন সমর্পণ করিয়া দিলেন সেই সুন্দর ব্রাহ্মণের দুই রাঙা করতলে।

আজও সেই বণিকগণের কৃতার্থ গৌরবান্বিত উত্তরাধিকারিগণ অশ্রুজলের অর্ঘ্য নিবেদন করেন সেই নদীয়াবিনোদের উদ্দেশে।

এইরূপে প্রেমধর্মে উত্তর ভারতের জনমানবকে দীক্ষিত করিয়া প্রভু প্রয়াগে আসিলেন। শ্রীরূপ ও অনুপম সংসার ত্যাগ করিয়া সেখানে আসিয়া প্রভুর চরণে আত্মসমর্পণ করিলেন। পণ্ডিত বল্লভ ভট্ট আসিয়াছেন, প্রভু শ্রীরূপ ও অনুপমকে ভট্টের সঙ্গে মিলিত করিলেন। দুই ভাই দীনাতিদীন, ভট্টের স্পর্শ হইতে নিজেদের দূরে সরাইয়া লইতেছেন, 'আমরা হীন, যবনসেবী, ভক্ত শুদ্ধাচারী, উচ্চকুলজাত ব্রাহ্মণের স্পর্শের অযোগ্য। প্রভুও বলিলেন, 'তুমি ইহাদের স্পর্শ করিও না। ভট্টের হৃদয়ে হয়তো বা কুল ও পাণ্ডিত্যের অভিমান ছিল, হয়তো বা ছিল না, রূপ-অনুপমকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া তিনি বলিলেন, 'যাঁহাদের মুখে প্রতিক্ষণে কৃষ্ণনাম নর্তন করিতেছেন, তাঁহারা হীন নহেন, সর্বোত্তম।

কৃষ্ণকথা কহিতে কহিতে প্রভু তরণীতে উঠিলেন, ভট্টের নিমন্ত্রণে ভট্টের গৃহে যাইবেন। যমুনার শ্যামচিক্কণ জল দেখিয়া আর ভাব সংবরণ করিতে পারিতেছেন না, অথচ সম্মুখে বল্লভ ভট্ট, অন্তরঙ্গ নহেন। বহু চেষ্টা করিয়াও আর ধৈর্য রক্ষা করা সম্ভব হইল না, যমুনায় ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। বহু কষ্টে তাঁহাকে নৌকায় তোলা হইল, কিন্তু ভাবাবেশে প্রভু উদ্দণ্ড নৃত্য করিতে লাগিলেন, নৌকা টলমল করিতেছে, ভয় ভয়ে কোনও ক্রমে পারে লইয়া নিরাপদে ভট্ট গৃহে পৌঁছিলেন।

শ্রীভট্টের ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া প্রভু বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় পরম বৈষ্ণব ত্রিবেণিস্থিত পণ্ডিত উপাধ্যায় প্রভু-দর্শনে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই প্রভুর চিত্ত উল্লসিত হইয়া উঠিল, বুঝিলেন তিনি প্রকৃত বৈষ্ণব, বলিলেন, উপাধ্যায়। আপনি কৃষ্ণের বর্ণনা করুন। উপাধ্যায় স্বরচিত এক শ্লোক পাঠ করিলেন—

কং প্রতি কথয়িতুমীশে,
সম্প্রতি কো বা প্রতীতিমায়াতু—

গোপতি তনয়াকুঞ্জে,
গোপবধূ বিটং ব্রহ্ম। —পদ্যাবল্যাম্

'যমুনাতীরে নিকুঞ্জবনে অল্পবয়স্কা গোপবধূ-সঙ্গে পরব্রহ্ম খেলা করিতেছেন এ কথা কাহাকেই বা বলিত পারি, কেই বা বিশ্বাস করিবেন ?'

প্রভু আনন্দে অধীর হইয়া বলিতে লাগিলেন 'কহ কহ'! উপাধ্যায় প্রভুর কর্ণে সুধাবর্ষণ করিতে লাগিলেন, তাঁহার মনে হইল স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকেই যেন তিনি নিজ লীলারস পান করাইতেছেন!

প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এই বিশ্বে শ্রেষ্ঠ কে ? শ্রেষ্ঠ মান কার ?'

'শ্যামমেব পরং রূপং, কহে উপাধ্যায়।'

'শ্যামরূপের কোন বাসস্থানটি শ্রেষ্ঠ ?'

'পুরী মধুপুরী।'

'বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোরের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোন অবস্থা ?'

'কৈশোর।'

'রসগণ মধ্যে ?—'

'আদ্য এবপরোরস!'

পরমানন্দে প্রভু, 'শ্যামমেব পরং রূপং, পুরী মধুপুরী বরা, বয়ং কৈশোরকং ধ্যেয়মাদ্য এবপরোরস! এই শ্লোক পড়িতে পড়িতে প্রভু উপাধ্যায়কে আলিঙ্গন করিলেন। কৃতকৃতার্থ হইয়া পণ্ডিত বিদায় গ্রহণ করিলেন। শ্রীরূপের হৃদয়ে রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব-নিরূপণের শক্তি সঞ্চার করিয়া, শিক্ষা দিয়া, প্রভু তাঁহাকে বৃন্দাবন যাওয়ার আদেশ দিলেন।

আসন্নবিচ্ছেদ-কাতর ভক্তবৃন্দ এবং শ্রীরূপকে প্রয়াগে রাখিয়া প্রভু যাত্রা করিলেন বারাণসীর পথে।

মহাপ্রভু-চরণে রূপ-সনাতন

মহাপ্রভু নবদ্বীপ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করার পর নীলাচলে আসিয়াছেন মায়ের আদেশে। জননী জন্মভূমি হইতে বেশী দূরে নয় নীলাচল, মাত্র বিংশতি দিবসের পথের ব্যবধান।

নীলাচলের দারুব্রহ্ম গোপালরূপেই দর্শন দান করেন প্রভুকে, কিন্তু তবুও প্রভুর মন পড়িয়া রহিয়াছে ব্রজধামে, কানে আসিতেছে বাঁশীর সুর। কৃষ্ণের রূপ-

গুণমাধুরী পানের আশায় দুই বৎসর পরে প্রভু চলিয়াছেন বৃন্দাবনের পথে। যে-রূপের এক কণামাত্র সমস্ত ত্রিভুবনের স্থাবর-জঙ্গম ও সর্বপ্রাণীকে আকর্ষণ করে, আনন্দসুধারসে স্নান করাইয়া আনন্দী করিয়া তোলে, সেই রূপমাধুর্যের নিত্যলীলা, নিত্যপ্রকাশ ঘটিতেছে ব্রজের কুঞ্জে কুঞ্জে, ব্রজবধূর বক্ষে, সেখানেই আছেন বৃন্দাবনধন ব্রজবল্লভ।

গৌড়ে জননী ও ভক্তমণ্ডলীকে দর্শন করিয়া অথবা দর্শন দান করিয়া প্রভু বৃন্দাবনের পথে চলিলেন, সঙ্গে অগণিত জনতা। চলিতে চলিতে প্রভু রামকেলি গ্রামে উপস্থিত হইলেন। গৌড়ের অধিপতি হুসেন শাহ এত লোক দেখিয়া কেশবছত্রীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে এই সন্ন্যাসী, ইহার সহিত এত লোক কেন?' কেশবছত্রী সত্য গোপন করিলেন, পাছে হিন্দু সন্ন্যাসীর কোনও লাঞ্ছনা ঘটে।

বলিলেন, 'ইনি সামান্য সন্ন্যাসী মাত্র—সঙ্গের লোকজনের কেহ কেহ ইহার শিষ্য আর দুইচারি জন দর্শনার্থী আসে যায়, বেশী লোক কোথায়?'

এই উত্তরে বাদশাহ সন্তুষ্ট হইলেন না। তিনি বিশ্বস্ত কর্মচারী দবীরখাসকে ডাকাইয়া আনিলেন—'সত্য কথা বল তো দবীরখাস? বিনা বেতনে, বিনা অন্নে অত লোক যাহাকে অনুসরণ করে, তিনি কে?'

দবীরখাস অর্থাৎ শ্রীরূপ বলিলেন 'বাদশাহ। আপনি শাহান্ শাহ্। সাম্রাজ্যের অধীশ্বর, নরাধিপ, সুতরাং বিষ্ণুর অংশ; আপনি নিজের মনের মধ্যে সত্যের কোনও আভাসই কি পান নাই? জগৎপতি ঈশ্বরই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম ধারণ করিয়া এই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন—ইনিই তিনি।'

গৌড়েশ্বর সহজেই তাহা মানিয়া লইলেন, তাঁহার অন্তরেও এমনি একটু ইঙ্গিতের আভাস পাওয়া যাইতেছিল। দবীরখাস—শ্রীরূপ, উচ্চ রাজকর্মচারী, আর সাকরমল্লিক—শ্রীসনাতন, রাজমন্ত্রী। পরম পণ্ডিত, পরম মানী দুই ভাই গোপনে গভীর নিশীথে প্রভুর দ্বারে দীনাতিদীনবেশে উপস্থিত হইলেন। দীর্ঘ দিনের গোপন মিলন-প্রতীক্ষা, দীর্ঘ দিনের দর্শনের আকাঙ্ক্ষা আজ সফল হইবে কি? বৃন্দাবনের ধন নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, এ কথা তাঁহারা শুনিয়াছেন; মন-প্রাণ সেই অবতার-পুরুষকে দর্শনের আশায় অধীর, ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছে। কতবার দৈন্য জানাইয়া পত্র পাঠাইয়াছেন প্রভুর পায়ে—'আমাদের ডাকিয়া লও, দেখাও তোমার কমলচরণ, ওগো দয়াল! দয়া কর, দয়া কর। তোমার দয়ায় আমাদের মলিন জীবন ধৌত কর।'

প্রভু দূর হইতে সাড়া দিয়াছেন—'ধৈর্য ধর, প্রতীক্ষা কর সেই নারীর মতো, যে বহুবিধ গৃহকর্মে ব্যস্ত থাকিয়াও পূর্বাস্বাদিত প্রিয়মিলনের সুখ মনে মনে আস্বাদন করে। ভগবানে একবার যাহার মন লাগিয়াছে সে সংসারের শত বন্ধনে থাকিলেও মনকে সেই আনন্দ-সুধারসাস্বাদনের সুখ হইতে ফিরাইয়া আনিতে পারে না। তোমাদের মনেও তো লাগিয়াছে প্রেমের ছোঁয়া, তাহা লইয়াই থাকো, সংসার হইতে চলিয়া আসিবার সময় এখনও হয় নাই।'

দুর্দিন আজ সুদিন হইয়াছে। দুই ভাই শ্রীনিত্যানন্দ ও হরিদাসের পায়ে পড়িলেন—'একবার সেই দেবদুর্লভকে দর্শন করাও গো তোমরা!'

নিত্যানন্দ দুইজনকে প্রভুর কাছে উপস্থিত করিলেন। গভীর রজনীর মধ্যযামে, বাহিরে অন্ধকারের মৌন স্তব্ধতা, আর গৃহের ভিতরে, "আলো যে আজ গান করে গো।" দীর্ঘ তপ্তকাঞ্চনবর্ণ সন্ন্যাসী বসিয়া, পায়ের কাছে শত শত ভক্ত।

দুই ভাই দীর্ঘ দণ্ডের মতো সেই প্রভুর পদতলে পড়িলেন—অশ্রুধারায় অভিষিক্ত হইতে লাগিল সেই দুটি পাদপদ্ম।

নিত্যানন্দ বলিলেন, 'প্রভু! দবীরখাস (রূপ) ও সাকরমল্লিক (সনাতন) তোমাকে প্রণাম করিতেছেন।' তাঁহাদের দৈন্যে প্রভুও যেন আপনাকে সংবরণ করিতে পারিলেন না, দুই ভাইকে হাতে ধরিয়া উঠাইলেন, বলিলেন, 'দৈন্য ছাড়, তোমাদের দৈন্যে ফাটে মোর মন, তোমরা দীন নও, আমার অন্তরের অন্তরঙ্গ তোমরা। শুধু তোমাদের দেখিবার জন্যই আমার এই রামকেলি গ্রামে আসা! তোমরা আজ হইতে সনাতন ও রূপ নামেই পরিচিত হইবে।' রূপ-সনাতনকে এইবার গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন প্রভু। ভগবানের পরমবক্ষে আশ্রয় লাভ করিলেন ভক্ত। ভক্ত কি হীন হইতে পারেন? তাঁহাকে লইয়াই তো ভগবানের পূর্ণতা!

ভক্তগণ আনন্দে হরিধ্বনি করিয়া উঠিলেন। কৃতকৃতার্থ হইয়া দুই ভাই উঠিলেন, জনে জনে সকল ভক্তের চরণ বন্দনা করিয়া যাওয়ার সময় বলিয়া গেলেন, 'বৃন্দাবন যাওয়ার এই রীতি নয়, তীর্থযাত্রার বিশেষতঃ বৃন্দাবনে—যেখানে শুদ্ধ ব্রজরস আস্বাদন করিবার জন্য প্রভু যাইতেছেন, সেখানে, এই লোকসংঘট্ট লইয়া গেলে কোনক্রমেই তাহা সুখকর হইবে না।'

প্রভু এ কথা বুঝিয়া বলিলেন—

একাকী যাইব, কিংবা সঙ্গে একজন,
তবে সে শোভয়ে বৃন্দাবনেতে গমন।

মহাপ্রভু আবার গৌড়পথে শান্তিপুর হইয়া, জননীকে প্রণাম করিয়া নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিলেন, শীঘ্রই একা বৃন্দাবনে যাইবেন বলিয়া।

শ্রীরূপ-সনাতন গৃহে অস্থিরচিত্তে দিনযাপন করিতেছেন, কবে প্রভুর কার্যে বাহির হইবেন, কবে পূর্ণাহুতি দিবেন নিজেদের! দর্শন-স্পর্শন হইয়াছে, কিন্তু ব্যাকুলতা তাহাতে বাড়িয়াছে শুধু; পাণ্ডিত্য, রাজমর্যাদা, ছাপ্পান্ন লক্ষ টাকার জমিদারি, মান যশ সব বিষের ন্যায় মনে হইতেছে। "রাজা মোরে প্রীতি করে, সে মোর বন্ধন।"

কি করিয়া সমস্ত বন্ধনের হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করিবেন সেই চিন্তাই সনাতন করিতে লাগিলেন রাত্রিদিন। গৃহত্যাগের অনুকূলে আরও কয়েকটি ঘটনা ঘটিয়া গেল।

কথিত আছে, ঘন বর্ষার এক গভীর দুর্যোগের রাত্রি। সমস্ত গৃহের দ্বার রুদ্ধ, বিশ্ব যেন কিসের আশঙ্কায় উৎকর্ণ হইয়া রহিয়াছে, বাহিরে প্রবল ধারাবর্ষণ, একটি জনপ্রাণী নাই। রাজ-প্রয়োজনে এই দুর্যোগের মধ্যেও রাজমন্ত্রী সনাতনকে বাহির হইতে হইল। এক ছোট্ট কুটীরের সম্মুখ দিয়া চলিয়াছে তাঁহার শিবিকা, জলে বাহকদের পদশব্দ হইতেছে। সেই কুটীরে থাকে দীনহীন সাধারণ দুইটি মানুষ, স্বামী-স্ত্রী। জলে পদশব্দ শুনিয়া স্ত্রী স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'এই ঘোর দুর্যোগে, গভীর রাত্রে, শৃগাল-কুকুরও যখন বাহির ছাড়িয়া, গর্তে গিয়া আশ্রয় লইয়াছে, তখন কে এই দুর্ভাগা মানুষ চলিয়াছে পথ বাহিয়া?' স্বামী বলিল, 'কে আর হইবে, নিশ্চয়ই কোনও রাজ-কর্মচারী!' সনাতনের অন্তর ধিক্কারে ভরিয়া উঠিল, 'বিষয়ী রাজ-কর্মচারী কি কুকুরেরও অধম?' মন বলিয়া উঠিল, 'ঠিক তাই।'

রূপেরও জীবনে পরিবর্তনের উপলক্ষরূপে ঘটিল আর একটি ঘটনা।

এক গভীর নিশীথে, গৃহে আরাম শয্যায় শায়িত রূপ, হঠাৎ যেন কিসে দংশন করিল, ভয়ে বেদনায় জাগিয়া উঠিলেন। পাশেই স্ত্রী ছিলেন, ডাকিলেন, 'আলো! আলো জ্বালাও শীগ্‌গির।'

অন্ধকারে স্ত্রী হাতড়াইয়া দীপাধার পাইলেন না, সম্মুখেই ছিল স্বামীর স্বর্ণ-খচিত মহামূল্য পরিচ্ছদ, তাহাতেই আগুন জ্বালাইয়া দিলেন, গৃহ আলোকিত হইল, দেখা গেল, সামান্য কীটের দংশন মাত্র, খুব তীব্র নয়। কিন্তু যাহার আলোকে গৃহ আলোকিত হইল, রূপ চাহিয়া দেখেন, তাহা তাহারই মহার্ঘ পরিচ্ছদ। স্ত্রীকে বলিলেন, 'কি সর্বনাশ করিলে তুমি, স্বামীর এই মূল্যবান পরিচ্ছদটি নষ্ট করিয়া ফেলিলে?' স্ত্রী বলিলেন, 'তোমার চেয়ে সোনা-মুক্তার দাম বেশী নয় আমার কাছে।'

বিস্মিত স্বামী বলিয়া উঠিলেন, 'ঠিক, ঠিক! আমার কাছে তো এর চেয়ে তাঁর দাম কম?' স্ত্রীর কাছ হইতে সদ্যোলব্ধ এই শিক্ষা মর্মে গিয়া আঘাত করিল, 'প্রিয়ের কাছে, স্বামীর কাছে ঐশ্বর্য তো কিছু নয়, তুচ্ছাতিতুচ্ছ!' গৃহত্যাগের সংকল্প দৃঢ়তর হইল, কিন্তু উপায় কি? রাজবন্ধন ছিন্ন করিবার জন্য মন্ত্রী সনাতন রাজ-দরবারে যাওয়া বন্ধ করিলেন। রাজা ডাকিলে খবর পাঠান, তিনি অসুস্থ। বাদশাহ রাজবৈদ্য পাঠাইলেন, তন্ন-তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া বৈদ্য সনাতনের দেহে কোনও রোগ নির্ণয় করিতে পারিলেন না, পারিবার কথাও নয়।

একদিন বিনা খবরে অকস্মাৎ স্বয়ং বাদশাহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন সনাতনের গৃহে, দেখেন সভায় বসিয়া ভাগবত আলোচনা করিতেছেন তাঁহার মন্ত্রী, যিনি তাঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ, যাঁহাকে ছাড়া তাঁহার রাজ্য চালানো এক প্রকার অসম্ভব। সনাতন সসম্ভ্রমে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বাদশাহের উপযুক্ত আসন দিয়া তাঁহাকে উপবেশন করিতে অনুরোধ করিলেন। বাদশাহ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি তোমার অভিপ্রায় সনাতন? অসুখের কথা বলিয়া গৃহে বসিয়া আছ, অথচ কোনও অসুখ নাই, ডাকিলেও দরবারে যাও না, খুলিয়া বলিবে কি?'

বিনীত সনাতন বলিলেন, 'মহারাজ! আর আমি আপনার কার্যভার বহন করিতে পারিব না, আমাকে মুক্তি দিন, আমি বৃন্দাবনে চলিয়া যাই।'

বাদশাহ বিস্মিত ও আহত হইলেন—'কেন সনাতন! তোমার এই বুদ্ধি হইল? আমি তো তোমাকে ছাড়িতে পারিব না, উড়িষ্যা জয় করিতে যাইতেছি, তুমি ছাড়া কে আর এত বড় সহায় আছে আমার?'

সনাতন দৃঢ়সংকল্প, তাই নির্ভয়, বলিলেন, 'আপনি দেবতা-ব্রাহ্মণকে দুঃখ দিতে যাইবেন, আমি তাহার ভাগী হইব না, আমাকে দয়া করুন।'

বাদশাহ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও বিচলিত হইলেন। কিন্তু অন্তরের অন্তরে সনাতনের জন্য যে স্নেহটুকু সঞ্চিত ছিল তাহাও তো কম নয়! তাই সেই স্নেহের বশে, ভবিষ্যতের আশায়, বাদশাহ সনাতনকে কারাগারে বন্দী করিয়া রাখিলেন, পাছে বা সনাতন চিরতরে চলিয়া যান।

বাদশাহ উড়িষ্যায় চলিয়া গেলেন। শ্রীরূপ এদিকে নিজেদের বহুমূল্য সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া অর্থাদিসহ দেশে গেলেন, পরিবার-পোষণের খরচ রাখিয়া দান-দক্ষিণা প্রভৃতি সমস্ত কর্তব্য সমাপ্ত করিয়া মহাপ্রভুর বৃন্দাবন গমনের প্রতীক্ষায় রহিলেন, সেইখানেই তিনি প্রভুর সঙ্গে মিলিবেন। দশ সহস্র মুদ্রা এক মুদীর কাছে রাখিয়া গেলেন, সনাতনের মুক্তিপণ।

প্রভু বৃন্দাবনে গেলেন, কিছুকাল থাকার পরে যখন ফিরিতেছেন তখন শ্রীরূপ কনিষ্ঠ অনুপমকে লইয়া প্রয়াগে গিয়া তাঁহার চরণে পতিত হইলেন। প্রভু তাঁহাদের দুই ভাইকেই অঙ্গীকার করিলেন।

প্রয়াগে দশাশ্বমেধ ঘাটে গিয়া রূপকে স্বয়ং শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন, প্রভু জগতে রাধাকৃষ্ণ-প্রেম প্রচার করাইবেন তাঁহাকে দিয়া, যোগ্য আধার তাই পূর্ণ করিয়া দিতে লাগিলেন।

বলিলেন, 'কোটি কোটি কৃষ্ণভক্তি-বিমুখ জীবের মধ্যে কেহ যদি সাধুসঙ্গ ও গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে কোনরূপে ভক্তিলতার বীজ পান, তবে তিনি মালী হইয়া সেই বীজ রোপণ করেন, শ্রবণকীর্তন-জল সিঞ্চন করিতে করিতে সেই লতা বৃদ্ধি পায়, কিন্তু যদি তাহাতে আবরণ না থাকে, তবে অপরাধ-হস্তী আসিয়া সে গাছ ছিঁড়িয়া নষ্ট করিয়া দেয়। আবার ভুক্তিমুক্তি-যশমান বাঞ্ছারূপ উপশাখার উদ্গম হইয়া যাহাতে শুদ্ধা অমলা ভক্তির সর্বনাশ না করে, সেদিকেও দৃষ্টি রাখিতে হয়। কখন যে এই সমস্ত উপশাখা বাড়িয়া যায়, মূল লতার গতি থাকে স্তব্ধ হইয়া। তাহা টেরও পাওয়া যায় না। তাই সকল দিকে সতর্ক থাকিয়া এই ভক্তি-লতাকে বাড়াইতে হয়, তবেই তাহা গোলোকে শ্রীকৃষ্ণ-চরণে পৌঁছায় এবং সেখান হইতে প্রেমফল পাকিয়া পড়িলে, তবে মালী আস্বাদয়।

অন্য সমস্ত বাসনা ত্যাগ করিয়া সর্ব ইন্দ্রিয় ও মন-প্রাণ দিয়া কৃষ্ণানুশীলন, ইহাই শুদ্ধা ভক্তি। সেই ভক্তি হইতে প্রেম, সেই প্রেমই গাঢ়তা প্রাপ্ত হইয়া ভাব, মহাভাব পর্যন্ত যুক্ত হয়। মধুর রসেই সকল রসের পূর্ণতা, ঐশ্বর্যজ্ঞানহীন কেবলা রতি ইহার ধর্ম, ইহাতে নিজের সুখ-কামনার এতটুকু স্থান নাই।

শ্রীরূপের কাছে দশ দিন ধরিয়া ভক্তিরসের সিদ্ধান্ত বর্ণনা করিয়া প্রভু রূপকে বিদায়ালিঙ্গন করিলেন। প্রভুর শক্তি রূপে সঞ্চারিত হইল।

একবার নীলাচলে আসিবার আদেশ দিয়া প্রভু রূপকে বৃন্দাবনে পাঠাইলেন। নিজে চলিয়া আসিলেন বারাণসী।

এদিকে সনাতন ক বারক্ষীকে সাত সহস্র মুদ্রা অর্পণ করিয়া তাহার সাহায্যে পলায়নের পথ করিয়া লইলেন। গঙ্গা পার হইয়া, পাতড়াপর্বত পার হইয়া হাজিপুরে উপস্থিত হইলেন, সেখানে থাকেন ভগ্নীপতি শ্রীকান্ত, রাজকর্মচারী, সুতরাং মানী লোক। শ্রীকান্ত সনাতনের দশা দেখিয়া 'হায় হায়' করিয়া উঠিলেন, বহু যত্নেও তাঁহাকে কাছে রাখিতে পারিলেন না, এমন কি জীর্ণ শ্রীহীন বস্ত্রটি পর্যন্ত

পরিবর্তন করিলেন না সনাতন। শ্রীকান্ত বহু দুঃখে অবশেষে একটি ভোটকম্বলই সনাতনের গায়ে জড়াইয়া দিলেন।

বারাণসীতে চন্দ্রশেখরের গৃহদ্বারে পরিক্লান্ত জীর্ণবেশ সনাতন আসিয়া বসিলেন, প্রভু গৃহের মধ্যে চন্দ্রশেখরকে বলিলেন, দ্বারে কে বৈষ্ণব আসিয়াছেন, তাঁহাকে আমার কাছে আনো। চন্দ্রশেখর বাহিরে আসিয়া দেখিয়া গিয়া বলিলেন, বৈষ্ণব নহে, এক দরবেশ দ্বারে বসিয়া। প্রভু বলিলেন, তাঁহাকেই আনো। গৃহে প্রবেশ করিলেন সনাতন, আপনাকে উজাড় করিয়া দিলেন প্রভুর পায়ে। প্রভু তাঁহাকে দৃঢ়রূপে হৃদয়ে ধরিবার জন্য ব্যাকুল, আর সনাতন ব্যগ্র প্রভুকে ধরা না দিতে, 'মোরে না ছুঁইহ আমি হীন'। প্রভু তবুও তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিলেন। তারপর? 'দুইজনে গলাগলি, রোদন অপার। দীর্ঘপথকষ্টে সনাতনের মলিন দেহ প্রভু স্বহস্তে মার্জন করিয়া দিলেন, সঙ্গে সঙ্গে কি সমস্ত মলিনতাই ধুইয়া গেল না সনাতনের?

শুচিস্নাত হইয়া সনাতন আসিয়া বসিলেন প্রভুর পায়ের নীচে, কিন্তু গায়ে সেই ভোটকম্বল, প্রভু তাঁহার 'পানে চাহে বার বার' সনাতন বুঝিলেন, ইহা 'প্রভুরে না ভায়'। এক গৌড়ীয়কে বহু অনুনয় করিয়া, আপনার মূল্যবান কম্বলখানি দিয়া তাহার ছিন্ন কন্থাটি লইয়া, গায়ে জড়াইয়া যখন প্রভুর কাছে আসিলেন, তখন প্রসন্নহাস্যে প্রভু বলিলেন, 'কৃষ্ণ দয়াময় বিষয়বিষ্ঠা হইতে তোমাকে উদ্ধার করিয়া আনিয়াছেন, তিনি আর তোমার এটুকু ভোগ রাখিবেন কেন?

এইবার সনাতনের শিক্ষা আরম্ভ হইল, সূত্রটি সনাতনই ধরাইয়া দিলেন। প্রভুকে তিনটি প্রশ্ন করিলেন তিনি। সনাতনের জিজ্ঞাসা সেই অনাদি অনন্ত জিজ্ঞাসারই প্রতিধ্বনি 'কে আমি?—অর্থাৎ আমার স্বরূপ কি? কোথা হইতে এই আমির উদ্ভব?

এই চির-রহস্যের জবাব দিলেন প্রভু—

'জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস,
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ।
'ঈশ্বরের শক্তি যৈছে জ্বলিত জ্বলন,
জীবের স্বরূপ তৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ।

এই অগ্নিশিখা, যাঁহা ভাহার ক্ষুদ্র এককণা, সৎ চিৎ ও আনন্দাংশে জীব ব্রহ্মের সহিত অভেদ, তবে ঈশ্বর স্রষ্টা জীব সৃষ্ট। ঈশ্বর মায়াধীশ, জীব মায়াবশ, তাই স্বরূপগত অভেদ হইলেও ঈশ্বর ও জীবে ভেদ। ইহাই অচিন্ত্য-

ভেদাভেদতত্ত্ব, দীর্ঘকাল ধরিয়া সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারে প্রভু জীবব্রহ্মের এই সম্বন্ধ স্থাপন করিলেন।

সনাতন দ্বিতীয় প্রশ্ন করিলেন, (আমি যদি স্বরূপতঃ ব্রহ্মই, তবে) 'মোরে কেন জাবে তাপত্রয়'। প্রভু বলিলেন, 'জীব আপনার নিত্যস্বরূপত্ব ভুলিয়া যখন ভোগের জন্য লালায়িত হইয়া উঠে, তখনই মায়া তাহাকে সংসারের কর্মের বন্ধনে ও দুঃখের আবর্তে ফেলিয়া দুঃখ দেয়।'

কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ,
অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ।
কভু স্বর্গে উঠায় কভু নরকে ডুবায়,
দণ্ড্য জনে রাজা যেন নরকে চুবায়।

মায়ার আবর্তে পড়িয়াই স্বরূপতঃ আনন্দময় জীব অশেষ দুঃখ পায়, তবুও স্বরূপের উপলব্ধি হয় না। জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস, ভগবদ্-দাসত্ব করাই জীবের পরম আনন্দ। জীব সেই আনন্দ ভুলিয়াছে বলিয়াই ত্রিতাপদহনে দগ্ধ হইতেছে।

সনাতন জিজ্ঞাসা করিলেন তৃতীয় প্রশ্ন, 'তবে কেমনে হিত হয়?' প্রভু উত্তর দিলেন :

'সাধু-শাস্ত্র-কৃপায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়,
সেই জীব নিস্তরে, মায়া তাহারে ছাড়য়।'
'দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥'

সাধুসঙ্গ ও শাস্ত্রজ্ঞানের ফলে বহির্মুখ জীব কৃষ্ণোন্মুখ হয়, তখন স্বয়ং কৃষ্ণই গুরুরূপে জীবকে তত্ত্বজ্ঞান দান করেন।'

জীব যদি শুধু শরণাগত হয়, যদি একবার মাত্র বলে, 'হে কৃষ্ণ! আমি তোমার', তবেই কৃষ্ণ তাহাকে গ্রহণ করেন।

জীবতত্ত্ব বলিতে বলিতে কৃষ্ণতত্ত্ব বলিতে লাগিলেন প্রভু। কৃষ্ণ অদ্বয়, জ্ঞানতত্ত্বস্বরূপ, সর্বাংশী, সর্বাশ্রয়, সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ পরমতত্ত্ব।

সনাতন রুদ্ধ নিঃশ্বাসে শুনিতেছেন, আর প্রভুর কণ্ঠ হইতে ঐশ্বর্যের কথা মূর্তিমতী বাণীরূপে বাহির হইয়া আসিতে লাগিল।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য কহিতে গিয়া প্রভুর মন কৃষ্ণমাধুর্য-বর্ণনার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিল। রাধারসে-জারিত-তনুমন গৌরাঙ্গসুন্দর কৃষ্ণের মদনমোহনরূপসাগরে ডুবিয়া যাইতে লাগিলেন।

কৃষ্ণের মধুর রূপ শুন সনাতন,
যে রূপের এককণ ডুবায় সর্ব ত্রিভুবন
সর্ব প্রাণী করে আকর্ষণ।

সেই রূপকমলে একবার যাহার নয়নভৃঙ্গ আকৃষ্ট হইয়াছে, তাহার কাছে ঐশ্বর্য ? সে যে কত তুচ্ছ তাহা জানো কি সনাতন ? তবে শোন তাঁহার রূপমাধুর্যের আকর্ষণের কথা ; এমনি তাহার মোহনিয়া শক্তি, পুরুষ-যোষিত-স্থাবরজঙ্গম তো দূরেরই কথা, তাহা পতিব্রতা সাধ্বী, সতী-লক্ষ্মীরও মন হরণ করে, এমনকি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণকে পর্যন্ত তাহা লুব্ধ করিয়া তোলে। সেই জন্যই তো নরলীলা—

কৃষ্ণের যতেক খেলা, সর্বোত্তম নরলীলা
নরবপু তাহার স্বরূপ
গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর
নরলীলার হয় অনুরূপ।

আনন্দঘন সেই কৃষ্ণ, তাঁহাকে পার্থিব প্রেমে, সকাম প্রেমে লাভ করা যায় না। বিহ্বল হইয়া প্রভু বলিতেছেন, 'সেই কৃষ্ণপ্রেম কি তোমার আমার হয় সনাতন ?' 'অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন জাম্বুনদ হেম, সেই প্রেম নৃলোকে না হয়।' দুইমাসে সনাতনের শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া প্রভু সনাতনকে বিদায় দিলেন। কিন্তু যাওয়ার আগে সনাতন ভালো করিয়াই জানিয়া গেলেন 'প্রভু বস্তুটি কি ?'

'রাজমন্ত্রী সনাতন, বুদ্ধ্যে বৃহস্পতি' ; জিজ্ঞাসা করিলেন, 'প্রভু কলিযুগে অবতার কে ?' প্রভু বলিলেন, ' "অবতার নাহি কহে, আমি অবতার", লক্ষণেই তাঁহাকে চিনিয়া লইতে হয়।' সনাতন বলিলেন, 'প্রভু পীতবর্ণ, কৃষ্ণনাম-উচ্চারী যে কলির অবতার, তিনি কে, সত্য করিয়া বলো, আমার সংশয় ঘুচিয়া যাউক।'

প্রভু বলিলেন, 'চাতুরালি ছাড়ো সনাতন।' সনাতন বুঝিলেন চাতুরালি কাহার। আনন্দিত, নিঃসংশয়িত সনাতন লুটাইয়া পড়িলেন কলিযুগের অবতারের পায়ে। সনাতন বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন, প্রভু নীলাচলের পথে।

* * *

ততদিনে গৌড়-বৃন্দাবন হইয়া শ্রীরূপ আসিয়া উপস্থিত হইলেন নীলাচলে ; নিজেকে সকলের পশ্চাতে, সকলের নীচে রাখিয়াই আনন্দ ; তাই উঠিলেন হরিদাসের কুটীরে, শ্রীহরিদাস যবন, আর রূপ যবনসেবী।

কিছুক্ষণ পরেই প্রভু যথানিয়মিত হরিদাসের কুটীরে উপস্থিত হইলেন। বিহ্বল হইয়া রূপ প্রভুর চরণে পতিত হইলেন, প্রভু প্রগাঢ় আলিঙ্গনে রূপকে হৃদয়ে

বন্ধ করিলেন। হরিদাসের কুটীরে আনন্দস্রোত বহিল, প্রভু প্রতিদিনই আসিয়া দুইজনের সঙ্গে কাটাইয়া যান বহুক্ষণ।

এক মধ্যাহ্নে রূপ হরিদাস-গৃহে নাই, প্রভু আসিয়াছেন, অকস্মাৎ গৃহের চালার নীচে একটি যেন ভূর্জপত্র দৃষ্টিতে পড়িল, কৌতূহলী হইয়া প্রভু তাহা খুলিয়া দেখেন এক অপূর্ব শ্লোক—

প্রিয়ঃ সোঽয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিতঃ
তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃখেলন্মধুরমুরলীপঞ্চমজুষে,
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি॥

'কুরুক্ষেত্রে শ্রীমতী রাধিকা কৃষ্ণের সঙ্গে সম্মিলিতা হইয়াছেন, সেই সঙ্গসুখই পাইতেছেন, তথাপি শ্রীকৃষ্ণ যে বিপিনে ক্রীড়া করিতে করিতে তাঁহাব মুরলীর মধুব পঞ্চম স্বর বাহির করিতেন, যমুনাপুলিনস্থ সেই বিপিনেব জন্যই রাধার মন ব্যাকুল হইতেছে।'—পড়িতে পড়িতে প্রভুব দীপ্ত বদনে আনন্দের জ্যোতি খেলিয়া যাইতে লাগিল। রূপ গৃহে আসিলেন, তাঁহাব গোপন চুবি ধরা পড়িয়াছে দেখিয়া যেন লজ্জায় অধোবদন হইয়া দাঁড়াইয়া বহিলেন। প্রভু আনন্দে বিহ্বল হইয়া রূপকে ধরিয়া বলিলেন, 'গূঢ় মোব হৃদয় তুঞি জানিলি কেমনে?' কিছুদিন আগে মাত্র রথযাত্রায় লক্ষ ভক্তের মধ্যে দাঁড়াইয়া রাধাভাব-বিভাবিত গৌরসুন্দর রথে অধিষ্ঠিত শ্যামসুন্দরের দিকে পদ্মনয়ন দুটি মেলিয়া ধবিয়া অশ্রুধারায় যে গোপন অর্ঘ্য পাঠাইয়াছিলেন, সে তো স্বরূপই শুনিয়াছিলেন শুধু! আর কেহ নয়। প্রভু তো স্পষ্ট করিয়া কিছুই বলেন নাই, শুধুই বলিয়াছেন অভিমানের একটি কথা, নায়কের প্রতি নায়িকার অভিমান—

যঃ কৌমারহরঃ স এব হি ববস্তা এব চৈত্রক্ষপাঃ
তে চোন্মীলিতমালতীসুরভয়ঃ প্রৌঢ়াঃ কদম্বানিলাঃ।
সা চৈবাস্মি তথাপি তত্র সুরতব্যাপারলীলাবিধৌ
বেবারোধসি বেতসী-তরুতলে চেতঃ সমুৎকণ্ঠতে॥

প্রভু বিস্মিত হইলেন, স্বরূপকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমার অন্তরের গোপন বার্তাটি রূপ কেমন করিয়া জানিলেন?'

স্বরূপ বলিলেন, 'বুঝিলাম, তুমি রূপকে কৃপা করিয়াছ'; প্রভু তখন প্রয়াগে রূপের দেহে-মনে তাঁহার শক্তিসঞ্চারের কথা স্বীকার করিলেন।

রথযাত্রায় লক্ষ লোকের মাঝে রূপও দাঁড়াইয়া দূর হইতে তৃষিত নয়নে

ধুলিলুণ্ঠিত প্রিয়তমের দিকে চাহিয়া আছেন, তাঁহার বিরহ-ব্যথার প্রত্যেকটি তীব্র প্রকাশে রূপের হৃদয় দীর্ণ-বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। তাই গৃহে আসিয়াই, যেন রাধারসজারিত তনুমন তাঁহার আরাধ্যের হইয়াই, তিনি এই শ্লোকটি রচনা করিলেন, লুকাইয়া রাখিলেন গৃহের কোণে। কিন্তু যাঁহার ধন তিনিই যখন তাহা হাতে করিয়া গ্রহণ করিলেন, তখন লজ্জার ছায়ার সঙ্গে গভীর আনন্দের আলোও কি রূপের মুখে খেলে নাই ?

শ্রীকৃষ্ণ-লীলা নাট্যাকারে লিখিবেন রূপ, বৃন্দাবনে ও পথেই দুটি চারিটি শ্লোক মনে মনে গাঁথিতেছিলেন, নীলাচলে আসার পথে সত্যভামাপুরে স্বপ্ন দেখিলেন, যেন অপূর্ব রূপের জ্যোতিতে দিঙ্মণ্ডল আলোকিত করিয়া অভিমানিনী সত্যভামা আসিয়া রূপকে বলিলেন, 'আমার নাটক তুমি পৃথক রচনা করিও।' রূপ চমৎকৃত হইলেন, কিন্তু ঠিক কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। নীলাচলে প্রভু একদিন নাটক সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসাবাদের পর বলিলেন, 'পুরলীলা ও ব্রজলীলার দুইটি পৃথক নাটক রচনা কর, "কৃষ্ণকে বাহির নাহি কর ব্রজ হৈতে"।' সত্যভামার আদেশের সঙ্গে প্রভুর প্রত্যক্ষ আদেশ মিলাইয়া লইয়া রূপ 'ললিতমাধব' ও 'বিদগ্ধমাধব' নাম দিয়া পৃথক নাটক রচনা আরম্ভ করিলেন। একদিন রূপ নাটক লিখিতেছেন, হঠাৎ প্রভু আসিয়া 'কাঁহা পুঁথি লেখ?' বলিয়া পুঁথির একটি পাতা টানিয়া লইলেন। রূপের অক্ষর দেখিয়াই প্রসন্নহাস্যে প্রভুর বদন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, 'রূপের অক্ষর যেন মুকুতার পাঁতি' আর সেই মুক্তার অক্ষরে লেখা যে শ্লোক, তাহা নয়নের সুখ, কর্ণের রসায়ন, আস্বাদ আনন্দ—

তুণ্ডে তাণ্ডবিনী রতিং বিতনুতে তুণ্ডাবলীলব্ধয়ে,
কর্ণক্রোড়কড়ম্বিনী ঘটয়তে কর্ণার্বুদেভ্যঃ স্পৃহাম্।
চেতঃ প্রাঙ্গণসঙ্গিনী বিজয়তে সর্বেন্দ্রিয়াণাং কৃতিং,
নো জানে জনিতা কিয়দ্ভিরমৃতৈঃ কৃষ্ণেতি বর্ণদ্বয়ী॥ :—বিদগ্ধমাধব

—'যাহা তুণ্ডাগ্রে (মুখস্থ জিহ্বাগ্রে) নৃত্য আরম্ভ করিয়া তুণ্ডাবলী লাভের জন্য রতি বিস্তার করে, যাহা কর্ণপথে অঙ্কুরিত হইয়াই অর্বুদসংখ্যক কর্ণেন্দ্রিয় লাভের ইচ্ছা উৎপাদন করে, এবং যাহা চিত্ত-প্রাঙ্গণের সঙ্গিনী হইয়াই সমস্ত ইন্দ্রিয়ব্যাপারকে রহিত করে, এতাদৃশ "কৃ" ও "ষ্ণ", অক্ষরদ্বয় যে কিরূপ অমৃতে রচিত হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না।' এই শ্লোক একা আস্বাদন করিয়া প্রভুর আনন্দ পূর্ণ হইল না, তিনি একদিন রায় রামানন্দ, সার্বভৌম, স্বরূপ প্রভৃতি পণ্ডিত রসজ্ঞ ভক্তদের লইয়া

রূপের নাটক শুনিতে আসিলেন। এত সুধীসজ্জন সমাগমে রূপ যেন আপনাকে কোথায় লুকাইবেন, স্থির করিতে পারিলেন না। কিন্তু প্রভুর আদেশ—'নাটক শোনাও রূপ।' রূপ বাধ্য হইয়াই মুখ খুলিলেন, পঠিত হইল 'তুণ্ডে তাণ্ডবিনী'র শ্লোক। রায়, সার্বভৌম, স্বরূপ স্তম্ভিত বিস্মিত হইয়া গেলেন—এত ভক্তি, এত মাধুর্য, এত কবিত্বের প্রকাশ প্রতি ছত্রে ছত্রে! শ্লোকের পর শ্লোক পড়িয়া চলিলেন রূপ—নান্দী, মঙ্গলাচরণ, স্থানপত্র-নির্বাচন। সমস্তই তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিলেন রায়, সমস্তই নিখুঁত অপূর্ব! প্রভু চাহিয়া দেখিতেছেন একবার বিদ্বদ্গুলীর প্রদীপ্ত মুখের দিকে, একবার রূপের কুণ্ঠিত মুখের দিকে; নিজের মুখে বাৎসল্য, আনন্দ ও কৌতুকের হাসিটি আছে লাগিয়া।

রায় বলিলেন, 'এবার ইষ্ট-বন্দনাটি পড় দেখি ভাই!' রূপ প্রভুর সম্মুখে সঙ্কোচে এবারে আরও ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন; প্রভু বলিলেন, 'বৈষ্ণবসমাজে গ্রন্থ শোনাও রূপ!'

একবার প্রভুর দিকে কুণ্ঠিত সলাজ দৃষ্টি মেলিয়া ধরিলেন রূপ; কিন্তু তার পরে পরিপ্লাব সুরে পড়িলেন, ইষ্টবন্দনার সেই অপূর্ব শ্লোক—

> অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণায়াবতীর্ণঃ কলৌ
> সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
> হরিঃপুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
> সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥ —বিদগ্ধমাধব

—'বহুকাল পর্যন্ত যাহা অর্পিত হয় নাই, উন্নত উজ্জ্বল রসময়ী নিজের সেই ভক্তি-সম্পত্তি দান করিবার নিমিত্ত যিনি করুণাবশতঃ কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়াছেন, স্বর্ণ হইতেও অতি সুন্দর দ্যুতিসমূহ দ্বারা সমুদ্ভাসিত সেই শচীনন্দন সর্বদা তোমাদের হৃদয়-কন্দরে স্ফুরিত হউক।'

প্রভু বলিয়া উঠিলেন, 'ইহা অতি স্তুতি, ভক্তগণ কৃতকৃতার্থ হইয়া শ্রীরূপকে বন্দনা করিলেন। সমস্ত কাব্যের মধ্যমণি-স্বরূপ এই শ্লোক ভক্তগণের হৃদয়ের ধন হইয়া রহিল।

এবার দ্বিতীয় নাটকের (ললিতমাধব) নান্দী, মঙ্গলাচরণ প্রভৃতিও ভক্তগণ শুনিতে চাহিলেন; রূপ সবই শুনাইলেন। রায় বলিলেন, 'দ্বিতীয় নান্দী কহ দেখি শুনি?' আবার বিপদে পড়িলেন রূপ। সম্মুখেই যে তিনি বসিয়া, যাঁহার বন্দনায় তাঁহার কাব্য মুখর! তবুও পড়িতেই হইবে, ভক্তের আদেশ, প্রভুর আদেশ! রূপ পড়িলেন—

নিজপ্রণয়িতাসুধামুদয়মাপ্নুবন্ যঃ ক্ষিতৌ
কিরত্যলমুরীকৃতদ্বিজকুলাধিরাজস্থিতিঃ।
স লুঞ্চিততমস্ততির্মম শচীসুতাখ্যঃ শশী
বশীকৃতজগন্মনাঃ কিমপি শর্ম্ম বিন্যস্যতু। —লঃ মাঃ ১।৪

'যিনি ক্ষিতিতলে উদিত হইয়া নিজ প্রেমসুধা বিতরণ করিতেছেন, যিনি দ্বিজকুলের অধিরাজ, যিনি জগতে অজ্ঞান-রূপ তমোরাশিকে নষ্ট করিয়াছেন, এবং সমস্ত জগতের মন যাঁহার বশীভূত, সেই শচীসুতাখ্যশশী অনির্ব্বচনীয় সুখ সম্পাদন করুন।'

প্রভু দুইটি ইষ্ট-বন্দনা শুনিয়া রুষ্ট হইলেন। বলিলেন, 'এ কি রূপ!'

'কাঁহা তোমার কৃষ্ণরস-কাব্যসুধাসিন্ধু।
তার মধ্যে কেনে মিথ্যা স্তুতি-ক্ষারবিন্দু?' —চৈঃ চঃ

পরমরসজ্ঞ পণ্ডিত রায় নির্ভীক, বলিলেন,

রূপের কবিত্ব অমৃতের পুর,
তার মধ্যে একবিন্দু দিয়াছে কর্পূর। —চৈঃ চঃ

প্রভু কহিলেন, 'ছিঃ ছিঃ রায়, ইহাতে তোমার উল্লাস? শুনিতেও লজ্জা, লোকে করে উপহাস।' রায় প্রভুর লজ্জায় এতটুকুও লজ্জিত হইলেন না, বলিলেন, 'প্রভু, তুমি ইহার কি বুঝ? লোকের উপহাস না আনন্দ, সে আমরাই বুঝিব ভালো।' শুধু রায় নহেন, সার্বভৌম, স্বরূপ, সকলেই রূপের পক্ষে, প্রভু নীরব হইলেন।

ভক্তগণ রূপকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। প্রভুও তাঁহাকে পরম অন্তরঙ্গরূপে বক্ষে টানিয়া লইলেন।

কয়েক মাস নীলাচলে বাস করার পর প্রভু রূপকে বিদায় দিলেন। প্রভুর চরণে মাথা লুটাইয়া পড়িলেন রূপ, চরণধূলি লইলেন সারাজীবনের পাথেয়। আর তো দেখা হয় নাই! তার পরে চলিয়া গেলেন ব্রজে, লুপ্ত তীর্থ ও প্রেম প্রকাশ করিতে। প্রভু বলিয়া দিলেন,

বৃন্দাবন যাহ তুমি, রহিও বৃন্দাবনে।
একবার ইহা পাঠাইহ সনাতনে॥ —চৈঃ চঃ

সনাতন

ঝারিখণ্ডের দীর্ঘ দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া নীলাচলে হরিদাসের কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন সনাতন। কিছুক্ষণ পরেই প্রভু আসিলেন, সনাতন প্রভুর পদতলে লুটাইয়া পড়িলেন।

তৃষিত হৃদয়ে প্রভু সনাতনকে আলিঙ্গন করেন, সনাতনের কণ্ডুর* ক্লেদ প্রভুর শ্রীঅঙ্গে লাগে, কোনও বাধা প্রভু মানেন না। সনাতনের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়, 'প্রভুর পায়ে লোক দেয় চন্দন অগুরু ফুল; আর আমি দিই আমার অঙ্গের পুতিগন্ধময় ক্লেদ!' সনাতন স্থির করিলেন, রথের চাকার নীচে প্রাণ বিসর্জন করিবেন; কি হইবে এই দেহ দিয়া, যাহা প্রভুর সেবায় লাগিবে না কোনও দিন?

গোপন সংকল্প মনের কোণেই রহিল; 'কেহ জানিবে না', ভাবিলেন সনাতন।

প্রভু আসিয়া ডাকিলেন, 'সনাতন! কেহ যদি কাহাকেও একটি জিনিস দান করে, সে কি তাহা আবার ফিরিয়া লয়, না কি লওয়াই তাহার উচিত?'

সনাতন জানেন না এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য কি, বলিলেন, 'না, না প্রভু! সে কি হয়?'

'তবে?'—করুণ ব্যাকুল স্বরে সনাতনের হাত দুইটি ধরিয়া প্রভু বলিলেন, 'আমাকে সমর্পিত তোমার এই দেহ তুমি ত্যাগ করিতে চাও কেমন করিয়া?'

সনাতন চমকিত হইলেন। প্রভু বলিলেন, 'সনাতন, দেহত্যাগে কৃষ্ণলাভ হয় না, তাই যদি হইত তবে এইক্ষণে আমি কোটি দেহ ত্যাগ করিতাম।

বিস্মিত হরিদাস-ঠাকুরের দিকে তাকাইয়া প্রভু বলিলেন, 'দেখ তো হরিদাস, কি অন্যায়, আমার জিনিস নষ্ট করিবার অধিকার ইঁহার কোথা হইতে হইল?'

প্রভু সনাতনের হাত দুইটি নিয়া নিজের মাথায় রাখিলেন, 'বলো সনাতন, আমাকে কথা দাও, কৃষ্ণসেবার এই দেহ তুমি কিছুতেই নষ্ট করিবে না? ভক্তের দেহ চিন্ময়, তাহাতে সতত কৃষ্ণের অধিষ্ঠান, পাছে তাহা ভুলিয়া যাই, পাছে ঘৃণা করি, তাই কৃষ্ণ তোমার দেহে এই কণ্ডু সৃষ্টি করিয়াছেন, আমার অহংকার চূর্ণ করিবার জন্যই কৃষ্ণ এই ছল পাতিয়াছেন।'

রথের চাকার নীচে প্রাণ ত্যাগ করা হইল না। সনাতন পণ্ডিত জগদানন্দের

---

* ঝারিখণ্ডের পথের বন্য ফলমূল আহারে এবং দূষিত জলপানে সনাতনের দেহে এই কণ্ডুর সৃষ্টি হইয়াছিল।

পরামর্শ চাহিলেন। জগদানন্দ প্রভুর সেবক, প্রভুর সুখেই তাঁহার সুখ। সনাতনের অঙ্গের ক্লেদ প্রভুর অঙ্গে লাগে ইহা পণ্ডিতের ভাল লাগে না, তাই সনাতনকে তিনি বৃন্দাবন ফিরিয়া যাওয়ার পরামর্শ দিলেন।

সন্তুষ্ট মনে সনাতন যখন প্রভুকে এই কথা নিবেদন করিলেন, প্রভু অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, ' "কালিকার বটুয়া জগা বয়সে নবীন", সে তোমার মতো মান্য পণ্ডিতকেও উপদেশ দিতে সাহস করে!'

সনাতন ক্ষুব্ধ হইলেন, বলিলেন, 'প্রভু! আজ বুঝিলাম জগদানন্দের সৌভাগ্যের সীমা নাই এবং আমার দুর্ভাগ্যের কথাও বুঝিলাম। জগদানন্দ তোমার অন্তরঙ্গ, তাই—

জগদানন্দে পিয়াও আত্মীয়তা সুধাধারে,
মোরে পিয়াও গৌরব-স্তুতি-নিম্ব-নিসিন্দা-সারে।'

প্রভু ধরা পড়িয়া লজ্জিত হইলেন, বলিলেন, 'না, না সনাতন, তুমি কখনই আমার পর নও; তুমিও আমারই, কিন্তু মর্যাদালঙ্ঘন আমি সহ্য করিতে পারিব না।'

সনাতনের আর তখন বৃন্দাবন যাওয়া হইল না।

জ্যৈষ্ঠ মাস। প্রখর রৌদ্রতপ্ত বেলাভূমির অগ্নিসম বালুকারাশির উপর দিয়া ছুটিয়া চলিয়াছেন সনাতন, প্রভুর আহ্বানে যমেশ্বর টোটায়। পায়ে ব্রণ হইয়াছে, অঙ্গে অসহ্য যন্ত্রণাময় কণ্ডু, মাথার উপর জ্বলন্ত সূর্য, কিন্তু সনাতনের ভ্রুক্ষেপ নাই, আসিয়া উপস্থিত হইলেন প্রভুর দরজায়। কিছুক্ষণ সুস্থ হইবাব অবকাশ দিয়া প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কোন্ পথে আসিলে সনাতন?'

—'সমুদ্রপথে।'

'কেন?' প্রভু বলিলেন, 'সিংহ-দরজার ছায়াশীতল পথ ছাড়িয়া তপ্ত বালুকাপথে কেন আসিলে?'

সসঙ্কোচে সনাতন কহিলেন, 'যে পথে ভক্তেরা চলেন, ঠাকুবেব সেবকেরা চলেন, সে পথে আমার মতো নীচের পদস্পর্শ লাগিবে কেমন করিয়া?'

প্রসন্ন আনন্দোজ্জ্বল মুখে প্রভু উঠিয়া গিয়া আলিঙ্গন কবিলেন সনাতনকে; বলিলেন, 'তুমি নীচ নও, তোমার দেহ অপবিত্র নয়, তবু যে তুমি ভক্তের মর্যাদা রক্ষা কব, সে কেবল তুমি ভক্তোত্তম বলিয়া।'

সনাতনের হৃদয় ভরিয়া উঠিল আনন্দসুধা-রসে, দেহ হইয়া উঠিল ক্লেদমুক্ত, সমুজ্জ্বল। বৎসরকাল সনাতনকে নিজের কাছে রাখিলেন প্রভু, তারপর বিদায় দিলেন, বৃন্দাবনে মদনমোহন যে প্রতীক্ষা করিতেছেন সনাতনের!

পরমধন সে পরশমণি যা চাবি তাই দিতে পারে,
কত মণি পড়ে আছে চিন্তামণির নাছদুয়ারে।

এই পরশমণির স্পর্শে সোনা হইয়া বৃন্দাবনে চলিলেন সনাতন, বৃন্দাবনের তরুলতা শাখা দোলাইয়া তাঁহাকে অভিনন্দিত করিল, কত ফুল ঝরিয়া পড়িল মাথায়। মদনমোহনের চোখেব স্নিগ্ধ প্রসন্ন আলো যেন দূর হইতেই ছুঁইয়া গেল সনাতনের ললাট।

যমুনাতীবে কুড়াইয়া-পাওয়া স্পর্শমণি গৌবচিন্তামণির জ্যোতির কাছে ম্লান, তুচ্ছাতিতুচ্ছ হইয়া গেল, অবহেলায় ফেলিয়া বাখিলেন বালুব মধ্যে, অক্লেশে দান কবিলেন ব্রাহ্মণ জীবনকে।

ব্রাহ্মণ বিস্মিত হইলেন, কী সেই পবমধন, যাহাব কাছে স্পর্শমণিও তুচ্ছ?

ধীবে ধীবে চিন্তিত ব্রাহ্মণ উঠিয়া গেলেন সনাতনেব কাছে, প্রার্থনা করিলেন—

'যে ধনে হইয়া ধনী মণিবে মান না মণি,
তাহাবি খানিক,
মাগি আমি নতশিবে।' এতবলি নদী-নীরে,
ফেলিল মাণিক।

ঐশ্বর্য এমনি করিয়াই বারে বারে তুচ্ছ হয়, বাবে বাবেই প্রেম তাহাকে এমনি করিয়াই লজ্জা দেয়।

বৃন্দাবনের এক অখ্যাত কুটিরে বসিয়া সনাতনেব আসার পথেব দিকে চাহিয়া ছিলেন বৃন্দাবনের মদনমোহন, কবে আসিবেন সনাতন, কবে মদনমোহন যাইবেন তাঁহার কাছে?

পিতৃমাতৃহীন দুরন্ত কালো ছেলেটিকে বড় বেশী ভালবাসেন সনাতন, এক মুহূর্ত ছাড়িয়া থাকিবার উপায় নাই। বহু দুঃখে, বহু সাধ্যসাধনায় ঘরের ছেলেকে পব করিয়া পরের ছেলেটিকে ঘরে আনিয়া বাখিয়াছেন সনাতন! আনিয়াছেন না নিজেই ধরা দিয়াছে ছেলে,—সাধ্যসাধনায় কি সে আসে?

বৃন্দাবনে মথুব চৌবে ও তাঁহাব পত্নী এতদিন যাহাকে পুত্রাধিক স্নেহে পালন করিলেন, তাঁহাদের ছাড়িয়া আসিতে এতটুকু কষ্ট হয় নাই ছেলের। ছেলের নাম মদনমোহন; সনাতন মাধুকরীতে যাইতেন, আব অপলক চোখে তাকাইয়া দেখিতেন, কালো ছেলের রূপের আলোয় চোখ ভরিয়া যাইত!

চৌবের স্ত্রীর বিধি-নিয়ম ছিল না, আচার ছিল না, ছিল শুধু অগাধ অপ্রাকৃত

মাতৃস্নেহ, বক্ষের পরমধনের সেবায় আবার আচার-নিয়ম কি? এই আচারবিহীন সেবা সনাতনের ভালো লাগে নাই; তিনি আচার শিক্ষা দিতে গেলেন; কিন্তু দেখিলেন সেই আচারবিহীন নিবেদিত অন্নই চৌবের সহিত একত্র বসিয়া ভোজন করিতেছেন তাঁহাদের বালগোপাল—মদনমোহন।

চৌবে-গৃহিণীকে স্তুতি করিয়া সেই মহাপ্রসাদ অঞ্জলি ভরিয়া লইয়া সনাতন মাথায় মাখিলেন। কিন্তু চৌবে-দম্পতির এত স্নেহ; এত প্রেম, কিছুই গোপালকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না, রাত্রে সনাতনকে স্বপ্নে দেখা দিয়া বলিলেন, 'আমাকে তুমি লইয়া যাও, শুধু জল-তুলসী দিয়াই সেবা করিও, আর কিছুই চাই না আমি!' চৌবের স্ত্রীর কাছে বায়না ধরিলেন—'আমাকে সনাতনের হাতে দিয়া দাও।'

পরদিন উজ্জ্বল মধুময় হইয়া সনাতনের প্রভাত উদিত হইল, কিন্তু চৌবে-গৃহিণীর দিগন্ত গভীর কালো অন্ধকারে আবৃত হইয়া গেল! সনাতন আসিলে চৌবে-পত্নী বলিলেন, 'লও, লও, গোঁসাই আমার জীবনসর্বস্ব ধনকে তুমিই লইয়া যাও! আমি তো জানি সে যাইবেই, তাহার যে এমনি স্বভাব! অভাগিনী যশোদা বুকের অমৃত দিয়া যাহাকে এত বড় করিলেন, যে নয়নের মণিকে না দেখিয়া তিনি একদিন বাঁচিয়া থাকিতে পারিতেন না, মুহূর্তে তাঁহারই বুকে শেল বিধাইয়া সে যখন চলিয়া যাইতে পারিল, তখন আমাকে ছাড়িয়া যাইবে, সে আর বেশী কথা কি? সে যায় যাক্, সহ্য করিতে না পারি, যমুনায় তো জলের অভাব নাই আমি ডুবিয়া মরিব।'

অঝোর-ঝরা অশ্রুধারায় অভিষিক্ত করিয়া গোপালকে আনিয়া মাতা সনাতনের হাতে দিলেন, হৃষ্ট-প্রফুল্ল মুখে চলিয়া গেলেন মদনমোহন। উচ্চৈঃস্বরে আর্তনাদ করিয়া অচেতন হইয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়িলেন মাতা; গোপাল ফিরিয়াও চাহিলেন না একবার।

এখন আসিয়াছেন সনাতনের গৃহে, কিন্তু কি আছে আজ তাঁহার? অতুল ঐশ্বর্যের অধিকারী আজ পথের ভিখারী। না চাহিতে যেটুকু পান সনাতন, তাহাই সযত্নে আনিয়া ধরেন ছেলের সম্মুখে; অবশেষটুকু গ্রহণ করেন নিজে।

আজ মিলিয়াছে শুধু দুইটি শুষ্ক রুটি, ছেলের সম্মুখে লবণবিহীন রুটি দুইখানি ধরিয়া দিয়া বসিয়া রহিলেন ধ্যানস্থ সনাতন।

'গোঁসাই! গোঁসাই গো! ও সনাতন!' অভিমানে রুদ্ধ কিশোর-কণ্ঠ ডাকিয়া উঠিল, 'দেখ তো, এই শুষ্ক দু'টী রুটি, একটু লবণ পর্যন্ত নাই, কেমন করিয়া খাই আমি?'

চমকিত হইয়া সনাতন চোখ খুলিলেন, 'আহা রে! ক্ষীরসরননী-খাওয়া কোমল মুখখানি ম্লান হইয়া গিয়াছে, শুষ্ক রুটি যেন গলায় আটকাইয়া যাইতেছে!' সনাতনের চোখে আসিল অশ্রু।—না, কাল হইতে একটুখানি শুধু লবণ ভিক্ষা করিয়া আনিয়া দিবেন তিনি।

রুটির সঙ্গে লবণ যুক্ত হইল। কিন্তু আবার আরম্ভ হইল ছেলের দৌবাত্ম্য. একটু ভাজা তরকারি ছাড়া শুধু নুন-রুটি আর কয়দিন খাওয়া যায়, সনাতন কি এইটুকু চেষ্টা করিতে পারেন না?

সনাতন রাগ করিলেন—'না বাপু! আজ তরকারি, কাল দুধ, পরশু ক্ষীর, কোথায় পাইব আমি? রাজভোগ খাইয়া তোমার অভ্যাস! তবে আসিয়াছ কেন দরিদ্রের ঘরে? পার তো নিজে যোগাড় করিয়া খাও।'

অভিমানে ঘা লাগিল ছেলের, 'যোগাড় কি আর করিতে পারি না? তুমিই তো ছাড়িয়া দাও না, ঘরে রাখিয়াছ বাঁধিয়া।'

উপযুক্ত ছেলে! ঘরের ভাত কেনই বা খাইবেন? রাজভোগের যোগাড় হইল। শেঠের লবণের নৌকা যমুনার চড়ায় তিনদিন যাবৎ ঠেকিয়া আছে, কত চেষ্টা, কত শ্রম, সবই ব্যর্থ, নৌকা চলে না। শেঠজী আসিয়া পড়িলেন সনাতনের পায়ে, 'উপায় বল গোঁসাই; দয়া কর!' সনাতন বলিলেন, 'উপায়ের আমি কি জানি? ঐ ঘরে আছেন মদনমোহন, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা কর, ঠিক উপায় বলিয়া দিবেন তিনি।'

শেঠজী দেখিলেন, কথা কন না, হাসিভরা উজ্জ্বল চোখে তাকাইয়া আছেন মদনমোহন, কালো ছেলে নয়, কালো পাথরের মূর্তি। লুটাইয়া পড়িলেন শেঠজী! 'আমাকে উদ্ধার কর এইবার, ফিরিবার পথে লাভের সমস্ত ধন দিয়া প্রতিষ্ঠা করিব তোমার মন্দির।'

নৌকা চলিল, ব্যবসাতে লাভ লইল প্রচুর। ফিরিবার পথে সমস্ত উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিলেন শেঠজী। ভোগ-আরতির ঘণ্টা বাজে, দুই বেলা রাজভোগ খান মদনমোহন, কিন্তু তবু কি যেন ফাঁক থাকিয়া যায়!

সম্মুখে নিবেদিত রাজভোগের থালা, দূরে বসিয়া সনাতন; আবার ডাকে ছেলে, 'ও সনাতন! ও বুড়ো?' 'কি, আবার কি?' বিরক্ত হইলেন সনাতন। কোমল দুইটি বাহু আসিয়া সনাতনের কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ধরিল, 'এই রাজভোগ ভাল লাগে না আমার! দাও না আমাকে দুটি তোমার সেই রুটি?'

হাসিয়া কাঁদিয়া সনাতন অস্থির হইলেন, 'হায় রে অবোধ! রাজভোগ ভাল লাগিল না তোমার, ভাল লাগিবে শুষ্ক রুটি?'

রঘুনাথ

আড়াই হাজার বৎসর পূর্বে ভিক্ষাপাত্র হাতে সিদ্ধার্থও একদিন চলিয়াছিলেন, ভারতের দ্বারে দ্বারে অপরিমেয় ঐশ্বর্য ও আরামের সর্ব আয়োজন তুচ্ছ করিয়া; আজ চলিয়াছেন দুর্গম পথের শত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, চৈতন্য-প্রেমে-পাগল রাজপুত্রসম রঘুনাথ। 'ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য, অপ্সরাসম স্ত্রী', কিছুই তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারিল না; বিশ দিনের পথ মাত্র বারো দিনে অতিক্রম করিয়া নীলাচলে প্রভুর পায়ে আসিয়া লুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন রঘুনাথ। অনশনক্লিষ্ট, পথকষ্টে শীর্ণ, কিন্তু প্রভুদর্শনে আনন্দোদ্ভাসিত এই তরুণের মুখের দিকে চাহিয়া স্নেহে করুণায় অভিভূত হইয়া গেলেন প্রভু। তাঁহারই জন্য গৃহত্যাগী রঘুনাথকে এইবার প্রভু বক্ষে তুলিয়া লইলেন। স্বরূপকে ডাকিয়া বলিলেন, 'স্বরূপ, আজ হইতে আমার "তিন রঘু"। ইহাকে আমি তোমার হাতে সমর্পণ করিলাম।' পরম স্নেহে ও আগ্রহে স্বরূপ গ্রহণ করিলেন রঘুনাথকে। প্রভুর অকথিত বাণীর অর্থ বুঝিলেন স্বরূপ, রঘুনাথ গৌরের, রঘুনাথের গৌর। কিন্তু দাস রঘুনাথ 'স্বরূপের রঘু' বলিয়াই পরিচিত হইলেন।

প্রভুর আদেশে গোবিন্দ রঘুনাথকে স্নান করাইয়া উত্তম প্রসাদ গ্রহণ করাইলেন। মাত্র ছয়দিন ঐ প্রসাদ গ্রহণ করিলেন রঘুনাথ, সপ্তম দিবসেই গিয়া সিংহদ্বারে দাঁড়াইলেন। পশারী অথবা মন্দির-দর্শনার্থী অপর কেহ বৈষ্ণব দেখিয়া যাহা দিতেন, তাহাই গৃহে লইয়া আহার করিতেন রঘুনাথ। গোবিন্দ প্রভুকে জানাইলেন, রঘুনাথ আর প্রসাদ গ্রহণ করেন না, সিংহদ্বারে গিয়া ভিক্ষার জন্য দাঁড়ান। প্রভু সন্তুষ্ট হইলেন, ঠিকই করিতেছে রঘুনাথ। বৈষ্ণব হইয়া যে জিহ্বার লালসাকে পুষ্ট করে সে বৈষ্ণব নহে, ইন্দ্রিয়পরায়ণ। ভিক্ষার অন্নই শুদ্ধ, বৈষ্ণবের গ্রাহ্য।

ভিক্ষার অন্নে পরমানন্দ লাভ করিলেন রঘুনাথ, বারো লক্ষ টাকা আয়ের জমিদারির ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী! বর্ধিষ্ণু নগর সপ্তগ্রামের অধিপতি দুই ভাই, হিরণ্যদাস ও গোবর্ধন; আর দুই ভাই-এর একমাত্র বংশধর রঘুনাথ! ইহাদের সঙ্গে পূর্বাশ্রমে প্রভুর পরিচয় ছিল। প্রভুকে না দেখিয়া, কেবলমাত্র তাঁহার কথাই

শুনিয়াই রঘুনাথ প্রভুর প্রেমে মগ্ন হইয়াছিলেন। শৈশবে হরিদাস-ঠাকুরের সঙ্গলাভ করিয়াছিলেন কিছুদিন, গৌরপ্রেম তাহাতে আরও বর্ধিত হইয়াছিল।

সন্ন্যাস লওয়ার পর শ্রীনিত্যানন্দের ছলনায় প্রভু যখন বৃন্দাবন-ভ্রমে শান্তিপুর আসিয়া অদ্বৈত আচার্যের গৃহে উপস্থিত হইলেন, তখন বহু সাধ্যসাধনায় পিতা ও জ্যেষ্ঠতাতের অনুমতি লইয়া রঘুনাথ প্রভুদর্শনে আসিলেন। সেই নবারুণ-বহির্বাসধারী স্বর্ণোজ্জলকান্তি দর্শনমাত্র রঘুনাথ দেহ-মন-প্রাণ প্রভুকে সমর্পণ করিলেন। প্রভু নীলাচলের পথে যাত্রা করিলে রঘুনাথও আপন গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু পিতামাতা দেখিলেন, রঘুনাথের পদদ্বয় তাঁহার দেহটিকে বহন করিয়া আনিয়াছে শুধু, রঘুনাথকে নয়।

সংসারে অনাসক্তি ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। পিতা ও জ্যেষ্ঠতাতের চিত্ত বিচলিত হইল, সুন্দরী লক্ষ্মীশ্রী-যুক্তা এক কন্যার সহিত বিবাহ দিলেন, যদি রঘুনাথের মনের কিছু পরিবর্তন হয়। কিন্তু কিছুই হইল না, রঘুনাথ বার বার গৃহত্যাগ করিয়া পলায়নের চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং প্রতিবারেই ফিরিয়া আসিতে বাধ্য হইলেন। প্রহরীর উপরে প্রহরীর সংখ্যা বাড়িয়াই চলিল, মাতা ললাটে করাঘাত করিয়া বলিলেন, 'বাঁধিয়া রাখ।' সকরুণ হাসি হাসিয়া পিতা বলিলেন, ' "ইন্দ্রসম ঐশ্বর্য, অপ্সরাসম স্ত্রী" যাহার মন বাঁধিতে পারিল না, সেই চৈতন্যের বাতুলকে তুচ্ছ দড়ির বাঁধনে কি করিবে ?'

মহাপ্রভু সন্ন্যাসের পাঁচ বৎসর পরে বৃন্দাবন যাইবেন বলিয়া গৌড়ে একবার দর্শন দিয়া গেলেন, কিন্তু কানাইয়ের নাটশালা পর্যন্ত গিয়া যখন বৃন্দাবন না গিয়াই প্রত্যাবর্তনের পথে শান্তিপুরে আসিলেন, তখন বহু অনুনয়ে জ্যেষ্ঠতাত ও পিতার অনুমতি লইয়া রঘুনাথও শান্তিপুরে আসিলেন। গৃহত্যাগের গোপন সংকল্পের কথা প্রভুকে জানাইলে প্রভু বলিলেন—

স্থির হঞা ঘরে যাহ না হও বাতুল,
ক্রমে ক্রমে পায় লোকে ভবসিন্ধুকূল,
মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া,
যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হইয়া।

মহাপ্রভুর আদেশ লইয়া গৃহে ফিরিলেন রঘুনাথ, শান্ত সমাহিত চিত্তে। সংসারের সর্বব্যাপারে পুনরায় যোগ দিলেন, যথাকর্তব্য সুন্দররূপে নির্বাহ করিতে লাগিলেন। পিতা-মাতার মনে আশার সঞ্চার হইল, পুত্র কি তবে গৃহে থাকিবে ?

কিছুকাল পরে শ্রীনিত্যানন্দ পানিহাটি গ্রামে আসিয়া হরিনাম, গৌরনাম প্রচার করিতে লাগিলেন। তখন একদিন রঘুনাথ গিয়া দয়াল নিতাইচাঁদের পায়ে পড়িলেন, নিতাইয়ের কৃপা না হইলে গৌর-চরণ লাভ করা সুকঠিন। নিত্যানন্দ রঘুনাথকে বক্ষে ধারণ করিলেন, বলিলেন, 'চোর! তুমি বারবার পলাইয়া যাও, আজ ধরা পড়িয়াছ, তোমাকে দণ্ড দিতে হইবে।' দণ্ডাজ্ঞা শুনিয়া রঘুনাথ আনন্দে আকুল হইলেন, সকল বৈষ্ণবকে 'চিড়াদধি' ভোজন করাইবে, ইহাই নিত্যানন্দ প্রভুর আদেশ।

'রাজপুত্র' রঘুনাথ পলকের মধ্যে সর্ব ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করিয়া দিলেন, ভারে ভারে খাদ্যদ্রব্যা।দ আসিতে লাগিল। পরমমঙ্গলময় নাম-সঙ্কীর্তনের পরে। সারি দিয়া সহস্র বৈষ্ণব ভক্ত ও গ্রামের লোক ভোজনে বসিলেন। মধ্যস্থলে শ্রীনিত্যানন্দ ও পার্শ্বে রক্ষিত মহাপ্রভুর জন্য আসন। নিত্যানন্দ ধ্যানে বসিলেন, গৌর ছাড়া এই উৎসবের প্রাণদান করিবেন কে?

ধ্যানভঙ্গে পরমোৎফুল্ল নিত্যানন্দকে দেখিয়া ভক্তেরা বুঝিলেন, মহাপ্রভুর আবির্ভাব হইয়াছে। হরিধ্বনি করিয়া তাঁহারা আহার আরম্ভ করিলেন; রঘুনাথ সকলকে যথ।যোগ্য দক্ষিণা দিয়া তুষ্ট করিলেন, প্রভুদ্বয়ের অবশেষ পাত্র তাঁহাকে দেওয়া হইল।

রাত্রিতে রাঘব পণ্ডিতের মাধ্যমে আপন অভিলাষ ব্যক্ত কবিলেন রঘুনাথ। নিতাইচাঁদ তাঁহাকে ডাকিয়া আনিয়া, তাঁহার মাথায় অজস্র আশিসধারা বর্ষণ করিয়া বলিলেন, 'প্রভু তো তোমাকে আজ অঙ্গীকার করিয়াছেন, আর ভয় নাই, আর কোনও বাধা নাই, অচিরাৎ কৃষ্ণ তোমায় উদ্ধার করিবেন।'

আবার গৃহে ফিরিলেন রঘু, উন্মাদ, অশান্ত। অন্দরে যান না, বাহিরে শয়ন করিয়া থাকেন। চোখের জলে বুক ভাসাইলেন মাতা, পিতা করিলেন কড়া পাহারার ব্যবস্থা। কিন্তু প্রভুর বাক্য সফল হইল এবার। প্রভু বলিয়াছিলেন, গৃহত্যাগের সময় হইলে কৃষ্ণই কোনও ছলে তোমাকে বাহির করিবেন। সেই সুযোগই উপস্থিত হইল, গুরুর কার্য করিবার ছলে একাকী বাহির হইবার অনুমতি লাভ করিলেন। রঘুনাথ উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিলেন নীলাচলের পথে। দ্বাদশ দিন পথে কাটিল—মাত্র তিন দিন বুঝি আহার জুটিয়াছিল, রঘুনাথ নীলাচলে পৌঁছিলেন।

বহু খোঁজ করিয়াও পিতা রঘুনাথের কোন খবর পাইলেন না। চার পাঁচ মাস পরে শ্রীশিবানন্দ সেন ও গৌড়ীয় ভক্তগণ প্রভুর দর্শনান্তে নীলাচল হইতে ফিরিয়া আসিলে খবর পাইলেন পিতা, রঘু প্রভুর কাছে নীলাচলে আছেন, উদাসীন, রাত্রে

সিংহদ্বারে 'খাড়া' হইয়া থাকেন, ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করিতেছেন। অতুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী ভিক্ষার অন্নে জীবন নির্বাহ করিতেছেন, আর গৃহে এত ঐশ্বর্য! পিতা-মাতা-জেঠার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ ও ভৃত্য কয়েক জনের হাতে চারিশত মুদ্রা দিয়া পুত্রের কাছে নীলাচলে পাঠাইলেন, গৃহে না আসুক, তবু এই অর্থে জীবন ধারণ করুক রঘুনাথ।

রঘুনাথ অর্থ গ্রহণ করিলেন না, কেবল মাসে একবার ঐ অর্থের সামান্য অংশ দ্বারা ভোজ্য প্রস্তুত করাইয়া প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিতেন, প্রভুও তাহা গ্রহণ করিতেন। কয়েক মাস পরে নিমন্ত্রণ বন্ধ হইয়া গেল, প্রভু স্বরূপকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে স্বরূপ বলিলেন, 'আমার উপরোধে প্রভু নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন মাত্র, কিন্তু ইহাতে তাঁহার মন প্রসন্ন হয় না, ইহাই ভাবিয়া রঘুনাথ নিমন্ত্রণ বন্ধ করিয়াছেন।'

প্রভু অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন, তিনি তো কিছু বলেন নাই, তবু তাঁহার ইচ্ছা অনুভব করিতেছেন রঘুনাথ। বলিলেন, 'বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন, এবং তাহাতে কৃষ্ণ-স্মরণে বিঘ্ন জন্মে।'

প্রভু রঘুনাথের দিকে সজাগ দৃষ্টি মেলিয়া রাখিয়াছেন। কয়েকদিন পরে স্বরূপকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আজকাল কেন সিংহদ্বারে রঘুকে দেখিতে পাই না?' স্বরূপ জানাইলেন, 'সিংহদ্বারে আর দাঁড়ান না, ছত্রে মাগিয়া খান রঘু।' প্রভু বলিলেন, 'সিংহদ্বারে ভিক্ষা করা পতিতার বৃত্তির সমান, ভালোই হইয়াছে, রঘুনাথ ইহা ত্যাগ করিয়াছেন।'

বিপ্র ও ভৃত্যগণ অর্থ লইয়া হিরণ্যদাস ও গোবর্ধনের কাছে ফিরিয়া গেল। হাহাকার করিয়া উঠিলেন আত্মীয়জন, শেষ যোগসূত্রটিও ছিন্ন করিয়া দিলেন রঘুনাথ। রঘুনাথ ইহার পরে ছত্রে মাগিয়া খাওয়াও বন্ধ করিলেন। স্বরূপ একদিন ঘরে গিয়া দেখেন, পুতিগন্ধময় যে অন্ন পশারীরা ফেলিয়া দেয়—গরুতে পর্যন্ত যাহা খায় না, সেই অন্ন, দুই মুষ্টি ঘরে আনিয়া অনেক জল দিয়া ধুইয়া ঘষিয়া ঘষিয়া ভিতরের সামান্য শাঁসটুকু মাত্র লইয়া রঘুনাথ গ্রহণ করিতেছেন। সংবাদ প্রভুর কর্ণগোচর হইল, রাত্রিতে হঠাৎ একদিন রঘুনাথের আহারের সময় প্রভু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রঘুনাথের সেই পর্যুষিত অন্ন হইতে একগ্রাস মুখে উঠাইয়া বলিলেন, 'এমন অমৃততুল্য বস্তু তুমি রোজ গ্রহণ কর, এ কি অপূর্ব প্রসাদ?' প্রভু আর এক গ্রাসের জন্য হাত বাড়াইলে স্বরূপ বাধা দিলেন, 'আর নয় প্রভু!'

প্রভু রঘুনাথের বৈরাগ্য-দর্শনে অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন, আপন-সেবিত গোবর্ধন-

শিলা ও গুঞ্জামালা অর্পণ করিলেন রঘুনাথের হাতে। রঘুনাথ সেই শিলা প্রভুর প্রতিনিধি-রূপে বক্ষে ধরিলেন।

দীর্ঘকাল প্রভুর কাছে আছেন রঘুনাথ, কিন্তু প্রভুর সামনে কোনও কথা বলেন না, একদিন স্বরূপকে দিয়া প্রভুকে নিবেদন করিয়া পাঠাইলেন, 'আমি কেন আসিলাম, কি আমার কর্তব্য, প্রভু তাহা আপন শ্রীমুখে উপদেশ করুন।' প্রভু রঘুনাথকে ডাকিয়া আনিলেন, বলিলেন, 'স্বরূপের হাতে তোমাকে দিয়াছি, তিনিই তোমাকে সব শিক্ষা দিবেন। তবু যদি আমার কথা শুনিতে তোমার ইচ্ছা হয়, তবে দুই-একটি কথা বলিয়া দিই, মনে রাখিও—ভালো খাইবে না, ভালো পরিবে না। গ্রাম্য কথা কহিও না, শুনিও না। নিজে অমানী হইয়া সকলকে মান দিবে। তৃণের মতো সুনীচ ও তরুর মতো সহিষ্ণু হইয়া সর্বদা হরিসংকীর্তন করিবে।

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুণা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥'

রঘুনাথ আপনার সমগ্র জীবন দিয়া প্রভুর শিক্ষা সার্থক করিয়া গিয়াছেন, কঠোর বৈরাগ্য পালন করিয়াছেন তিনি। কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার সান্নিধ্যে কিছু কাল ছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন, রঘুনাথ—

"আজন্ম না দিলা জিহ্বায় রসের স্পর্শন"
"ছিণ্ডা কাঁথা কানি বিনু না পরে বসন।"

পাষাণের রেখার মতো ছিল তাঁহার নিয়ম, দিবস-রাত্রির সাড়ে সাত প্রহরকাল জপ-পূজা-ধ্যানে কাটাইতেন, অর্ধপ্রহর মাত্র আহারনিদ্রার জন্য নির্দিষ্ট ছিল, তাহাও কতদিন জপধ্যানে কাটিয়া যাইত, হয়তো বা আহার হইত না।

নীলাচলে দীর্ঘ ষোড়শবর্ষ আপন অন্তরের অন্তরতমকে সেবা করিবার অধিকার পাইয়াছিলেন রঘুনাথ। মহাপ্রভুর শেষ দ্বাদশ বৎসরের গম্ভীরালীলা প্রতিদিন নিজের চোখে যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহাই লিখিয়া রাখিয়াছেন তাঁহার রচিত 'শ্রীগৌরাঙ্গ-স্তবকল্পবৃক্ষে'; এবং কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার মুখ হইতে শুনিয়া প্রভুর অশ্রুতপূর্ব, অপ্রাকৃত লীলার অনেক চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত' গ্রন্থে।

স্বরূপ প্রভুর অন্তরঙ্গ আর রঘুনাথ স্বরূপের অন্তরঙ্গ; স্বরূপের সঙ্গে প্রভুর বহু লীলার নীরব দর্শক হইয়াছিলেন রঘুনাথ।

রাধারস-বিভাবিত গৌরসুন্দর যখন ভিত্তিতে মুখ ঘষিয়া, পাথরে মাথা ঠুকিয়া,

রক্তধারা ও অশ্রুধারায় মিলিত স্রোতে সিক্ত হইয়া আর্তনাদ করিয়া কৃষ্ণকে ডাকিতে থাকিতেন, তখন রায় রামানন্দ ও স্বরূপের সঙ্গে রঘুনাথেরও কি আকুল ব্যথায় বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া পরমধনকে বক্ষের মধ্যে লুকাইয়া রাখিবার ইচ্ছা জাগিত না ?

দূর হইতে রঘুনাথ দেখিতেছেন, তাঁহার প্রিয়, তাঁহার দয়িত সিংহদ্বারের কাছে অচেতন হইয়া পড়িয়া আছেন, এক এক হস্ত পদ দীর্ঘ তিন তিন হাত হইয়া গিয়াছে, অস্থি-সন্ধি সব বিচ্ছিন্ন, জীবনের তিলমাত্র আশা নাই, ব্যাকুল স্বরূপ প্রভুর মস্তক আপন ক্রোড়ে উঠাইয়া বেদনার্তস্বরে কর্ণে কৃষ্ণনাম শুনাইতেছেন, তখন রঘুনাথের প্রাণও কি দেহ ছাড়িয়া যাইবার উপক্রম করে নাই ?

প্রভুর বিরহ-ব্যথার শত শত তীব্র প্রকাশ রঘুনাথের হৃদয়ে গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়া রহিল, তাই 'শ্রীগৌরাঙ্গ-স্তবকল্পবৃক্ষে' লিখিয়াছেন :—

ক্বচিন্মিশ্রাবাসে ব্রজপতিসুতস্যোরুবিরহাৎ
শ্লথশ্রীসন্ধিত্বাদধিকদৈর্ঘ্যং ভুজপদোঃ
লুঠন্‌ভূমৌ কাক্বা বিকলবিকলং গদ্‌গদবচা
রুদন্ শ্রীগৌরাঙ্গো হৃদয়ে উদয়ন্ মাং মদয়তি ॥

—'কোন একদিন কাশী মিশ্রের গৃহে ব্রজেন্দ্রনন্দনের উৎকট বিরহে অঙ্গের শোভা ও সন্ধিসকল শিথিল হওয়ায় যাঁহার হস্তপদ অধিক দীর্ঘ হইয়াছিল এবং তদবস্থায় ভূলুণ্ঠিত হইতে হইতে অত্যন্ত কাতরতার সহিত যিনি গদ্‌গদ কাকুবাক্যে রোদন করিয়াছিলেন, সেই শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত করিতেছেন।'

আর একদিন চটকপর্বত দর্শনে গোবর্ধনশৈলভ্রমে আবিষ্ট হইয়া ভাগবতের এক শ্লোক পাঠ করিতে করিতে প্রভু বায়ুবেগে ছুটিলেন, গোবিন্দ বা অপর কেহই তাঁহাকে ধরিতে সমর্থ হইলেন না, কিন্তু পথেই স্তম্ভভাব হইল, আর চলিতে পারেন না—

প্রতি রোমকূপে মাংস ব্রণের আকার,
তার উপরে রোমোদ্গম কদম্ব প্রকার,
প্রতিরোমে প্রস্বেদ পড়ে, রুধিরের ধার,
কণ্ঠ ঘর্ঘর, নাহি বর্ণের উচ্চার,
বৈবর্ণ্যে শঙ্খপ্রায় শ্বেত হইল অঙ্গ,
তবে কম্প উঠে যেন সমুদ্র-তরঙ্গ।

কাঁপিতে কাঁপিতে ভূমিতে পড়িয়া গেলেন প্রভু, তাই পশ্চাদ্বর্তীরা এতক্ষণে

তাঁহার নাগাল পাইলেন। সর্বাঙ্গে শীতল জলের ধারা সেচন ও কর্ণে কৃষ্ণনামামৃত বর্ষণ করিতে করিতে প্রভুর অর্ধচেতন হইল, বলিলেন, 'এ কি আমাকে তোমরা কোথায় আনিয়াছ? আমি গোবর্ধনপর্বতে গেলাম, সেখানে সব ধেনুগণের মধ্যে দাঁড়াইয়া শ্রীকৃষ্ণ যেই বেণু বাজাইলেন, অমনি বেণুগান শুনিয়া রাধাঠাকুরাণী আসিলেন, তাঁহার রূপসুধামাধুরীর আমি কি বর্ণনা দিব? কৃষ্ণ রাধাকে লইয়া লীলা করিতে করিতে পর্বতগুহায় প্রবেশ করিলেন। সুন্দরী হাস্যময়ী সখীরা আমাকে ফুল তুলিবার জন্য বলিলেন। হায়, হায়, নিষ্ঠুর তোমরা কেন আমাকে এই সময় লইয়া আসিলে? শ্রীরাধাকৃষ্ণের অদর্শনজনিত বেদনায় প্রভু আকুল হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ব্যাকুল রঘুনাথের ইচ্ছা হইল, প্রভুর নিছনি লইয়া মরিয়া যাই, কিন্তু কিছুই তো করিবার নাই।

প্রভুর গুরুস্থানীয় পুরী-গোঁসাই ও ভারতী ছুটিয়া আসিলেন, তাঁহাদের দেখিয়া প্রভুর কিছু বাহ্যজ্ঞান হইল, বলিলেন, 'শ্রীপাদ আপনারা এতদূরে আসিলেন কেন?' পুরী হাসিয়া বলিলেন 'তোমার (মধুর) নৃত্য দেখিবারে।' নিপট্ট বাহ্য পাইয়া প্রভু যেন লজ্জিত হইলেন, 'হরি, হরি' বলিয়া সমুদ্রস্নানে গমন করিলেন।

রঘুনাথ আপন বক্ষের রক্ত দিয়া ইহাও লিখিয়া রাখিয়াছেন:

'যিনি চটকপর্বত দেখিয়া গিরিগোবর্ধন-ভ্রমে প্রমত্তের ন্যায় ধাবিত হইয়া স্বজনগণ কর্তৃক ধৃত হইয়াছিলেন সেই—

প্রমদ ইব ধাবন্নবধৃতো গণৈঃ
স্বৈর্গৌরাঙ্গো হৃদয়ে উদয়ন্ মাং মদয়তি

—শ্রীগৌরাঙ্গ আমার হৃদয়ে উদিত হইয়া আমাকে উন্মত্ত করিতেছেন।

এমনি করিয়া একদিন নয়, দুইদিন নয়, দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর ধরিয়া প্রভুর বিরহ-ব্যথার যন্ত্রণা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন রঘুনাথ, দেখিয়াছেন শুধু প্রভুকে নয়, কৃষ্ণপ্রেমে সকল-হারা শ্রীমতী রাধিকাকে প্রভুর মধ্যে!

তাই প্রভুর অপ্রকটের পরে ভৃগুপাতে দেহত্যাগ করিবার সঙ্কল্প লইয়া যখন বৃন্দাবনে গেলেন, তখন অবশ্যই শ্রীরূপ-সনাতন ও অন্যান্য গোস্বামিগণের অনুরোধে দেহত্যাগ করিতে পারেন নাই, কিন্তু সারাদিন ব্রজের কুঞ্জ হইতে কুঞ্জে বিরহিণী রাধারাণীকে খুঁজিয়া ফিরিয়াছেন। যখন বার্ধক্যে আর চলিবার শক্তি ছিল না, তখনও হামাগুড়ি দিয়া, কুঞ্জ হইতে কুঞ্জান্তরে গিয়া কাঁদিয়া ডাকিয়াছেন, 'কোথায় গো ব্রজবধূ, কৃষ্ণময়ী রাধা! আর তুমি একলা কাঁদিও না, আমাকেও কাঁদাও গো,

কাঁদাও, তোমার কুঞ্জের ধূলিতলে লুণ্ঠিত হইয়া আমিও একবার ডাকি! হা কৃষ্ণ, হা প্রাণধন, কোথায় গো তুমি?'

হা হা সখি, কি করি উপায়?
কাঁহা করোঁ, কাঁহা যাঙ, কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাঙ,
কৃষ্ণবিনু প্রাণ মোর যায়!

বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদূনি কুসুমাদপি

'না, জননীরও বৈষ্ণবাপরাধ আছে, আচার্য অদ্বৈত পরম বৈষ্ণব, জননী তাঁহার কাছে অপরাধী, তিনি আচার্যের চরণ ধরিয়া ক্ষমা ভিক্ষা না করিলে আমি তাঁহাকে কৃষ্ণপ্রেম দিতে পারিব না।'

শ্রীবাসের বিষ্ণুখট্টায় উপবিষ্ট মহাপ্রভু ভগবৎ-আবেশে, মহাগম্ভীর কঠোর সুরে এই কথা যখন ভক্ত শ্রীবাসকে বলিলেন, ভয়ে বিস্ময়ে শিহরিয়া উঠিলেন ভক্তগণ, 'এ কি নিদারুণ কথা উচ্চারণ করিতেছেন প্রভু! যিনি বিশ্বম্ভরপুত্রের গর্ভধারিণী, জগজ্জননী, তাঁহার অপরাধ?'

প্রিয়তম পুত্রের কণ্ঠ যেন এ নয়, যেন দূরাগত কোন অমোঘ দৈববাণী! বৃদ্ধা জননী কম্পিতা হইতে লাগিলেন, মনে পড়িল তাঁহার 'অপরাধে'র কথা।

সুন্দর কিশোর বিশ্বরূপ পুত্র তাঁহার যেদিন সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন, সেদিন শোকশীর্ণা জননীর বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া গেল। একমাত্র আচার্য অদ্বৈতের সঙ্গ-লালসাই যেন নবদ্বীপে বিশ্বরূপকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, নতুবা কৃষ্ণভক্ত-হীন ও ভক্তিবিহীন নবদ্বীপে বিশ্বরূপের কোন আকর্ষণই ছিল না। জননী জানিতেন, বৈষ্ণব-শিরোমণি অদ্বৈত আচার্যই সংসারের অসারত্ব বুঝাইয়া ক্রমেই বিশ্বরূপকে অন্তর্মুখী, কৃষ্ণমুখী করিয়া তুলিতেছিলেন; কাজেই যেদিন বিশ্বরূপ গৃহত্যাগ করিলেন, সেদিন সন্তপ্তা জননীর বিরহবিধুর হৃদয়ে একটি কথাই বার বার ধ্বনিত হইতেছিল, 'অদ্বৈত সে মোর পুত্র করিলা বাহির।' তথাপি বৈষ্ণবাপরাধ-ভয়ে জননী সেদিন কিছুই বলিলেন না, অসহ্য ব্যথার ভার নীরবেই মনের মধ্যে বহন করিয়া চলিলেন। তাঁহার সমস্ত দুঃখের কাঁটা ধন্য করিয়া তাঁহার ব্যথার রঙে রাঙা হইয়া যে অবশিষ্ট মুকুলটি ক্রমেই বিকশিত হইয়া উঠিতেছিল, সেই প্রাণের নিমাইও যখন গৃহসুখ পরিহার করিয়া বালিকা-বধূর প্রতীক্ষা-রজনী ব্যর্থ করিয়া আচার্য-সঙ্গে কৃষ্ণকথায় মত্ত হইয়া রহিলেন, জননী যেদিন প্রাণে প্রাণে বুঝিলেন, নিমাইকেও

আর গৃহে রাখিতে পারিবেন না। তিনি, সেদিনই বুঝি, বুকের ধনকে হারাইবার ভয়ে আর্ত-ক্রন্দনে জননী বলিয়া উঠিয়াছিলেন: 'কে তাঁহাকে "অদ্বৈত" বলে, আমি তো দেখিতেছি তিনি "দ্বৈত"!' সকলের প্রতি তাঁহার অখণ্ড, অভেদ দৃষ্টি, দেবদুর্লভ করুণা, শুধু কি হতভাগিনী আমারই প্রতি তাঁহার দ্বৈত মায়া, তাঁহার ভেদদৃষ্টি. তাঁহার এ নিষ্ঠুর নির্দয়তা?'

শুধু এইটুকুই জননীর অপরাধ! একদিন মনের অসহ্য যন্ত্রণায় শুধু এই কথাটিই বুঝি জননী কাহার কাছে উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাই বিশ্বম্ভর পুত্র তাঁহাব আজ এই দণ্ড বিধান করিতেছেন! ভক্তগণ 'হায়, হায়!' করিয়া উঠিলেন, 'একি কথা বলিতেছেন প্রভু!'

কিন্তু যিনি প্রভু, তিনি সকলেরই প্রভু, তিনি নিরপেক্ষ দ্রষ্টা, সাক্ষিস্বরূপ; কেবা তাঁহার জননী, কেবা আপন, কেই বা পর! তাঁহাব প্রতি কৃত অপরাধেব ক্ষমা তিনি করিতে পারেন, ভগবানও তাহা পাবেন, কিন্তু ভক্তেব প্রতি, বৈষ্ণবের প্রতি কৃত অপরাধের ক্ষমা তাঁহার কাছেও নাই, ভগবানের কাছেও নাই। তিনি তো শুধু নবদ্বীপের নিমাই পণ্ডিত তথা শচীপুত্রই নহেন, তিনিই তো পরমতত্ত্ব, স্বয়ং ভগবান্!

পুত্র কৃষ্ণপ্রেমধন অর্জন করিয়াছেন, দুই হাত ভরিয়া বিলাইতেছেন জনে জনে। 'প্রেমে শান্তিপুর ডুবু ডুবু নদে ভেসে যায়', অথচ পতিহীনা শচীমাতার ভাগ্যে কি সেই ধন জুটিবে না? অনাথিনী জননীর একমাত্র অবলম্বন পুত্র নিমাই কী জননীকে বঞ্চিত করিবেন?

নিমাই হয়তো বা জননীকে অর্জিত ধন হইতে বঞ্চিত করিতেন না, কিন্তু নিষ্ঠুর কঠোর বিশ্বম্ভর জননীকে বলিলেন, 'আগে বৈষ্ণবাপবাধের খণ্ডন হোক, নতুবা জননীর ভাগ্যে প্রেমধন লাভ হইবে না।'

ভক্তগণ আচার্যের কাছে গিয়া যখন প্রভুর এই কঠোব আদেশের কথা জানাইলেন, ভয়ে বিস্ময়ে আচার্য আর্তনাদ কবিয়া উঠিলেন, 'হায় প্রভু! আমাব প্রাণ-সংহার করিবে তুমি, জননীর এই লাঞ্ছনা কবিবে তুমি আমাকে নিমিত্ত কবিয়া!' সন্ত্রস্ত আচার্য কোথায় নিজেকে লুকাইবেন ভাবিয়া পাইলেন না!

ভয়কম্পিতা বৃদ্ধা জননী শচীদেবী অশ্রুসজল নয়নে আসিয়া আচার্যেব চরণে লুটাইয়া পড়িলেন, আচার্য মূর্ছিতপ্রায় হইয়া গেলেন, জননীও! জননীর প্রেমধন লাভ হইল। হর্ষ, কম্প, অশ্রু, রোমাঞ্চে পুলকিতাঙ্গী হইয়া জননী উঠিয়া আসিলেন কৃতার্থা, ধন্যা!

ভক্তগণ বিস্ময়বিমূঢ় নয়নে একবার দেখিতেছেন জননীর দিকে, একবার ভগবদ্ভাবাবিষ্ট প্রভুর দিকে! বৈষ্ণবাপরাধ কি এতই কঠিন, এতই কঠোর, যাহা বিশ্বজননীকেও ক্ষমা করে না? ভয়ে কম্পিত হইয়া উঠিলেন ভক্তগণ, স্বপ্নেও যেন বৈষ্ণবাপরাধ কাহারও দ্বারা অনুষ্ঠিত না হয়, সে-বিষয়ে সকলেই সচেতন হইয়া গেলেন।

প্রভু ত্রিকালদর্শী, মাতাকে উপলক্ষ করিয়া সকলকেই শিক্ষা দিলেন, এমনকি স্বয়ং আচার্যকেও যেন সতর্ক করিয়া দিলেন ভবিষ্যতের জন্য।

নতুবা প্রভু কি জানেন না জননীর তত্ত্ব? 'তুমি পৃশ্নি, তুমি অদিতি, তুমি দৈবকী, তুমি বিশ্বজননী' বলিয়া স্তুতি করিতে করিতে প্রভু কতদিন জননীকে প্রদক্ষিণ করিয়াছেন! সন্ন্যাসের পরেও শান্তিপুরে আচার্য-গৃহে জননীর পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া যেন সন্ন্যাস-গ্রহণের অপরাধে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন বার বার! জননীর বক্ষে অশ্রুসিক্ত মুখখানি রাখিয়া কাঁদিয়া উঠিয়াছেন শিশুর মত, 'মাগো! আমি তোমার অধম পুত্র, আমার মতি স্থির নাই, তাই তোমাকে ব্যথা দিয়া আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছি। কি করি মাগো, কৃষ্ণ ছাড়া আমি আর যে থাকিতে পারি না! কৃষ্ণ-বিরহে আমার প্রাণ বাহির হইয়া যায়, যাক, তবুও তোমার দুঃখ দূর হোক। তুমি বলো, আমি কি সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়া আবার ফিরিয়া আসিব গৃহে, তোমার বক্ষে?'

যেমন পুত্র, তেমনই জননী! বিশ্বম্ভরপুত্র গর্ভে ধারণ করিয়াছেন যিনি, তিনি তো সর্বংসহা! পুত্রবিরহের অসহ্য যন্ত্রণায় বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া যাক, তবুও পুত্রের জীবনব্রত অক্ষুণ্ণ থাকুক, অটুট থাকুক তাহার সন্ন্যাস! রুদ্ধকণ্ঠে জননী বলিলেন, 'না বাপ! তুমি সুখী হও, তোমার আনন্দেই আমার আনন্দ! আমাকে সুখী করিতে, নবদ্বীপের ভক্তদের আনন্দ দিতে তুমি ব্রত ভঙ্গ করিবে, তাহা আমি তো চাহি না প্রাণধন! ঘরে থাকুক জ্বলন্ত অগ্নি বিষ্ণুপ্রিয়া, তাহাকে আমিই আমার এই পাষাণ-বক্ষের তলে আবৃত করিয়া রাখিব, তোমার ভক্তগণ দ্বার রুদ্ধ করিয়া তোমাকেই স্মরণ করিয়া চোখের জলে ভাসিবেন, তবুও তোমার সন্ন্যাস-ভঙ্গ আমি করিব না! আমার বক্ষ বিদীর্ণ হইবে না নিমাই! তুমি নীলাচলে সুখে থাকো!'

নীলাচলের পথেই যাত্রা করিলেন প্রভু। দূরে মিলাইয়া গেল শান্তিপুর, সুদূর দিগন্তে মিলাইয়া গেল জননীর শুভ্র সীমন্ত-রেখা।

আজ সেই জননীকেই দণ্ড দান করিলেন প্রভু সর্বজন-সমক্ষে! উপলক্ষ জননী, লক্ষ্য ভক্তগণ, এমনকি আচার্য স্বয়ং!

যে আচার্যের চরণে প্রভু জননীকে দিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করাইলেন, যাঁহাকে প্রভু মহাবিষ্ণুর অংশ বলেন, যাঁহার আহ্বানে তাঁহাকে বৈকুণ্ঠ হইতে নামিয়া আসিতে হইল এই ধূলার ধরণীতে, তাঁহাকেও সাক্ষী করিলেন প্রভু জননীর দণ্ডদান উপলক্ষে।

শ্রীপাদ অদ্বৈত আচার্য মহাবিষ্ণুর অংশ; কিন্তু পরমবৈষ্ণব, ভক্তাবতাররূপেই তিনি অবতীর্ণ, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপ প্রভুর প্রতি তিনি দাস্যাভিমানই করেন। কিন্তু ত্রিকালজ্ঞ প্রভু জানেন, এমন দিন আসিবে যে দিন আচার্যের কোন কোন শিষ্য আচার্যকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া প্রচার করিবেন এবং ইহার পরিণাম শুভ হইবে না। যিনি ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ, উচ্চ অধিকারী, তাঁহাতে ভগবত্তা আরোপিত হইলে তাঁহার কোন ক্ষতি হইবে না, কিন্তু এই দৃষ্টান্ত-সাধন জগতের নিম্ন অধিকারীর পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর, ইহাতে গুরু এবং শিষ্য উভয়েরই সর্বনাশ:

বড় অধিকারী হয় আপনে এড়ায়,
ক্ষুদ্র হৈলে গণ সহ অধঃপাতে যায়। —চৈঃ ভাঃ, মধ্যখণ্ড, ২২ অধ্যায়

প্রভু জননীকে দণ্ড দান করিলেন বৈষ্ণবাপরাধে। জননীর অপরাধ পরমবৈষ্ণব ভক্তাবতার শ্রীপাদ অদ্বৈত আচার্যের কাছে, স্বয়ং ভগবানের কাছে নয়। ভগবদ্-অপরাধের খণ্ডন আছে, বৈষ্ণবাপরাধের খণ্ডন নাই। আচার্য স্বয়ং কৃষ্ণ নহেন—অংশ, ভক্ত, বৈষ্ণব, কাজেই তাঁহার কাছে জননীকে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইল এবং প্রভুই তাহা করাইলেন দূর ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া।

* * *

'ভগবানের ভক্ত, দাস, ইহাই ভক্তের অভিমান এবং ইহাই তাঁহার গৌরব।

প্রভুর ত্রিকালপ্রসারী স্বচ্ছ দৃষ্টিতে বহুপূর্বেই যাহা ধরা পড়িয়াছিল, তাহারই একটি প্রকাশ ঘটিল অনতিবিলম্বে।

আচার্যের কর্মচারী কমলাকান্ত বিশ্বাস উড়িষ্যার মহারাজ প্রতাপরুদ্রের কাছে আচার্যের ঋণশোধ-মানসে কিছু অর্থ সাহায্য চাহিয়া এক আবেদনপত্র পাঠাইয়াছিলেন। সেই পত্রে আচার্যের মহত্ত্ব ও ঈশ্বরত্ব স্থাপনের যথেষ্টই প্রয়াস ছিল।

প্রভু তখন নীলাচলে, কেমন করিয়া তাঁহার কাছেও এই পত্রের খবর পৌঁছিল। প্রভু দুঃখিত হইলেন, তথাপি হাসিয়াই পার্শ্বচরগণকে বলিলেন, 'কমলাকান্ত অদ্বৈত আচার্যকে ঈশ্বর বলিয়া স্থাপন করিয়াছেন, তাহা তিনি করুন, আচার্য 'দৈবত ঈশ্বর', কিন্তু ঈশ্বরের আবার দৈন্য কি এবং তাঁহার জন্য আবার অর্থ-প্রার্থনাই বা কেন?'

গম্ভীর কণ্ঠে প্রভু বলিলেন, 'গোবিন্দ! কমলাকান্তকে আমার কাছে আর আসিতে দিবে না। ঈশ্বর পরম ঐশ্বর্যময়, তাঁহার দৈন্য থাকা যে সম্ভব নয়, কমলাকান্তের এই শিক্ষা এখনও বাকী।'

বস্তুতঃ আচার্য এই পত্রের কথা জানিতেন না। কমলাকান্তের এই প্রগল্ভতায় তিনি লজ্জিত হইলেন এবং কমলাকান্তের দণ্ড তাঁহাকেই বাজিল। দুঃখিত ভীত কমলাকান্তকে আশ্বাস ও সান্ত্বনা দান করিয়া আচার্য লজ্জানত মুখে প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, বলিলেন, 'প্রভু, আমি কি অপরাধ করিয়াছি, তুমি আমাকে কেন স্বহস্তে দণ্ডপ্রসাদ দান করিলে না!' আচার্যের কাকুতিতে প্রভুর মন প্রসন্ন হইয়া উঠিল, নিরীহ সরল কমলাকান্তকে ডাকাইয়া আনিয়া বলিলেন, 'কমলাকান্ত, আচার্যকে ঈশ্বর বলিয়া আবার তাঁহার জন্য রাজার কাছে অর্থ কেন প্রার্থনা করিলে? তুমি বুঝিতে পার না, ইহাতে আচার্যের কতখানি লজ্জা। তাঁহার ধর্মের হানি করিয়া তুমি তাঁহাকে বিষয়ীর অন্ন তথা অর্থ প্রতিগ্রহ করাইতে চাও? ভক্ত কখনও বিষয়ীর অন্ন গ্রহণ করেন না, করিলে মন দুষ্ট হয় এবং দুষ্ট মনে কিছুতেই কৃষ্ণস্মৃতি হয় না, কৃষ্ণস্মৃতি-বিহীন জীবনে ভক্তের কি কাজ?'

কমলাকান্তকে উপলক্ষ করিয়া এইবার আর এক শিক্ষা ভক্তগণকে প্রভু দিলেন। কৃষ্ণভজন তথা ঈশ্বরপ্রাপ্তির আশা করিলে বিষয় বা বিষয়ীর সংস্পর্শ যে ত্যাগ করিতে হইবে, ইহাই প্রভুর শিক্ষা।

* * *

আচার্য মহাবিষ্ণুর অংশ, মহাশক্তিধর, প্রভুও তাঁহাকে মান্য করেন। নবদ্বীপে বহুদিন আচার্যের মন তাহাতে প্রসন্ন হয় নাই। 'যিনি গোলোকপতি, বিশ্বপতি, তিনি কেন আমার চরণ ধারণ করেন, কেন তিনি আমাকে মান্য করেন, পূজ্যের আসনে আমাকে বসান?' আচার্য প্রভুর দেওয়া এই সম্মানের আড়াল হইতে নিজেকে মুক্ত করিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিলেন, 'তিনি প্রভু, আমি দাস, ইহাই তো আমার সাধনা, ইহাই আমার গৌরব।' আচার্য নিজেকে গৌরবের উচ্চস্থান হইতে নিম্নে ভূমিতলে দাসের আসনে নামাইয়া আনিতে কৃতসংকল্প হইলেন। বার বার, কত প্রকার পরীক্ষার পর আচার্য এতদিনে জানিয়াছেন জগন্নাথ শচীর পুত্র এই নিমাই-ই তাঁহার আরাধ্য, তাঁহার সাধনের ধন শ্রীকৃষ্ণ, কাজেই আর তিনি বিড়ম্বিত হইবেন না, এইবার 'কপট' প্রভুকেই আসিতে হইবে তাঁহার কাছে আপন ষড়ৈশ্বর্যের মহিমায় পূর্ণ হইয়া।

আচার্য এইবার আর এক কঠিন পরীক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। মহাজ্ঞানী আচার্য

শান্তিপুরে স্বগৃহে বসিয়া শিষ্যভক্তগণের নিকটে অদ্বৈত-বেদান্ত প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন। শুষ্কজ্ঞান তথা মায়াবাদী ভাষ্যের উপরেই ব্যাখ্যা ও অধ্যাপনা চলিতে লাগিল। যিনি পরম ভক্ত, তিনি ভক্তিকে একেবারেই বর্জন করিলেন।

একদিন এইরূপ ভক্তিহীন ব্যাখ্যাই চলিতেছে, সহসা নবদ্বীপ হইতে কখন আসিয়া শান্তিপুরে আবির্ভূত হইলেন প্রভু, জ্বলন্ত অনলের ন্যায় রুদ্রতেজে ; বৃদ্ধ পরম মান্য আচার্যকে কেশাকর্ষণ করিয়া অধ্যাপকের মহিমান্বিত আসন হইতে নীচে টানিয়া নামাইয়া প্রহার করিতে করিতে গর্জন করিয়া বলিতে লাগিলেন, 'বৈকুণ্ঠ হইতে তুই আমাকে কেন এই পৃথিবীতে আনিলি, ভক্তিহীন এই সংসারে ভক্তি বিলাইবার জন্যই না তুই আমাকে আনিয়াছিলি, এখন কেন তোর এই দুর্ব্যবহার ?'

অদ্বৈতগৃহিণী সীতাদেবী প্রভুর এই অভাবনীয় আচরণে প্রথমে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। অবশেষে বৃদ্ধ স্বামীর নির্যাতন আর সহ্য করিতে না পারিয়া ব্যগ্র ব্যাকুল ভাবে ছুটিয়া আসিলেন প্রভুর কাছে, 'একি করিতেছ নিমাই ? রাখো রাখো, বৃদ্ধকে প্রাণে মারিও না বাপ।'

বৃদ্ধ আচার্য ভূলণ্ঠিত হইতেছেন, আঘাত পড়িতেছে অঙ্গে, কিন্তু হৃদয় পুলকিত হইয়া উঠিতেছে সাফল্যের আনন্দে ! 'আমি আনিয়াছি, গোলোকবিহারীকে আজ নামিয়া আসিতে হইয়াছে এই ধুলার ধরণীতে, আজ আমারও বাসনা পূর্ণ হইয়াছে, এ তো আমার নিগ্রহ নয়, এ যে পরম অনুগ্রহ, আমার প্রতি প্রসন্ন বিধাতার পরম প্রসাদ !'

প্রভুর দুই চরণতলে মাথা লুটাইয়া দিলেন আচার্য, দুই নয়নের ধারায় সিক্ত হইল প্রভুর চরণতল, বলিলেন, 'ওগো কপট ! ওগো চোর ! আজ কোথায় গেল তোমার ছদ্মবেশ, কোথায় গেল অভিনয় ? আর নিজেকে লুকাইতে পারিবে না, এইবার ধরা পড়িয়াছে, আর সম্মান দিয়া দূরে ঠেলিতে পারিবে না আমাকে !'

শান্ত-স্তিমিত হইয়া আসিল প্রভুর ক্রোধবহ্নি, দুই আরক্ত নয়নে আসিল করুণা, প্রেম ! সহসা যেন মূর্ছাহত চৈতন্য জাগিয়া উঠিল, সকরুণ কণ্ঠে আচার্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আচার্য ! আমি কি কিছু চাঞ্চল্য প্রকাশ করিয়াছি ?'

আচার্য মধুর হাসিয়া বলিয়া উঠিলেন, 'না, তেমন বেশী কিছু নয়, সামান্যই করিয়াছ।'

করুণাঘন মহাপ্রভু, প্রেমের অবতার ; তীর নয়, তূণ নয়, নয় নির্দয় সুতীক্ষ্ণ ব্রহ্মাস্ত্র—এইবার অস্ত্র হরিনাম, শস্ত্র অশ্রুজল ! 'আপনি কেঁদে জগৎ কাঁদায়', কান্না শুধুই কান্না—'হা কৃষ্ণ ! প্রাণকৃষ্ণ !' বলিয়া কেবলই অঝোর-ঝরা কান্না।

কিন্তু সত্যই কি কেবল কান্না, সেই কান্নার ফাঁকে, বর্ষণমুখর আকাশে কি কখনও দেখা যায় নাই প্রখর উজ্জ্বল সূর্যকিরণ-লেখা ?

প্রভু নিজে কাঁদিয়াই সৃষ্টি করিলেন নির্বীর্য, ভীরু, অসহায় একদল বৈষ্ণব,—শুধু কি কাঁদিবার জন্যই ?

শুধু কুসুমের কোমল স্পর্শ দিয়াই কি তিনি ভক্তগণকে স্নিগ্ধ, দ্রবীভূত করিয়া গেলেন, বজ্রদহনে কি ভক্তের সকল কালো, সকল মলিনতাকে দহন করিয়া যান নাই ?

নবদ্বীপের জগাই মাধাই একদিন দেখিয়াছিলেন সেই বজ্রাগ্নি, সেই উদ্যত মহাভয় :

ভয়াদস্যাগ্নিস্তপতি ভয়াৎ তপতি সূর্যঃ।
ভয়াদিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মৃত্যুর্ধাবতি পঞ্চমঃ॥ —কঠ উপ. ২।৩।৩

—'অগ্নি ইহার ভয়ে তাপ দেন, সূর্যও ইহার ভয়ে তাপ দিতেছেন—ইহারই ভয়ে ইন্দ্র, বায়ু এবং পঞ্চম মৃত্যুও ধাবিত হন।'

মৃত্যুও যাঁহার ভয়ে ধাবমান, মহাবিশ্ব যাঁহার শাসনে নিয়ন্ত্রিত, যেন সেই মহাকালরূপী প্রভু দণ্ডায়মান জগন্নাথ মাধবের সম্মুখে ; আর রক্ষা নাই, ঐ যে আসিতেছে কালরূপী সুদর্শন চক্র। শ্রীপাদ নিত্যানন্দের দেহে রক্ত দেখিয়া অপরিসীম ক্রোধে প্রভু যেন জ্ঞান হারাইলেন :

রক্ত দেখি ক্রোধে প্রভু বাহ্য নাহি জানে,
চক্র চক্র চক্র (সুদর্শন চক্র) বলি ডাকে ঘনে ঘনে
আথে ব্যথে চক্র আসি উপনীত হৈল,
জগাই মাধাই তাহা নয়নে দেখিল।

মুহূর্তেই সেই ক্রোধাগ্নি, সেই প্রলয়-বহ্নি ভস্মীভূত করিত জগন্নাথ আর মাধবকে, যদি না পরম দয়াল নিত্যানন্দের কৃপামেঘে তাঁহারা আবৃত হইতেন।

* * *

মহাপ্রভুর বজ্রাগ্নি-দহনে গোপালচাপালও দগ্ধ হইয়াছিলেন একদিন। গোপালচাপাল নবদ্বীপবাসী, ভবানীপূজক—পূজারী নয়, অভিচারী—মদ্য, মাংস ও ব্যভিচারই সেই পূজার অঙ্গ ! বৈষ্ণবের অবলম্বন নিরাবরণ শুদ্ধাভক্তি, উপচার অশ্রু ও নাম ; তাহাই লইয়া বৈষ্ণব দীনাতিদীন চিত্তে উপস্থিত হন আরাধ্যের মন্দিরদ্বারে, নীরবে ! এই আড়ম্বরবিহীন সাধনা ও ভক্তিকে উপহাস করিয়া গোপাল একদিন পরমভক্ত শ্রীবাসের গৃহদ্বারে মদ্য মাংস প্রভৃতি নানা উপচার

রাখিয়া আসিলেন, শ্রীবাসকে হেয় ও নিন্দিত করিবার বাসনায়। শ্রীবাস স্বহস্তে সেই সমস্ত অস্পৃশ্য উপচার পরিষ্কার করিলেন, মনে ক্ষোভ হইলেও নীরব বিষণ্ণ হাস্যে গোপালকে মনে মনে ক্ষমা করিলেন; কিন্তু ভক্তের যিনি ভগবান্, তিনি ভক্তদ্রোহীকে ক্ষমা করিলেন না, তিনি যে ভক্তের কাঙাল। স্বকৃত অপরাধ বিকৃত গলিত মূর্তি ধারণ করিয়া আশ্রয় করিল গোপালের দেহে, গোপালের কুষ্ঠব্যাধি হইল। গোপালের আত্মীয়-বান্ধব এমনকি স্ত্রীপুত্র পর্যন্ত যেদিন ঘৃণায় মুখ ফিরাইল, সেদিন গোপাল আসিয়া প্রভুর চরণে লুটাইয়া পড়িলেন, ব্যাকুল মিনতি করিয়া পড়িল, 'প্রভু! আমি তোমার আত্মীয়, তোমারই প্রতিবেশী, আমাকে রক্ষা কর দয়াল!' প্রভু ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন, গোপালের কাতর ক্রন্দনে তিনি দ্রব হইলেন না!

অথচ আর একদিন যাচিয়াই কৃপা করিলেন, তেমনই কুষ্ঠরোগগ্রস্ত অপর এক বিপ্রকে!

কূর্মতীর্থে এক বিপ্র, নাম বাসুদেব, লোকে বলে 'কুষ্ঠীবিপ্র', মহাব্যাধির প্রকোপে অঙ্গ গলিতপ্রায়, ক্ষতস্থানে শতসহস্র কীট। বিপ্র বসিয়া আছেন পথের ধারে, ভক্তোত্তম; তথাপি মানুষের ভয়, ঘৃণা অথবা করুণার পাত্র। কিন্তু আপন দুর্ভাগ্যে বিন্দুমাত্র ক্ষোভ তাঁহার মনে নাই। কেহ কাছে নাই আসুক, ঘৃণা করুক সকলে, ইহাই যেন তাঁহার কাম্য। অন্তরতম যিনি, তিনি তো দূরে-নহেন, তিনি আছেন অন্তরেই,আর বাহিরে তাঁহার দেহকে আশ্রয় করিয়া আছে শত শত কীট, একটি যদি দেহচ্যুত হইয়া পড়ে, বাসুদেব আবার তাহাকে যতন্তে দেহের মধ্যেই তুলিয়া রাখেন, এই দেহ তো মাটির নীচেই মিশিয়া যাইবে একদিন, তবুও যতদিন তিনি আছেন, এই তুচ্ছ ঘৃণিত দেহ দিয়াই পোষণ করিবেন কীটগুলিকে! 'হোক না কীট তবুও কৃষ্ণের জীব!'

কূর্মতীর্থে কূর্মবিগ্রহ দর্শনান্তে এক বিপ্রগৃহে রাত্রি যাপন করিয়া পরদিন প্রত্যুষে প্রভু যাত্রা করিলেন অপর তীর্থপথে। প্রভু যখন বহুদূর চলিয়া গিয়াছেন, তখন কুষ্ঠরোগগ্রস্ত বাসুদেব কোন মতে জীর্ণ দেহটিকে টানিয়া আনিলেন বিপ্রগৃহে প্রভুর চরণ-দর্শনের আশায়। আসিয়া দেখেন প্রভু নাই, এতক্ষণে কতদূর গিয়াছেন কে জানে? হতভাগ্য মৃত্যুপথযাত্রী বাসুদেব চরম হতাশায় ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, 'হায় দয়াল, হায় পতিতপাবন, এই পতিত অধমের প্রতি তোমার করুণা হইল না প্রভু! একবার দেখা দিলে না নাথ!'

বিপ্রের করুণ আর্তনাদ বুঝি মুহূর্তে গিয়া আঘাত করিল প্রভুর অন্তরে, প্রভু

দ্রুত অধীর চরণে ফিরিয়া আসিলেন বিপ্রের কাছে। চমকিত বাসুদেব চাহিয়া দেখেন, সম্মুখে দাঁড়াইয়া তপ্তসুবর্ণদ্যুতিমান্ সুপ্রসন্ন দেবতা, গুম্ভিত পুলকিত বাসুদেব প্রভুর চরণে নিজেকে লুটাইয়া দিলেন, দুই বরাভয় হস্ত প্রসারিত করিয়া প্রভু বক্ষে তুলিয়া লইলেন বাসুদেবকে। সেই পুণ্যস্পর্শে বাসুদেবের দেহ শীতল হইয়া যাইতেছে, চন্দন-সৌরভে বাতাস ব্যাপ্ত, আলোয় ভরিয়া গিয়াছে আকাশ! মুহূর্তে অঙ্গের সমস্ত ক্ষত যেন মন্ত্রবলে কোথায় অন্তর্হিত হইল, পরম সুন্দর উজ্জ্বল দেহ লইয়া বাসুদেব প্রভুর চরণতলে পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলেন—

> বহু স্তুতি করি কহে, শুন দয়াময়!
> জীবে এই গুণ নাহি, তোমাতেই হয়॥
> মোরে দেখি মোর গন্ধে পলায় পামর।
> হেন মোরে স্পর্শ তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর॥
> কিন্তু আছিলাও ভাল অধম হইয়া।
> এবে অহঙ্কার মোর জন্মিবে আসিয়া।—চৈঃ চঃ

'ওগো করুণাময়! ঘৃণিত ব্যাধিগ্রস্ত দেহ লইয়া এক কোণে পড়িয়াছিলাম, তাহাই তো ছিল ভালো, আজ সুন্দর এই দেহ লইয়া আমি কি করিব বলো! যেই দেহে ছিল কেবল কীটের বাস, আজ যে অহঙ্কার আসিয়া আশ্রয় করিবে সেই দেহে!'

> প্রভু কহে, কভু তোমার না হবে অভিমান।
> নিরন্তর কহ তুমি কৃষ্ণকৃষ্ণ-নাম॥
> কৃষ্ণ উপদেশি কর জীবের নিস্তার।
> অচিরাতে কৃষ্ণ তোমা করিবেন অঙ্গীকার॥

বাসুদেবকে দর্শন দান করিয়া, তাঁহার দেহকে নিরাময় করিয়া প্রভু আবার চলিয়া গেলেন আপন গন্তব্য পথে।

গোপালচাপালও সেই ব্যাধিগ্রস্ত দেহ লইয়াই উপস্থিত হইলেন প্রভুর চরণে, কিন্তু প্রভু তাঁহার প্রতি প্রসন্ন নয়ন মেলিয়া একবারও তাকাইলেন না!

গোপালের আর্তক্রন্দনে প্রভুর হৃদয় গলিল না, ক্রুদ্ধ কঠোর কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, 'দূর হও নরকের জীব! কোটি জন্ম-জন্মান্তরেও রৌরবদাহ হইতে তোমার মুক্তি নাই।' প্রভুর চরণে পড়িয়া গোপাল আর্তনাদ করিতেছেন, 'রক্ষা করো ওগো দয়াল! আমাকে তুমি কৃপা কর।'

এইবার পাষাণে হয়তো একটি ক্ষীণ রেখাপাত হইল, প্রভু বলিলেন, 'আমার

কাছে তোমার ক্রন্দন একান্তই নিষ্ফল, তোমাকে মুক্তি দেওয়া আমার সাধ্যায়ত্ত নয়, যিনি তোমাকে কৃপা করিতে পারেন তিনি শ্রীবাস, তুমি তাঁহার কাছে যাও।'

শ্রীবাসের চরণেই গিয়া পড়িলেন গোপাল, অনুতপ্ত হৃদয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন বার বার। শ্রীবাস দুঃখে লজ্জায় অভিভূত হইয়া গেলেন, ক্ষমা তো তিনি কবেই করিয়াছেন, তবে কেন আজ আবার প্রভু গোপালকে তাঁর কাছেই পাঠাইলেন? করুণায় শ্রীবাসের চোখে আসিল অশ্রু, আর সেই জাহ্নবীধারায় অবগাহন করিয়া স্নিগ্ধ সুস্থ হইয়া উঠিলেন গোপাল।

ভক্তের মান রক্ষা করা ভগবানের ধর্ম, তাহাই করিলেন প্রভু শ্রীবাসকে উপলক্ষ করিয়া। ভক্তের মান বাড়াইতে প্রভু ব্যগ্র, কিন্তু অভিমান নয়। ভক্তের মনে যদি অভিমানের বিন্দুমাত্রও স্ফুরণ হয়, তবে কঠোর হস্তে তাহা খর্ব করিতে প্রভুর এতটুকুও দ্বিধা হয় না।

* * *

মথুরা হইতে প্রত্যাবর্তনের পথে প্রভু যখন প্রয়াগে আসিলেন, তখন ভক্ত বল্লভ ভট্টের সঙ্গে তার পরিচয় হয় এবং প্রভু তাঁহাব আতিথ্যও গ্রহণ করেন।

তীর্থ-পরিক্রমান্তে প্রভু ফিরিয়া আসিবার পরে ভট্ট একবার নীলাচলে আসিলেন। প্রভু তাঁহাকে শ্রদ্ধা করেন; তিনি যখন প্রভুর কাছে আসিলেন, প্রভু তাঁহাকে যথেষ্ট মান্য করিয়া কাছে বসাইলেন।

ভট্ট প্রভুকে স্বয়ং কৃষ্ণ বলিয়া স্তুতি করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেন কে জানে প্রভুর কানে সেই স্তুতি কিছুটা বেসুরা বাজিল! তিনি সবিনয়ে ভট্টকে বলিলেন, 'ছিঃ ছিঃ! আমাকে আপনি এ কি বলিতেছেন, আমি এক সাধারণ মায়াবাদী সন্ন্যাসী; আমার ভক্তি নাই, জ্ঞান নাই। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ, অদ্বৈত আচার্য, রায় রামানন্দ ও স্বরূপাদি পরম জ্ঞানী, পরম কৃষ্ণভক্তগণ সর্বদাই আমাকে ঘিরিয়া রাখেন, আমার যাহা কিছু সামান্য ধন, যেটুকু কৃষ্ণভক্তি সব আমি ইহাদেরই কৃপায় লাভ করিয়াছি, আমার নিজের কোন সম্বলই নাই।' ভক্তগণের মহিমার কথা শ্রবণ করিয়া ভট্ট হয়তো বা কিছুটা বিস্মিত হইলেন। তিনি তাঁহাদের দর্শন করিতে চাহিলে প্রভু ক্রমে ক্রমে সকলের সঙ্গেই তাঁহাকে মিলাইলেন। ভট্টের মনে হইল ইহারা ভক্ত, বৈষ্ণব; কিন্তু সম্ভবতঃ, তাঁহার মতো পাণ্ডিত্য তাঁহাদের নাই। ভক্তের বিনয় ও নম্রতার অন্তরালেও যে শুদ্ধ জ্ঞান লুকাইয়া থাকে, তাহা হয়তো বা ভট্ট বুঝিতে পারিলেন না। তিনি আপন পাণ্ডিত্যের প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাকুল হইয়া একদিন প্রভুকে ভাগবতের স্বকৃত টীকা শুনাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। প্রভু

তাঁহাকে সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিলেন, 'আমি সাধারণ সন্ন্যাসী, নাম জপ করাই আমার ধর্ম, সারা দিনরাত্রি বসিয়া আমি কৃষ্ণনাম জপ করি, তথাপি আমার সংখ্যা পূর্ণ হয় না, ভাগবতের অর্থ শুনিবার আমার অধিকার নাই এবং সময়ও নাই!'

পরম বিজ্ঞের মত ভট্ট বলিলেন, 'ভালোই তো, যে কৃষ্ণনাম আপনি জপ করিতেছেন, সেই কৃষ্ণনামের কত প্রকার অর্থ এবং ব্যাখ্যা আমি করিয়াছি, তাহা শ্রবণ করুন।'

প্রভু বলিলেন, 'শ্যামসুন্দর যশোদানন্দন, আমি কৃষ্ণনামের এই একটি অর্থই জানি; অন্য নাম, অন্য অর্থ আমার জানা নাই এবং তাহাতে আমার প্রয়োজনও নাই।'

বিষণ্ণ ক্ষুব্ধ মনে ভট্ট স্বগৃহে ফিরিয়া গেলেন, তাঁহার মন হইতে 'প্রভুভক্তি' কিছুটা কমিয়া গেল।

প্রভু শ্রবণ না করুন, তাঁহার ভক্তগণও যদি শ্রবণ করেন, তবুও ভট্টের মান রক্ষা হয়, কিন্তু প্রভু যাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, ভক্তগণ কিছুতেই তাহা গ্রহণ করিলেন না।

নৈরাশ্যের চরম সীমায় পৌঁছিয়া ভট্ট এইবার পণ্ডিত গদাধরের নিকটে উপস্থিত হইলেন। গদাধর প্রভুর প্রিয় সখা, নির্বিরোধ নিরীহ ভক্ত। ভট্টের আগ্রহাতিশয্যে ভট্টের ব্যাখ্যা শুনিতে বাধ্য হইলেন, ভট্টকে নিষেধ করিতে তাঁহার আভিজাত্যে বাধিল। প্রভু এবং তাঁহার ভক্তগণকৃত উপেক্ষার কিছুটা প্রতিকার করিতে পারিয়া ভট্টের মন এতদিনে যেন প্রসন্ন হইয়া উঠিল। অপরদিকে প্রভুর ভয়ে, বিশেষতঃ তাঁহার ভক্তগণের ভয়ে পণ্ডিত কম্পিত হইতে লাগিলেন। উভয়সঙ্কটে পড়িয়া অবশেষে পণ্ডিত অগতির গতি কৃষ্ণের শরণ লইলেন।

প্রভুর সভায় ভট্ট উপস্থিত হন এবং প্রায়ই রায় রামানন্দ, অদ্বৈতাদি ভক্তের সঙ্গে নানা কূটতর্কের অবতারণা করেন; উদ্দেশ্য, তাঁহাদের 'লঘু' প্রতিপন্ন করা, কিন্তু নিজেই পরাজিত হন প্রতিবার, তথাপি তাঁহার অহঙ্কার দমিত হয় না। একদিন ভট্ট আচার্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আচার্য! জীবমাত্রেই ঈশ্বরের "প্রকৃতি', তাহাই যদি হয়, তবে আপনারা পতির নাম গ্রহণ করেন কোন ধর্মের বিধানে?'

প্রভুকে দেখাইয়া আচার্য বলিলেন, 'এই যে মূর্তিমান্ ধর্ম আপনার সম্মুখেই বিদ্যমান, তাঁহাকেই জিজ্ঞাসা করুন।'

প্রভু তখন ভট্টের দিকে ফিরিয়া বলিলেন: 'ভট্ট, তুমি পতিব্রতা-ধর্মের মর্ম জানো না, তাই এই অহেতুক প্রশ্ন করিতেছ। "পতির আজ্ঞা নিরন্তর তাঁর নাম লৈতে", অতএব পতির নাম জপ করাই পতিব্রতার ধর্ম এবং তাহার ফল কৃষ্ণপ্রাপ্তি।'

ভট্ট অধৈর্য হইয়া উঠিলেন, আর কত অপমান তিনি সহ্য করিবেন, একদিনও কি তাঁহার জয় হইবে না ?

এইবার ভট্ট নিজের লুপ্তগৌরবের পুনরুদ্ধারে কৃতসংকল্প হইয়া একদিন প্রভুর সভায় উপস্থিত হইলেন। প্রভুর দিকে গর্বিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, 'আমি ভাগবতের যে টীকা রচনা করিয়াছি, তাহাতে শ্রীধরস্বামীর অনেক মত খণ্ডন করিয়াছি, তাঁহার বাক্যে কোনও সামঞ্জস্য নাই, কাজেই আমি স্বামী (শ্রীধরস্বামী) মানি না।'

শুনিবামাত্র প্রভু হাসিয়া উঠিলেন, কিন্তু সেই হাসির অন্তরালে যে বজ্র লুকানো ছিল, ভট্ট তাহা জানিতেন না ; প্রভু বলিলেন, যে নারী স্বামীকে মানে না সে তো সহধর্মিণী নহে, সে স্বৈরিণী।'

স্বামী না মানে যেই জন।
বেশ্যার ভিতর তারে করিয়ে গণন।—চৈঃ চঃ

এই একটি মাত্র চরম কথা বলিয়াই প্রভু নীরব হইলেন। রুদ্ধনিঃশ্বাসে ভক্তগণ বসিয়া রহিলেন নীরবে।

ভট্টের সমস্ত গর্ব চূর্ণ হইল, লজ্জিত নতমস্তকে ভট্ট ফিরিয়া চলিলেন নিজ গৃহে, রজনীর অন্ধকারে নির্জন শয্যাতলে নিজেকে লুকাইয়াও যেন তাঁহার মন সান্ত্বনা পাইল না, ভাবিতে লাগিলেন, কেন এমন হইল, যে প্রভু প্রয়াগে তাঁহাকে এত অনুগ্রহ করিলেন, আজ কেন তাঁহার এই নিগ্রহ? অবশেষে নিজের ভুল বুঝিতে পারিলেন ভট্ট। ইহা যে প্রভুর নিগ্রহ নয়, তাঁহার প্রতি পরম প্রসাদ, তাহা বুঝিতে পারিয়া পরদিন প্রত্যুষে ভট্ট গিয়া প্রভুর চরণে নিজেকে সমর্পণ করিলেন ; তখন প্রসন্ন নির্মল হাস্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল প্রভুর শ্রীমুখ, ভট্টের হৃদয়ও হইয়া উঠিল আনন্দমুখর। ভট্টকে ভক্তিনম্রচিত্তে শ্রীধরস্বামীর আনুগত্যে ভাগবতের টীকা রচনা করিবার আদেশ দিলেন প্রভু।

এদিকে গদাধর বসিয়া আছেন প্রতীক্ষায়, প্রভু কবে ডাকিবেন। প্রভুও ডাকেন না, গদাধরের সাহস হয় না প্রভুর সম্মুখে উপস্থিত হইতে। অন্তরঙ্গগণ হাসিয়া গদাধরকে বলেন, 'তুমিও কেন ক্রোধ প্রকাশ কর না, তবেই প্রভু জব্দ হইবেন।'

জিহ্বা দংশন করিয়া শান্ত গদাধর বলেন, 'ছিঃ ছিঃ! তিনি প্রভু, আমি দাস, তাঁহার সঙ্গে "হঠ" করা আমার উচিত নয়।'

আজ গদাধরেরও ডাক আসিল, হাসিতে কান্নায় আনন্দে গদাধরের হৃদয় ভরিয়া গেল, প্রভুর চরণে প্রণত হইলেন পণ্ডিত। প্রভুর কপট ক্রোধ মুহূর্তে যেন দূর হইয়া গেল, বলিলেন, 'তোমার ক্রোধ দেখিবার জন্য এত করিলাম, কিন্তু কিছুতেই তুমি ক্রুদ্ধ হইলে না, প্রিয়তম গদাধর, তুমি আমাকে কিনিয়া লইলে।'

* * *

রায় রামানন্দ প্রভুর অন্তরঙ্গ সাড়ে তিন জন পাত্রের একজন। তাঁহার পিতা ভবানন্দ রায় ও তাঁহার অপর পুত্রচতুষ্টয়ও রামানন্দের সম্বন্ধেই প্রভুর একান্ত প্রিয়; ভবানন্দ রায়কে পঞ্চপাণ্ডবের পিতা 'পাণ্ডু' বলিয়া প্রভু মান্য করিতেন।

সেই ভবানন্দ রায়ের পুত্র রামানন্দ রায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোপীনাথও উড়িষ্যা রাজসরকারে কাজ করিতেন। রাজসরকারের কিছু অর্থের তিনি অপব্যয় করেন। তখন রাজা প্রতাপরুদ্রের জ্যেষ্ঠপুত্র বড়-জানা সেই অর্থ আদায়ের জন্য তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলেন। কথায় কথা বাড়িতে লাগিল, হঠাৎ গোপীনাথ বড়-জানাকে উদ্ধতভাবে একটি কথা বলিয়া ফেলিলেন।* ক্রুদ্ধ হইয়া বড়-জানা গোপীনাথের প্রাণদণ্ডের আদেশ দান করিলেন।

গোপীনাথকে বধ্যভূমিতে আনা হইল, এক উচ্চ মঞ্চের উপরে তাঁহাকে তোলা হইল, হস্ত পদ বাঁধা, নীচে তীক্ষ্ণধার খড়্গ পাতা, উপর হইতে ফেলিয়া হত্যা করা হইবে।

চারিদিকে সংবাদ রটিয়া গেল, রায়ের আতঙ্কিত ভীত বান্ধবগণ একে একে ছুটিয়া আসিয়া প্রভুর কাছে ভীষণতর সংবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন, কণ্ঠে করুণ আবেদন, 'প্রভু রক্ষা করুন।'

প্রভু স্থির হইয়া বসিয়া আছেন, ক্রমে জানিতে পারিলেন, ভবানন্দ রায়ের অপর পুত্রদেরও বাঁধিয়া আনা হইয়াছে।

---

* গোপীনাথ বড় জানার নিকটে কয়েকটি ভালো অশ্ব বিক্রয় করিবার জন্য আনিয়াছিলেন। তিনি অশ্বের যে মূল্য নির্ধারণ করিলেন, বড় জানা সেই মূল্য দিতে অস্বীকৃত হইয়া অশ্বগুলিকে নিকৃষ্ট বলায় ক্রুদ্ধ হইয়া গোপীনাথ বড়-জানা'কে ব্যক্তিগত আক্রমণ করিলেন। বড় জানার একটি অভ্যাস ছিল, তিনি সব সময়েই তাঁহার ঘাড়টি ডাইনে বাঁয়ে দোলাইতেন, তাহা লক্ষ্য করিয়াই গোপীনাথ শ্লেষ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "হ্যাঁ আমার ঘোড়া আপনার মতো যখন ঘাড় দোলায় না, তখন আর সেই ঘোড়া ভালো হইবে কোথা হইতে?'

তখন প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, কি অপরাধে গোপীনাথের এই কঠোর শাস্তি? অপরাধের কথা শুনিয়া কিছুটা যেন বিরক্ত হইয়াই প্রভু বলিলেন, 'রাজার প্রাপ্য অর্থ রাজা নিশ্চয়ই আদায় করিবেন, আমি নিঃসম্বল বিরক্ত সন্ন্যাসী, আমি ইহার কি করিব?'

ভক্ত বান্ধবগণ রুদ্ধনিঃশ্বাসে প্রতীক্ষা করিয়া আছেন, হয়তো এখনই আশার বাণী, অভয় বাণী উচ্চারিত হইবে প্রভুর মুখ হইতে; কিন্তু যখন শেষ সংবাদ আসিল যে, এই মুহূর্তেই গোপীনাথকে খড়্গের উপর ফেলা হইতেছে, তখনও প্রভুকে নির্বাক নির্বিকার দেখিয়া এইবার স্বরূপাদি অন্তরঙ্গগণ ব্যাকুল হইয়া প্রভুর চরণে মিনতি করিতে লাগিলেন—

প্রভু! রামানন্দ রায়ের গোষ্ঠী, তোমার সব দাস।
তোমার উচিত নহে ঐছন উদাস। —চৈঃ চঃ

শুনিয়া প্রভু ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিয়া বলিলেন, 'তোমাদের সকলের কি ইহাই ইচ্ছা যে, আমি রাজার নিকট গিয়া অঞ্চল পাতিয়া অর্থ ভিক্ষা করি?

তোমা সবার এই মত রাজার ঠাঞি যাঞা,
কৌড়ি মাগি লঙ মুঞি আঁচল পাতিয়া।

না, আমি ভিক্ষুক সন্ন্যাসী, আমি কিছুতেই তাহা পারিব না।' ভক্তগণ আবার মিনতি করিতে লাগিলেন, হয়তো প্রভুর তখন একটু কৃপা হইল, বলিলেন, 'গোপীনাথকে রক্ষা করিতে যদি সকলে এতই ব্যগ্র হইয়া থাকে, তবে যিনি পরম পরিত্রাতা, জগতের নাথ তাঁহার কাছেই গিয়া শরণ গ্রহণ কর।'

প্রভুর শ্রীমুখ হইতে এই বাক্য নিঃসৃত হওয়া মাত্রই রাজপাত্র হরিচন্দন রাজসকাশে উপস্থিত হইয়া গোপীনাথের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা রহিত করিবার অনুরোধ জানাইলেন।

রাজা ইহা শুনিয়া বিস্মিত হইলেন: 'কই আমি তো এই দণ্ডের কথা জানি না, আমার প্রাপ্যই শুধু আমি চাই, গোপীনাথের প্রাণ লইব কেন?' রাজা গোপীনাথের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা রহিত করিলেন। হরিচন্দন বধ্যভূমিতে ছুটিয়া আসিয়া গোপীনাথকে বন্ধনমুক্ত করাইলেন। কতগুলি শ্রেষ্ঠ অশ্ব বিক্রয় করিয়া গোপীনাথও ঋণের অনেকাংশই শোধ করিয়া দিলেন। গোপীনাথও মুক্তি পাইলেন, ভক্ত বান্ধবগণও স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

প্রভু বসিয়া আছেন, এমন সময়ে রাজগুরু কাশীমিশ্র প্রভুর কাছে আসিলেন, প্রভু বিষণ্ণ কণ্ঠে কহিলেন, 'মিশ্র, আমি আর এইস্থানে থাকিব না, আলালনাথে

চলিয়া যাইব। ভবানন্দ রায়ের গোষ্ঠী রাজকার্য করেন, তাঁহারা অপরাধ করিবেন আর লোকে আসিয়া আমাকে বিরক্ত করিবে? বিষয়ীদের কথা শুনিতে শুনিতে আমার মন ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছে, এইরূপ স্থানে থাকিবার আমার বিন্দুমাত্র স্পৃহাও নাই, প্রয়োজনও নাই।' কাশীমিশ্র চিন্তিত হইয়া পড়িলেন, নানাভাবে প্রবোধ দিয়া প্রভুকে আপাততঃ কিছুটা শান্ত করিয়া কাশীমিশ্র নিজগৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে মহারাজা প্রতাপরুদ্র গুরু-সন্নিধানে আসিলে গুরু মহাপ্রভুর নীলাচল-ত্যাগের সঙ্কল্পের কথা জানাইলেন। ক্ষোভে, ভয়ে, বেদনায় রাজার হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল, তিনি বলিতে লাগিলেন, 'গুরুদেব! এ কি নিদারুণ কথা আপনি বলিলেন, কেন প্রভু চলিয়া যাইবেন? তিনি যে আমার কোটি চিন্তামণিতুল্য মহাধন, তাঁহার দর্শন পাইবার জন্য আমি রাজ্য-ধন সমস্তই অনায়াসে বিসর্জন করিতে পারি। তাঁহার চরণের নিছনি লইয়া আমার প্রাণ সমর্পণ করিতেও আমি প্রস্তুত, গোপীনাথের কাছে প্রাপ্য লক্ষ কাহন তো তুচ্ছাতিতুচ্ছ, আপনি প্রভুকে মিনতি করিয়া এইখানে রাখুন।'

কাশীমিশ্র বলিলেন, 'না মহারাজ, প্রাপ্য অর্থ ছাড়িয়া দিয়া গোপীনাথের অন্যায়ের সমর্থন করা প্রভুর অভিপ্রেত নহে, বরং ইহাতে তিনি বিরক্তই হইবেন।'

রাজা ব্যগ্র কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, 'না, না, প্রভুর জন্য আমি প্রাপ্য ছাড়িতেছি, একথা কিছুতেই আপনি প্রভুকে বলিবেন না। ভবানন্দ রায় আমার পরমপূজ্য; তাঁহার পুত্রগণ, বিশেষতঃ রায় রামানন্দ আমার পরম প্রীতিভাজন, তাই আমি তাঁহাদের প্রতি এইটুকু কর্তব্য করিতেছি মাত্র। তাহা ছাড়া আমি জানিতাম না যে, পুরুষোত্তমদেব (বড়-জানা) প্রাণদণ্ডাদেশ দিয়াছেন, সম্ভবতঃ গোপীনাথকে ভয় দেখাইবার জন্যই কুমার এই পরিহাস করিয়াছিলেন।'

মহারাজ প্রতাপরুদ্র গোপীনাথকে সম্পূর্ণ অব্যাহতি দিলেন, অবশিষ্ট ঋণ আদায় করা দূরে থাকুক, গোপীনাথের মাসিক বেতন দ্বিগুণ বর্ধিত করিয়া দিলেন। গোপীনাথকে ডাকিয়া আনিয়া বহুমূল্য রাজপরিচ্ছদে ভূষিত করিয়া সসম্মানে গৃহে পাঠাইয়া দিলেন একটি মাত্র অনুরোধ করিয়া, 'আর যেন তুমি রাজস্বের অপচয় করিও না।'

অত্যন্ত আহ্লাদিত চিত্তে কাশীমিশ্র রাজার এই মহৎ কার্যের কথা যখন প্রভুকে জানাইলেন, মিশ্রের আনন্দকে ধূলিসাৎ করিয়া দিয়া বিষণ্ণ কণ্ঠে প্রভু বলিলেন, 'একি করিলে মিশ্র! আমাকে দিয়া রাজপ্রতিগ্রহ করাইলে?'

বহু কষ্টে কাশীমিশ্র প্রভুকে বুঝাইতে সমর্থ হইলেন, রায়গোষ্ঠীর প্রতি পরম শ্রদ্ধা ও প্রীতির জন্যই মহারাজ এই কার্য করিয়াছেন, প্রভুর জন্য নহে।

প্রভু যেন কতটা আশ্বস্ত হইলেন। পঞ্চপুত্র সঙ্গে করিয়া ভবানন্দ রায় আসিয়া প্রভুর চরণে প্রণত হইলেন। অশ্রুসজল কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, 'প্রভু! কি তোমার বিচিত্র লীলা, কি তোমার অপরিসীম করুণা! কোথায় বধ্যমঞ্চে "মরণ-প্রমাদ", আর কোথায় ঐশ্বর্য লাভ—এই "পরম প্রসাদ"! তোমার চরণ-স্মরণেরই এই ফল! কিন্তু প্রভু! আমি বিষয়ী, অধম, তাই কি তোমার চরণ-স্মরণের গৌণ ফলটিই তুমি আমাকে দিলে, মুখ্য ফল যে তোমার চরণপ্রাপ্তি, তাহা হইতে আমাকে বঞ্চিত করিলে কেন দয়াল?' রামানন্দ ও বাণীনাথকে তুমি গ্রহণ করিয়াছ, কিন্তু আমাকে ফেলিয়া রাখিয়াছ বিষয়কূপে, আমাকেও তুমি বিষয় হইতে মুক্তি দাও!

প্রভু হাসিয়া বলিলেন, 'সকলেই যদি বিষয়বিমুক্ত সন্ন্যাসী হইবে তবে "কুটুম্ববাহুল্য তোমার কে করে ভরণ?" বিষয়ীই হও আর বিরক্তই হও, তোমরা আমার নিজ জন, গার্হস্থ্যাশ্রমে থাকিয়া সৎপথে অর্থ উপার্জন কর, এবং ধর্মার্থে ও পরার্থে তাহা ব্যয় কর, রাজার মূলধন কখনও গ্রহণ করিবে না, আদর্শ গৃহী-ভক্ত হও, ইহাই আমার আদেশ।'

অলঙ্ঘ্য এই আদেশ মাথায় লইয়া রায় ভবানন্দ বিদায় গ্রহণ করিলেন।

কাঁদিতেই প্রভু এইবার আসিয়াছিলেন, জীবের দুঃখে দ্বারে দ্বারে গিয়া 'কৃষ্ণ' বলিয়া কাঁদিয়াছিলেন অধমতারণ পতিতপাবন গৌর! কাঁদিয়া কাঁদিয়া দুই নয়নের পুণ্যস্নিগ্ধ মন্দাকিনীধারায় ধৌত করিয়া দিলেন এই পৃথিবীর মলিনতা, কেবল যেখানে কঠিন অভ্রভেদী পাষাণচূড়া তাহাকেই বিদীর্ণ করিলেন বজ্রদহনে, শুধু ফুল ফুটাইবার জন্য। কঠোরতা ছিল, কিন্তু নির্দয়তা নহে, সেই কঠোরতাই নির্দিষ্ট হইল ছোট হরিদাসের ভাগ্যে।

শ্রীমান্ হরিদাস কিশোর বালক সুন্দর, সুকুমার, সুকণ্ঠ; প্রভুর কীর্তনীয়া। প্রভু তাঁহাকে স্নেহ করেন, ডাকেন 'ছোট হরিদাস' বলিয়া। প্রভুর স্নেহভাজন, তাই সকল ভক্তই তাঁহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসেন। সেই হরিদাসকেই একদিন প্রভু বর্জন করিলেন। নীলাচলে প্রভুর চরণসান্নিধ্যে যে সমস্ত ভক্ত বাস করেন, শ্রী ভগবান আচার্য তাঁহাদের অন্যতম। পরম বৈষ্ণব এই আচার্যকে প্রভুও ভালবাসেন। আচার্য একদিন প্রভুকে আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন। প্রভু উপস্থিত হইয়া দেখেন, আচার্য নানা উপচারে প্রভুসেবার আয়োজন করিয়াছেন। প্রসন্ন

শ্রীমুখে প্রভু প্রসাদ গ্রহণ করিতে বসিলেন, আচার্যের আয়োজনের প্রভূত প্রশংসা করিয়া প্রভু অন্নের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ তো অতি উত্তম অন্ন ; আচার্য, তুমি তণ্ডুল সংগ্রহ করিলে কোথা হইতে ?'

তাঁহার সামান্য সেবার আয়োজনে প্রভু প্রসন্ন হইয়াছেন দেখিয়া আনন্দে আচার্যের অন্তর পূর্ণ হইল ; বলিলেন, 'মাধবী দাসীর নিকট হইতে এই শালিধান্যের তণ্ডুল চাহিয়া আনিয়াছি।'

প্রভু আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে গিয়া তণ্ডুল চাহিয়া আনিয়াছে ?'

অকপট দ্বিধাহীন হৃদয়ে আচার্য বলিলেন, 'ছোট হরিদাসকে পাঠাইয়াছিলাম, সেই আনিয়াছে।'

প্রভু অন্নের প্রচুর প্রশংসা করিয়া প্রসাদগ্রহণান্তে আপন গম্ভীরায় ফিরিয়া আসিলেন ; আসিয়াই স্বরূপ, গোবিন্দকে ডাকিলেন এবং গম্ভীর কঠোরস্বরে আদেশ দিলেন, 'ছোট হরিদাস যেন আমার সম্মুখে আর না আসে, আজ হইতে তাহার 'দ্বার মানা'। প্রভুর কণ্ঠস্বরে যে দৃঢ়তা ও কঠোরতা ফুটিয়া উঠিল, তাহাতে অপরিসীম বিস্মিত হইলেও স্বরূপাদির প্রভুকে কারণ জিজ্ঞাসা করিবার সাহস হইল না। কিন্তু তাঁহারা ভাবিয়াও পাইলেন না, কোন্ অপরাধে বালক হরিদাসের এই দণ্ডবিধান হইল।

হরিদাস এই দণ্ডাজ্ঞা শ্রবণ করিলেন। নিরপরাধ সরল কিশোর, তিনি তো জানেন না, তাঁহার কি অপরাধ ! প্রভুর দ্বার দিয়া প্রবেশের আর অধিকার রহিল না, প্রভুকে আর তাঁহার কীর্তন শ্রবণ করাইবার সাধ্য রহিল না। হরিদাস দুঃখ ও বেদনায় মুহ্যমান হইয়া গেলেন। তিন-চার দিন কাটিয়া গেল, ধূলিশয্যায় পড়িয়া আছেন আহারনিদ্রাবিহীন হরিদাস, দেহ ক্রমেই ক্ষীণ হইতেছে। হরিদাসের দুর্দশা-দর্শনে ভক্তগণের হৃদয়ও ভাঙিয়া পড়িতেছে, ভয়ে ভয়ে তাঁহারা প্রভুর কাছে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা প্রভুকে মিনতি করিয়া বলিলেন, 'প্রভু ! হরিদাস শিশু, তোমার বালক, না জানিয়া যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকে, তবে তাহার তো যথেষ্ট দণ্ড হইয়াছে, এইবার তাহাকে ক্ষমা কর। তাহাকে ডাকিয়া লও।'

প্রভু কঠোর কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন—

…বৈরাগী করে প্রকৃতি-সম্ভাষণ
দেখিতে না পারি আমি তাহার বদন।
(তার মুখ কভু আমি না করি দর্শন।) —চৈঃ চঃ

সাধারণ ক্ষুদ্র জীব ; বৈরাগ্যের ভান করিয়া আসলে ইন্দ্রিয়-লালসা চরিতার্থ করিয়া বেড়ায়—

'ক্ষুদ্র জীব সব মর্কট-বৈরাগ্য করিয়া।
ইন্দ্রিয় চরাঞা বুলে প্রকৃতি সম্ভাষিয়া॥ —চৈঃ চঃ

ইহাদের জন্য তোমরা পুনরায় কোন অনুরোধ আমাকে করিও না।'

বিস্ময়বিমূঢ় চিত্তে ভক্তগণ ভাবিতে লাগিলেন, 'প্রকৃতি-সম্ভাষণ' ইন্দ্রিয়-লালসা চরিতার্থতা!—কোথায় কবে হরিদাস এই হীন অপরাধে অপরাধী হইলেন?

কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে অবশেষে জানিতে পারিলেন, কেই বা সে 'প্রকৃতি' এবং কিরূপে বা কেন হরিদাস তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়াছিলেন।

শিখি মাহাতীর ভগ্নী মাধবী দাসী, বৃদ্ধা পরম ভক্তিমতী পরম বৈষ্ণবী। প্রভু তাঁহাকে শ্রীমতী রাধিকার পরিবারভুক্ত বলিয়াই জানেন, 'প্রভু লেখা করে যারে রাধিকার গণ'। প্রভুর লক্ষ লক্ষ ভক্তের মধ্যে প্রভু মাত্র সাড়ে তিন-জনকেই 'পাত্র' অর্থাৎ রাগানুগা-ভজনের উচ্চাধিকারী বলিয়া মনে করিতেন। শিখি মাহাতী, রায় রামানন্দ, স্বরূপ দামোদর এবং এই মাধবী দাসী। স্ত্রীলোক বলিয়া তাঁহাকে 'অর্দ্ধ'জন ধরা হইত।

এই মহামান্যা বৃদ্ধা পরম বৈষ্ণবীর নিকটেই ভগবান্ আচার্য হরিদাসকে পাঠাইয়াছিলেন ; হরিদাস উপযাচক হইয়া যান নাই। মাতৃতুল্যা এই নারীর প্রতি ভক্তি ছাড়া অপর কোন ভাবের উদয় হওয়া হরিদাসের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। তথাপি প্রভু তাঁহাকে যে দণ্ড দিলেন, স্বরূপ প্রভৃতির মনে হইল, তাহা অতিরিক্ত কঠোর হইয়াছে। সুকুমার এই কিশোরটিকে সকলেই প্রাণাধিক স্নেহ করিতেন। প্রভুর কঠোরতায় এই কুসুমটি ম্লান হইয়া যাইতেছে ; ভক্তগণ পুনরায় প্রভুর কাছে উপস্থিত হইলেন। কণ্ঠে করুণ মিনতি, ভক্তগণ প্রভুকে বলিলেন, 'প্রভু, না জানিয়া হরিদাস অপরাধ করিয়াছে, তুমি দয়া কর, নতুবা এই কোমল প্রাণটি অচিরে ধ্বংস হইয়া যাইবে।'

আবার বজ্রকঠোর হইল প্রভুর স্বর, বলিলেন, 'তোমরা যে যার নিজের কাজে যাও, পুনরায় যদি তাহার সম্বন্ধে একটি কথা বলো, তবে আমাকে আর এখানে দেখিতে পাইবে না।'

মহাভয় ও লজ্জায় কর্ণে হস্ত দিয়া ভক্তগণ নিজ নিজ কার্যে চলিয়া গেলেন।

দিন যায়, কিন্তু প্রভুর ক্রোধ প্রশমিত হয় না, হরিদাস ক্রমেই ক্ষীণ হইতে লাগিলেন। নিরুপায় ভক্তগণ অধীর চিত্তে ছুটিয়া গেলেন শ্রীপাদ পরমানন্দ পুরীর

কাছে। পুরী গোস্বামী প্রভুর গুরু শ্রীপাদ ঈশ্বর পুরীর গুরুভ্রাতা, শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরীর পরমপ্রিয় শিষ্য। প্রভু এই সম্পর্কে পরমানন্দজীকে গুরু-বুদ্ধিতেই শ্রদ্ধা করেন। ভক্তগণও অবশেষে তাঁহাকেই প্রভুর কাছে পাঠাইলেন, হয়তো প্রভু পুরীজীর বাক্য অমান্য করিবেন না।

ভক্তগণের আগ্রহাতিশয্যে পুরীজী মহাপ্রভুর কাছে উপস্থিত হইলেন। প্রভু বসিয়া আছেন একা, শুভ সুযোগ পাইয়া পুরীজী ভয়ে ভয়ে হরিদাসের প্রতি প্রসন্ন হওয়ার জন্য প্রভুর কাছে আবেদন জানাইলেন। শুনিবামাত্রই প্রভু উঠিয়া দাঁড়াইলেন, যুক্তকরে পুরীজীকে বলিলেন, 'গোসাঞি। এই নীলাচলে ভক্তগণকে লইয়া আপনি বাস করুন। আমাকে আজ্ঞা দিন, আমি আলালনাথে চলিয়া যাই। গোবিন্দকে মাত্র সঙ্গে লইয়া আমি সেখানে থাকিব।' বলিয়া পুরীজীকে দ্বিতীয় কথা বলিবার অবসর না দিয়াই গোবিন্দকে ডাকিয়া লইয়া পথের দিকে যাত্রা করিলেন, যাত্রাকালে পুরীজীকে দ্রুত নমস্কারও করিয়া গেলেন।

স্তম্ভিত পুরীজী সম্বিৎ লাভ করিয়া দ্রুতচরণে প্রাণাধিক শিষ্যোপম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কাছে ছুটিয়া গেলেন, ব্যাকুল বাহু বাড়াইয়া প্রভুর হস্ত ধারণ করিলেন। বহু অনুনয়ে কোনক্রমে প্রভুকে ঘরে আনিয়া পুরীজী বলিলেন, 'তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তুমি যাহা ভাল বুঝ তাহাই কর, তোমার কথার উপরে কে কি বলিতে পারে ?'

> লোকহিত লাগি তোমার সব ব্যবহার।
> আমি সব না জানি গম্ভীর হৃদয় তোমার ॥ —চৈঃ চঃ

পুরীজী নিজ কুটিরে ফিরিয়া গেলেন, প্রতীক্ষমাণ ভক্তগণ নিরাশায়, ক্ষোভে অস্থির হইয়া উঠিলেন—'উপায় কি ?'

অবশেষে স্বরূপ গোস্বামী বহু সান্ত্বনা ও আশ্বাস দিয়া হরিদাসকে উঠাইলেন; বলিলেন, 'প্রভু ক্রোধ করিয়া আছেন, তাঁহার উপরে অভিমানে দুঃখে তুমিও যদি এইরূপ "হঠ" কর, তাহা হইলে প্রভুর ক্রোধ আরও বাড়িয়া যাইবে।' ভক্তগণের অনুরোধে ও আদেশে হরিদাস উঠিয়া স্নান-ভোজন করিলেন। অধীর প্রতীক্ষায় কাল কাটাইতেছেন হরিদাস, কবে প্রভুর ক্ষমা, প্রভুর করুণা নামিয়া আসিবে তাঁহার জীবনে! কিন্তু কোথায় সেই নবজলধরের কৃপামৃতবর্ষণ, ঊষর মরুভূমি যে বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে! দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, ক্রমে বৎসরও অতিক্রান্তপ্রায়—প্রাণারামের আহ্বান আসিল না। দূর হইতে তৃষিত নয়নে হরিদাস প্রভুর গমনপথের দিকে চাহিয়া থাকেন, তবুই অশ্রুভরা নয়নের তৃষ্ণা না মিটিতেই

দয়িত চলিয়া যান দূরে। হরিদাসের এই দণ্ড ভক্তগণ দেখিতেছেন আর ত্রাসে ভয়ে সকলের হৃৎকম্প হইতেছে।

দেখি ত্রাস উপজিল সব ভক্তগণে।
স্বপ্নেও ছাড়িল সবে স্ত্রী-সম্ভাষণে। —চৈঃ চঃ

একজন উপলক্ষ, লক্ষ্য সকলে। সমস্ত বৈষ্ণব, ভক্ত, সাধক—সকলেই সতর্ক হইয়া গেলেন, এমনকি গৃহী ভক্তগণও।

বৎসর পূর্ণ হইল, তথাপি যখন প্রভুর কৃপা হইল না, হরিদাসের জীবনে যখন অন্ধকারের পরিবর্তে আর আলো দেখা দিল না, তখন প্রভুর চরণে অলক্ষ্যে একটি প্রণাম রাখিয়া হরিদাস চলিয়া গেলেন কোন্ নিরুদ্দেশের পথে, কেহই তাহা জানিল না।

কিন্তু যাঁহার জানিবার কথা, যিনি সব জানেন, তিনিই জানিলেন, প্রয়াগে গিয়া হরিদাস প্রভুর চরণপ্রাপ্তির সঙ্কল্প করিয়া ত্রিবেণী-সঙ্গমে দেহত্যাগ করিয়াছেন। হরিদাসের ইহা আত্মহত্যা নয়, আত্মাহুতি, প্রভুর চরণলাভমানসে। ভক্তগণ, এমনকি অন্তরঙ্গগণও জানিলেন না, শুনিতেও পাইলেন না সেই গন্ধর্বনিন্দিত স্বর্গীয় কণ্ঠস্বর। গম্ভীর নিশীথে সমস্ত বিশ্ব যখন শুব্ধ, তখন হরিদাস দিব্যদেহে প্রভুর কাছে আসিতেন, কণ্ঠ হইতে ঝরিত সুধাসঙ্গীত, দিব্যানন্দে পুলকিত প্রভু অমৃতরসে মগ্ন হইয়া যাইতেন।

প্রভুর চরণসান্নিধ্য হইতে আর কেহ বিদেহী হরিদাসকে দূরে সরাইতে পারিল না, সেই শাশ্বত মিলনে আর কোন বাধা রহিল না।

এক বৎসর পূর্ণ হইয়া গেলে সহসা যেন মনে পড়িল, প্রভু ভক্তদের বলিলেন, 'হরিদাস কোথায়? তাহাকে আমার কাছে আনো।' বিষাদব্যথিত ভক্তগণ বলিলেন, 'বর্ষপূর্ণ দিনে তিনি কোথায় গিয়াছেন, আমরা তাহা জানি না।'

প্রভু ঈষৎ হাসিয়া নীরব হইয়া রহিলেন। অন্তরঙ্গগণের বিস্ময়ের অবধি রহিল না—প্রভুর হাসিতে কিসের আভাস? প্রভু কি জানেন, হরিদাস কোথায়? একদিন জগদানন্দ, স্বরূপ, গোবিন্দ প্রভৃতি ভক্তসঙ্গে প্রভু সমুদ্রস্নানে গিয়াছেন; অকস্মাৎ যেন সকলের কানে হরিদাসের কণ্ঠসঙ্গীত ভাসিয়া আসিল—দূর হইতে সুরলহরী যেন ভাসিয়া আসিয়া সিন্ধুর তরঙ্গে তরঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া যাইতেছে! একি অদ্ভুত, তবে কি হরিদাস আত্মহত্যা করিয়া প্রেতযোনি প্রাপ্ত হইয়াছেন! ভক্তগণ বিহ্বল হইয়া গেলেন। তীব্র প্রতিবাদ করিয়া স্বরূপ বলিলেন, 'না, না, যিনি আজন্ম কৃষ্ণের নাম কীর্তন করিয়াছেন, যিনি প্রভুর সেবক, তাঁহার কখনও

এইরূপ অধোগতি হইতে পারে না। প্রভু নিশ্চয়ই জানেন হরিদাস কোন্ গতিপ্রাপ্ত হইয়াছেন, আমরাও পরে জানিব।'

এদিকে এক বৈষ্ণব প্রয়াগ হইতে নবদ্বীপে গিয়া প্রয়াগে ত্রিবেণী-সঙ্গমে হরিদাসের দেহত্যাগের কথা জানাইলেন।

গৌড়ীয় ভক্তবৃন্দ ইহার পরে নীলাচলে আসিলেন। ভক্ত শ্রীবাস প্রভুকে হরিদাসের কথা জিজ্ঞাসা করিলে প্রভু একটি কথাই মাত্র বলিলেন 'স্বকর্মফলভুক্ পুমান্' অর্থাৎ স্বকৃত কর্মফল ভোগ করিতেছেন হরিদাস। আত্মহত্যার পাপে হয়তো বা হরিদাস অসদ্গতি লাভ করিয়াছেন, প্রভুর উক্তির এইরূপ তাৎপর্য হইলেও ভক্তগণ বুঝিলেন, প্রভুর প্রিয় সেবক কৃষ্ণনাম-কীর্তনীয়া হরিদাস দেহান্তে দিব্যদেহ লাভ করিয়া প্রভুর চরণাশ্রয়েই রহিয়াছেন।

শ্রীবাস তখন প্রভুকে হরিদাসের প্রাণত্যাগের কথা জানাইলেন, প্রভু হাসিয়া বলিলেন, 'প্রকৃতিদর্শনের প্রায়শ্চিত্ত এইরূপই।'

'বজ্রাদপি কঠোরাণি' প্রভু, কিন্তু ভক্তগণ জানেন, তিনি 'মৃদূনি কুসুমাদপি'; কোথায় যে বজ্রপাত হয়, কোথায়ই বা কুসুম ঝরিয়া পড়ে, কেনই বা পড়ে, দুরধিগম্য প্রভুর চরিত্র হইতে কেহই তাহা নির্ণয় করিতে পারেন না।

শুধু মাত্র 'প্রকৃতিসম্ভাষণ'-রূপ অপরাধে হরিদাসের প্রতি যে দণ্ড হইল, তাহা হইতে রায় রামানন্দের কত অধিক অপরাধের কথা যখন প্রভু জানিতে পারিলেন, কই তখন তো বজ্রাগ্নি জ্বলিয়া উঠে নাই এবং কঠোর রুদ্র দহনে রায় রামানন্দকে তাহা দগ্ধ করে নাই!

প্রদ্যুম্ন মিশ্র নামে এক ব্রাহ্মণ একদিন প্রভুর চরণে প্রণত হইয়া অতি দীনভাবে কৃষ্ণকথা-শ্রবণের বাসনা জানাইলেন। প্রভু বলিলেন, 'বিপ্র! তোমার পরম সুকৃতি ও সৌভাগ্য যে কৃষ্ণকথা-শ্রবণের বাসনা তোমার হইয়াছে। আমি তো কৃষ্ণকথা জানি না, জানেন একমাত্র রায় রামানন্দ, তুমি তাঁহার কাছে যাও, আমিও তাঁহার কাছেই কৃষ্ণকথা শ্রবণ করি।'

মিশ্র রামানন্দ রায়ের গৃহে উপস্থিত হইলেন। রায়ের ভৃত্য মিশ্রকে সসম্মানে আসনে বসাইল। রায়ের দর্শন না পাইয়া মিশ্র ভৃত্যকে তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করিলে ভৃত্য বলিল, 'আপনি একটু বিশ্রাম করুন, রায় একটু পরে আসিবেন।' রায় কোথায় আছেন জানিতে চাহিলে ভৃত্য জানাইল, 'রায় নিজের এক নিভৃত উদ্যানে দুইজন দেবদাসীসহ অবস্থিতি করিতেছেন!' সরল মিশ্র হয়তো বা

চমকিত হইয়া উঠিলেন, তাঁহার চিত্তকে অধিকতর চমৎকৃত করিয়া ভৃত্য বলিল, 'দুইটি পরমাসুন্দরী তরুণী দেবদাসীকে লইয়া এই সময়ে তিনি নিভৃত উদ্যানেই থাকেন এবং প্রতিদিনই তিনি স্বহস্তে তাহাদের অঙ্গ-মার্জন, স্নান, প্রসাধন প্রভৃতি করিয়া তার পরে তাহাদের "জগন্নাথবল্লভ নাটকের" অভিনয় শিক্ষা করান।'

মিশ্র স্তব্ধ নির্বাক হইয়া বসিয়া আছেন আর ভাবিতেছেন, 'প্রভু কি জানেন এই কথা?' প্রভুভক্তগণের অদ্ভুত দুর্জ্ঞেয় মহিমার কতটুকুই বা কে জানেন, বিশেষতঃ রায় রামানন্দের প্রেমভক্তির সীমা নির্ণয় করা মিশ্র তো দূরের কথা বহু সাধকের পক্ষেও অসম্ভব!

শ্রীমতীর দাসী-ভাবে ভাবিত রায়, ব্রজরসের রসিক, সুন্দরী তরুণী-স্পর্শে তাঁহার কি ভয়? ব্রজে পুরুষ একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ আর তো সকলেই শ্রীমতীর দাসী, সখী— রায় নিজেও শ্রীমতীরই দাসী, অভিনয় করিবেন যাঁহারা তাঁহারাও দাসী! কাজেই দেবদাসীদের উপর সেব্যভাব আরোপ করিয়া তিনি তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণলীলার সার্থক অভিনেত্রীরূপে গড়িয়া তুলিতেছিলেন।

নিভৃত উদ্যানে, পরম যত্নে দেবদাসীদ্বয়কে মার্জিত, মণ্ডিত, উজ্জ্বল করিয়া রায় তাঁহাদের ক্রমে সঞ্চারী-সাত্ত্বিকাদিভাব প্রকাশের শিক্ষা দিলেন, জগন্নাথের সম্মুখে অভিনয় করিবার সম্পূর্ণ উপযুক্ত করিয়া তুলিলেন।

তারপর প্রসাদ খাওয়াইয়া রায় দেবদাসীগণকে নিভৃতপথে স্বগৃহে পাঠাইয়া দিয়া এতক্ষণে মিশ্রের নিকটে আসিবার অবসর পাইলেন। বিলম্বের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া লজ্জিত স্বরে রায় মিশ্রকে বলিলেন, 'আমি জানিতাম না আপনি কৃপা করিয়া এই দাসের কুটিরে আসিয়া বসিয়া আছেন, আমার অপরাধ মার্জনা করুন। দয়া করিয়া আদেশ করুন, আপনার জন্য এই অধম কি করিতে পারে!'

বিলম্বের জন্য হয়তো বা মিশ্র বিরক্ত হন নাই, কিন্তু নিভৃত উদ্যানে রায়ের এই সুন্দরী তরুণীর সাহচর্য, মিশ্রের মনের নিভৃতে কোনও রেখাপাত করিয়াছিল কি না কে জানে?

বেলা অধিক হইয়াছে বলিয়া মিশ্র বিদায় গ্রহণ করিলেন, কৃষ্ণকথা শুনিবার বাসনা বোধহয় আর তাঁহার মনে ছিল না, বলিলেন, 'আপনাকে দর্শন করিবার বাসনায় আসিয়াছিলাম, সে বাসনা পূর্ণ হইয়াছে, আমি পবিত্র হইলাম।'

মিশ্র চলিয়া গেলেন, কিন্তু তাঁহার মনের দ্বিধা হয়তো গেল না।

পরদিন প্রভুর সম্মুখে মিশ্র উপস্থিত হইলেন। প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'রায়ের নিকট হইতে কেমন কৃষ্ণকথা শ্রবণ হইয়াছে, মিশ্র?'

মিশ্র অকপটে প্রভুর কাছে 'রায়ের বৃত্তান্ত' সমস্তই বলিলেন, হয়তো বা তাঁহার সংশয়-নিরসনেরও প্রয়োজন ছিল।

মিশ্র এই কথা বলিবামাত্রই প্রভু বলিলেন, 'আমি তো সন্ন্যাসী, নিজেকে আসক্তিশূন্য বলিয়াই অভিমান করিয়া থাকি, নারী-দর্শন দূরে থাকুক, নারীর নাম শুনিলেই আমার মন চঞ্চল হইয়া উঠে, আর স্ত্রী-দর্শন ও স্পর্শনে স্থির থাকা কি কাহারও পক্ষে সম্ভব? কিন্তু কি অদ্ভুত, অবর্ণনীয় রায় রামানন্দের চরিত্র, কি তাঁহার অপূর্ব সাধনা। শুধু সাধারণ নারী নহে, একে দেবদাসী তাহাতে অসাধারণ সুন্দরী তরুণী, তাহাদের অঙ্গ-সেবন-মার্জন-ভূষণ করিয়াও তাঁহার চিত্তে কোনও বিকারের উদয় হয় না—'

নির্বিকার দেহ-মন কাষ্ঠপাষাণসম।
আশ্চর্য তরুণীস্পর্শে নির্বিকার মন॥
এক রামানন্দের হয় এই অধিকার।
তাতে জানি—অপ্রাকৃত দেহ তাঁহার॥ —চৈঃ চঃ

রায়ের মহিমা ও অসাধারণত্বের কথা প্রভু যেন শতমুখে বলিয়াও শেষ করিতে পারিতেছেন না। বলিতেছেন, 'রায়ের ভজন রাগানুগা, শুদ্ধব্রজরসের রসিক রায় রামানন্দ। তিনি শ্রীমতীর সখী, এই তাঁহার সাধনা এবং ইহাই তাঁহার সত্তা। অপ্রাকৃত সিদ্ধতনু তাঁহার, তাঁহাতে প্রাকৃত ভাবের লেশমাত্র নাই।'

রায় নিজের জীবনে শ্রীমদ্ভাগবতের বাণীর পূর্ণ রূপ দান করিয়াছেন।

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ। —ভাঃ ১০।৩৩।৩৯

'যিনি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া ব্রজগোপীগণের সহিত শ্রীকৃষ্ণের এই সমস্ত রাসলীলাদির কথা নিরন্তর শ্রবণ করেন ও বর্ণন করেন, অবিলম্বেই তিনি ধীর অচঞ্চল হইয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সর্বোত্তমা ভক্তি প্রতিক্ষণে নবতররূপে লাভ করিয়া শীঘ্রই হৃদ্রোগ কামকে পরিত্যাগ করেন।' 'সত্যই', প্রভু আনন্দোজ্জ্বল স্মিত মুখে বলিয়া উঠিলেন, 'রায়ের দেহ-মন-চিত্তে অপ্রাকৃত কামের বিন্দুমাত্র অধিকার নাই, অপূর্ব অলৌকিক রায়ের ভজন, সাধারণের ইহাতে প্রবেশেরও অধিকার নাই।' প্রভু যেন বর্তমান ভবিষ্যতের সমস্ত ভক্তকে সাবধান করিয়া দিলেন, 'এক রামানন্দের হয় এই অধিকার।' অন্যের কি কথা, স্বয়ং প্রভুরও যেন এই অধিকার নাই। কাজেই, রাগানুগা মার্গে

ভজন করিতে গিয়া রায়ের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলে নিম্ন-অধিকারী তো দূরের কথা অনেক উচ্চ-অধিকারীরও যে ধ্বংস অনিবার্য প্রভু তাহা সুস্পষ্ট ভাবেই ঘোষণা করিলেন।

তারপর মিশ্রের দিকে ফিরিয়া প্রভু বলিলেন, 'মিশ্র! আমি রায়ের নিকট হইতেই কৃষ্ণকথা শ্রবণ করি, তোমার সত্যই যদি কৃষ্ণকথা শ্রবণের বাসনা হইয়া থাকে তবে পুনরায় সেই পরম রসবেত্তার নিকটেই যাও, আমার নাম করিও তবেই তোমার বাসনা পূর্ণ হইবে।'

নিঃসংশয়িত, আনন্দিত চিত্তে মিশ্র এইবার রায়ের কাছে গিয়া দীনাতিদীন হইয়া বসিলেন কৃষ্ণকথা শ্রবণের আশায়। রায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি কথা, শ্রীকৃষ্ণের কোন লীলামাধুর্যের কথা মিশ্র শ্রবণ করিতে চাহেন?'

সরল বিপ্র বলিলেন, 'রায়! আমি অতি সাধারণ ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ, ভালো-মন্দ কোনও প্রশ্নই আমি জিজ্ঞাসা করিতে জানি না, আপনি কৃপা করিয়া আমাকে ক্রমে ক্রমে লীলারস আস্বাদন করান, ইহাই আমার প্রার্থনা।'

> তবে রামানন্দ ক্রমে কহিতে লাগিলা।
> কৃষ্ণকথারসামৃতসিন্ধু উথলিলা॥
> আপনে প্রশ্ন করি পাছে করেন সিদ্ধান্ত।
> তৃতীয় প্রহর হৈল, নহে কথা-অন্ত। —চৈঃ চঃ

কৃষ্ণরসামৃতবারিধিতে তরঙ্গলহরী উঠিতে লাগিল একের পর এক, বক্তা-শ্রোতা উভয়েই সেই সিন্ধুতে, সেই তরঙ্গলীলায় নিমজ্জিত হইয়া রহিলেন, আত্মস্মৃতিও যেন রহিল না।

অবশেষে, বেলা যায় দেখিয়া ভৃত্য আসিয়া রায়কে ডাকিলে দুইজনেরই আবিষ্ট চৈতন্য ফিরিয়া আসিল, রায় কৃষ্ণকথা সমাপন করিলেন।

কৃতার্থ, ধন্য হইয়া মিশ্র ফিরিয়া আসিলেন, প্রভুর চরণে হৃদয়ের নবলব্ধ আনন্দ উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিয়া বলিলেন, 'প্রভু! তুমি আমাকে পরম কৃতার্থ করিলে, পরমধনে আজ তুমি আমাকে ধনী করিয়াছ দয়াল! কি বলিব রামানন্দ রায়ের কথা, তিনি তো স্থূল দেহধারী মানব নহেন, তিনি শুদ্ধ কৃষ্ণরসময়! ব্রহ্মারও অগোচর এই রস আজ তুমিই আমাকে পান করাইলে। তোমার চরণে জন্ম-জন্মান্তরের জন্যই আমি মাথা বিকাইলাম।

'প্রভু! আমি রায়ের মহিমা জানিতাম না, তুমি ছাড়া তোমার ভক্তের মহিমা কে-ই বা জানে? তুমি স্বয়ং কৃষ্ণ, রায় আমাকে বলিয়াছেন "মিশ্র! আমাকে

তুমি কৃষ্ণকথার বক্তা বলিয়া মনে করিও না, আমি বীণাযন্ত্র, প্রভু সেই বীণাযন্ত্রধারী প্রভুই জানেন কোন সুরে তাঁহার বীণা বাজে।" '

প্রভু হাসিয়া বলিলেন, 'না, না মিশ্র, আমি কিছুই জানি না,

…রামানন্দ বিনয়ের খনি।

আপনার কথা পরমুণ্ডে দেন আনি॥' —চৈঃ চঃ

প্রভু কিছুই জানেন না, সাধারণ মায়াবাদী সন্ন্যাসী', 'ভিক্ষুক'; নিজের সম্বন্ধে ইহাই প্রভু বলেন। সন্ন্যাসের যত কঠোরতা, যত বিধি সমস্তই সযত্নে পালন করেন এমনকি অন্যের বাক্যদণ্ড পর্যন্ত অম্লানবদনে সহ্য করেন। নীলাচলে একটি সুন্দর শিশুকে প্রভু ভালোবাসিতেন, হয়তো শ্যামল শিশুটিকে দেখিয়া তাঁহার গোপালের স্মৃতি হইত, শিশুটি প্রভুর কাছে প্রতিদিনই আসিত। দামোদর ব্রহ্মচারী প্রভুর প্রিয়, হিতৈষী। তিনি একদিন বিরক্তস্বরে বলিলেন, 'প্রতিদিন এই বালক কেন তোমার কাছে আসে আর তুমিই বা ইহাকে এত প্রশ্রয় দাও কেন? তুমি স্বতঃ ঈশ্বর, জানি তোমার কোনও দোষ হয় না, কিন্তু লোকনিন্দা গ্রাহ্য না করিয়া চলিতে পারিবে কি? তুমি জানো না এই বালক যে এক সুন্দরী যুবতী বিধবার পুত্র? প্রতিদিন এই বালক তোমার কাছে আসে, লোকের চোখে তাহাতে তোমার মর্যাদা ও গৌরব নিশ্চয়ই খুব বাড়িতেছে না।'

প্রভু চমকিত হইলেন, এসব কি বলিতেছেন দামোদর? কিন্তু তখনই মানিয়া লইলেন ঐ শাসন, বালক আর আসিল না।

যিনি স্বয়ং কৃষ্ণ, যাঁহার বিধানে সমস্ত বিধি নিয়ন্ত্রিত, তিনি নিজেকে নিয়ন্ত্রিত করিলেন সন্ন্যাসের কঠোর বিধানে। অন্তরঙ্গগণ, বিশেষতঃ স্বরূপ, গোবিন্দ জগদানন্দের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইত, তথাপি প্রভুর কঠোর নিয়ম এতটুকু শিথিল হইত না।

গম্ভীরার কঠিন পাষাণ-ভিত্তিতলে সুকুমার তনুখানি লুণ্ঠিত হইত, কৃষ্ণ-বিরহের অসহ্য যন্ত্রণায় পাষাণে যখন মাথা ঠুকিতে থাকিতেন, আঘাতে আঘাতে রুধিরাক্ত হইত সমস্ত অঙ্গ, তথাপি দূরে ঠেলিয়া দিতেন জগদানন্দের সামান্য সেবার আয়োজন গৈরিক বস্ত্রাবৃত করিয়া সামান্য একটি তুলার শয্যা পাতিয়া দিয়াছিলেন পণ্ডিত জগদানন্দ প্রভুকে নিষ্ঠুর পাষাণের আঘাত হইতে বাঁচাইবার আশায়। শয্যাটি দেখা মাত্র ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন প্রভু। 'শুধু শয্যা কেন, পালঙ্ক আনো, মার্দনীয়া আনো ভৃত্য রাখো আমার সেবার জন্য; তবেই না আমার সন্ন্যাসব্রত পূর্ণ হইবে?'

কত কষ্টে, কত যত্নে আগ্রহে চন্দনতেল লইয়া পদব্রজে গৌড় হইতে পণ্ডিত

নীলাচলে আসিলেন প্রভুর বিরহতপ্ত মস্তিষ্ক একটু শীতল করিবার আশায়, প্রভু তাহাও প্রত্যাখ্যান করিলেন। সেই তৈলভাণ্ড সবলে ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া অভিমানে বেদনায় পণ্ডিত ঘরে দ্বার দিয়া উপবাসী রহিলেন তিন দিন। তবুও প্রভু আপন সঙ্কল্পে অচল হইয়াই রহিলেন। নিজে সাধিয়া পণ্ডিতের ঘরে ভিক্ষা করিয়া পণ্ডিতের উপবাস ভঙ্গ করিলেন, কিন্তু তাঁহার কঠোর নিয়ম ভঙ্গ হইল না একচুল।

অথচ, শ্রীপাদ নিত্যানন্দ, যিনি কৈশোরাবধি অবধূত, প্রভুর বহু পূর্বেই যিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার জন্য প্রভুর কি অপরিসীম উদার বিস্তৃতি।

শ্রীপাদ নিত্যানন্দ আর শ্রীগৌরাঙ্গ বস্তুতঃ একই তত্ত্ব—নিত্যানন্দ অনন্ত সঙ্কর্ষণ বলরাম, প্রভু শ্রীকৃষ্ণ ; একই লীলার দুই দেহ-ভেদে দুই রূপ-প্রকাশ। কিন্তু নিজের বেলায় যেখানে এত কঠোরতা এত বিধি-নিষেধ, নিত্যানন্দের বেলায় সেখানেই এত ঔদার্য। কি উদ্দেশ্যে, কি প্রয়োজনে নিত্যানন্দকে গৌড়ে পাঠাইলেন, প্রভুই জানেন কেনই বা গৃহস্থধর্ম পালনের আদেশ নিত্যানন্দকে দিলেন!

গৌরপ্রেমে পাগল নিতাই নীরবে গৌরের আদেশ মাথায় তুলিয়া লইয়া চলিয়া আসিলেন গৌড়ে, লোকলজ্জা তথা লোকনিন্দাকে অগ্রাহ্য করিয়া। দ্বারে দ্বারে গিয়া স্পৃশ্য অস্পৃশ্য নির্বিচারে দয়াল নিতাই গৌরপ্রেম বিলাইয়া গেলেন দুই হাতে।

কেহ কেহ নীলাচলে গিয়া প্রভুর কাছে অভিযোগ করিতে লাগিল, 'এ কি অনাচার! সন্ন্যাসী নিত্যানন্দের অঙ্গে কেন অলঙ্কার-বসন-ভূষণ, কেন তাঁহার যত্র তত্র বিচরণ ও সকলের গৃহে অন্নগ্রহণ ?'

পরম নির্ভয় ও বিশ্বাসে প্রভু বলিলেন—

নিত্যানন্দ স্বরূপ পরম অধিকারী,
অল্পভাগ্যে তাঁহারে জানিতে নাহি পারি।
পতিতের ত্রাণ লাগি তাঁর অবতার,
তাঁহা হৈতে সর্ব জীব পাইবে উদ্ধার।
তাঁহার আচার বিধি নিষেধের পার,
তাঁহারে বুঝিতে শক্তি আছয়ে কাহার।

ভাগবতকার শ্রীব্যাসদেবও মরণব্রতী মহারাজ পরীক্ষিতের মুখ দিয়া ব্রহ্মর্ষি শুকদেবকে এই প্রশ্নই করিয়াছিলেন একদিন, যিনি পরমপুরুষ, ধর্ম-সংস্থাপনের জন্য যিনি অবতীর্ণ হইয়াছিলেন সেই শ্রীকৃষ্ণ কেন রাসাদি ক্রীড়া করিলেন! শুকদেব অন্যান্য যুক্তি দিয়া সর্বশেষে বলিয়াছিলেন, "যিনি স্বয়ং বিধাতা, বিশ্বপতি, পরমাত্মস্বরূপ,

তিনি গোপীগণ এবং সকলেরই পতি, তাঁহার পক্ষে "পরস্ত্রী" কেহই নহেন। তিনি আত্মারাম, আত্মাস্বরূপে বিহারই তাঁহার লীলা, রসস্বরূপের রাস।'

প্রভুও বলিলেন, শ্রীমন্নিত্যানন্দ বিধি-নিষেধের পার, তাঁহার তত্ত্ব না জানিয়া তাঁহার বিচার করা অপরাধ। তাই চরম কথা বলিলেন :

মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে.
তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য কহিল তোমারে।

যেমন দুরধিগম্য প্রভুর চরিত্র তেমনি দুরবগাহ তাঁহার লীলা! স্ত্রীলোক-দর্শন-স্পর্শন দূরে থাকুক, যিনি 'স্ত্রী' শব্দ পর্যন্ত উচ্চারণ করিতেন না, সন্ন্যাসের পূর্বেই নবদ্বীপে এক ব্রাহ্মণী তাঁহার পদস্পর্শ করায় যিনি গঙ্গায় ডুবিয়া আত্মহত্যা করিতে গিয়াছিলেন, তাঁহারই মুখে এই কথা।

অন্তরে যিনি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ, কিন্তু রাধাভাবকান্তিসুবলিত যাঁহার গৌরতনু, আবার সেই গৌরতনুখানিও আবৃত বৈরাগ্যের গৈরিক বসনে, তিনি বুদ্ধির অগম্য মন তাঁহার নাগাল পায় না, প্রাণ জানে না কোথায় সেই প্রাণারাম শুধু চাহিয়া আছে পরমলগ্নের প্রতীক্ষায়, কবে দক্ষিণা বাতাস বহিয়া আনিবে তাঁহার চরণের ধুলি, কবে সেই কৃপার স্পর্শে সফল হইবে জীবন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুকৃত 'শিক্ষাষ্টকে'র রূপায়ণ

বিচ্ছিন্ন এক একটি ইষ্টকখণ্ড, কিন্তু যিনি শিল্পী, যিনি রূপকার, তিনি সেই খণ্ডাংশগুলি লইয়াই রচনা করেন একটি সুন্দর অখণ্ড বিচিত্র সৌধ। মানুষ বিস্ময়ে তাকাইয়া দেখে—বিচ্ছিন্ন খণ্ড ইষ্টকগুলির মধ্যে কোথায় ছিল এই সম্ভাবনা? মহাপ্রভু-কৃত শিক্ষাষ্টকের শ্লোকগুলিও বিচ্ছিন্ন, কিন্তু তিনি সুদক্ষ জীবনশিল্পী; সেই শিক্ষাষ্টকের দ্বারা যে নবরূপায়ণ করিয়াছেন, তাহা অপূর্ব। 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া, দুর্গমং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি', ক্ষুরধার দুর্গম পথের মাঝে মাঝে রচনা করিয়াছেন এক একটি শান্ত শীতল পান্থশালা। কাল তাহাদের স্পর্শ করিতে পারে নাই, একটি ইষ্টকও খসিয়া পড়ে নাই। সেই স্নিগ্ধ শীতল পান্থশালায় আজও আশ্রয়লাভ করিয়া ধন্য হইতেছেন কত শত শত সংসার-দাবদগ্ধ অসহায় পান্থ।

নীলাচলে গম্ভীরার ভিত্তিতলে গৌরদেহখানি লুণ্ঠিত হইতেছে, বিরহ-দহনে সুকুমার তনু ক্ষীণ শীর্ণ, লীলা অবসানপ্রায়।

জগৎকে যাহা দিবার ছিল, দেওয়া হইয়াছে, তবু বুঝি কিছু আছে বাকি!

স্বরূপ ও রামরায় দুই অন্তরঙ্গের সঙ্গে দিব্যোন্মাদের প্রলাপ কহিতে কহিতেই যেন কদিন একটু বাহ্যজ্ঞান হইল, জগতের দিকে তাকাইলেন করুণাঘণ শ্রীমন্মহাপ্রভু। লিহত আর্তজীবের ব্যথার ছোঁওয়া বুঝি আঘাত করিল অন্তরে, যেন এই ব্যথার ান্তি, মৃত্যুর অন্ধকারে অমৃতের আলোক সহসা অন্তরে লাভ করিলেন, তাহাই গৎকে দুই হাত ভরিয়া বিলাইবার বাসনা জাগিল মনে। তাই—

হর্ষে প্রভু কহে শুন! স্বরূপ রামরায়,
নাম-সঙ্কীর্তন কলৌ পরম উপায়।

লিতে বলিতেই একে একে আটটি শ্লোক রচনা করিলেন। 'আপনি আচরি ধর্ম ীবেরে শিখায়'; বৃদ্ধা শোকাতুরা জরাতুরা মাতা, কিশোরী কমলকলিকা বধূ ষ্ণুপ্রিয়া, সোনার নবদ্বীপ, নবদ্বীপের আনন্দমুখর কীর্তন, প্রিয়তম ভক্ত, পাণ্ডিত্য, শ্বর্য, সমস্তই তো ত্যাগ করিয়াছেন জগতের জীবকে শিক্ষা দিবার জন্য—দ্বাদশবর্ষ যাপিয়া গম্ভীরায় কক্ষ প্রকোষ্ঠে চলিয়াছে সুতীব্র কৃষ্ণ-বিরহের দহন!

এই প্রেমার আস্বাদন তপ্ত-ইক্ষু-চর্বণ
মুখ জ্বলে, না যায় ত্যজন।
এই প্রেমা যার মনে, তার বিক্রম সে-ই জানে
বিষামৃতে একত্রে মিলন। —চৈঃ চঃ

াষের জ্বালায়, কৃষ্ণ-বিরহের আর্তিতে দেহ-ইন্দ্রিয় ভাঙিয়া চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইতেছে, বু বিরহ-ক্রন্দনের বিরাম নাই, ইহাও তো জগতেরই শিক্ষার জন্য! তবু জীব াখিল না, জানিল না ব্যথা কোথায়! কৃষ্ণ-বহির্মুখ জীবের হৃদয়ে বিরহের ব্যথা াগিল না, তাই আজ বুঝি আবার নিরুপায় জীবের দিকে তাকাইলেন প্রভু, শান স্বরূপ! শোন রামরায়! নাম-সঙ্কীর্তনই হইল কলির জীবের পরম উপায়।' লিলেন—

চেতোদর্পণমার্জনং ভবমহাদাবাগ্নিনির্বাপণম্
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনম্।
আনন্দাম্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনম্
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্তনম্॥

—মহাপ্রভু-রচিত প্রথম শ্লোক

—যাহা চিত্তরূপ দর্পণকে মার্জিত করে, যাহা সংসার-তাপরূপ মহাদাবানলকে নির্বাপিত করে, যাহা মঙ্গলরূপ কুমুদকে জ্যোৎস্না বিতরণ করে, যাহা বিদ্যারূপ

বধুর জীবন-স্বরূপ, যাহা আনন্দ-সমুদ্রকে বর্ধিত করে, যাহার প্রতি পদে-পদেই পূর্ণামৃতের আস্বাদন, অবগাহনস্নানের মতো যাহা সর্বাত্মার তৃপ্তিজনক, সেই শ্রীকৃষ্ণ-নামসঙ্কীর্তন সর্বোৎকর্ষে বিজয় করিতেছেন। পূর্বেও বহুবার নারদীয় ভক্তিসূত্রের উল্লেখ করিয়া নিজে প্রণালী দেখাইয়া দিয়া জীবকে,

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।

এই শ্লোক কীর্তন করাইয়াছেন, কণ্ঠস্থ করাইয়াছেন। কলিতে ভক্তি তথা নাম-সাধন ছাড়া যে জীবের গতি নাই, তাহা তিনি বারবার বলিয়াছেন। শুধু পুরাণ বা ভক্তিশাস্ত্রই যে নামের মহিমা ঘোষণা করিয়াছেন তাহা নয়, বেদ-বেদান্ত-শ্রুতিতেও সাধনা বা উপাসনার শ্রেষ্ঠ উপায় হিসাবে নামকেই প্রধান স্থান দেওয়া হইয়াছে। তৈত্তিরীয় শ্রুতি বলেন—

ওম্ ইতি ব্রহ্ম, ওম্ ইতি ইদং সর্বম্'

কঠ-উপনিষদ্ বলেন—

এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ

অর্থাৎ, এই প্রণবের অক্ষরকে জানিলেই যিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তিনি তাহা পাইতে পারেন। আত্মতত্ত্ব অথবা ব্রহ্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু নচিকেতাকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষাদানের সময়ে ধর্মরাজ বলিলেন, 'হে ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানাভিলাষী মহান্ নচিকেতা, শ্রবণ কর—

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥

—এই ওঙ্কার তথা প্রণবই শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। এই অবলম্বনকে জানিয়া সাধক ব্রহ্মলোকে মহীয়ান্ হন। এই শ্রুতি-বাক্যের ভাষ্যে শ্রীশঙ্করাচার্য লিখিয়াছেন, 'যত এবম্, অতএব এতদালম্বনং ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যবলম্বনানাং শ্রেষ্ঠং প্রশস্যতমম্।'—ব্রহ্মপ্রাপ্তির যত রকম সাধন আছে, ব্রহ্মের বাচক নামের আশ্রয়গ্রহণই তাহাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং প্রশস্ততম। যেমন ব্রহ্ম ও তাঁহার বাচক 'ওম্', তেমনই রসঘন-সচ্চিদানন্দ শ্রীকৃষ্ণ এবং সমস্ত ভগবৎস্বরূপেরই সাধন, 'নাম'। নাম ও নামী অভেদ। 'একোঽহং বহু স্যাম,' একই ব্রহ্মের বহু বিচিত্র প্রকাশ ও বহু নাম, সমস্তই অভিন্ন। নামীর সমগ্র শক্তি, মাধুর্য, করুণা, সমস্তই নামে ন্যস্ত। তথাপি নামী হইতেও নামের করুণা যেন অধিক। নামীর দর্শন বা অনুভূতি-লাভ সাধকের ইচ্ছাধীন নয়—বহু আয়াস, বহু নিষ্ঠা ও বহু যত্নসাপেক্ষ; কিন্তু ইচ্ছামাত্র 'নামে'র স্পর্শ ও

করুণা অনুভব করা আয়াসসাধ্য নয়। অপ্রাকৃত চিন্ময় নাম কৃপা করিয়াই প্রাকৃত জড় জিহ্বায় আবির্ভূত হইয়া নৃত্য করিতে করিতে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়াদিতে অমৃতের প্লাবন বহাইয়া দেন ; দেহ-মন-প্রাণ সেই অমৃতসিন্ধুতে অবগাহন করিয়া অমৃতময় হইয়া উঠে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু নামাবতার, নামময় বিগ্রহ, জগতে নামের মাধুর্য ও করুণা প্রচার করা ও তাঁহার অবতরণের অন্যতম হেতু। শুধুমাত্র পরমধন এই 'নাম' অবলম্বন করিয়া কেমন করিয়া লক্ষ লক্ষ ভক্ত পরম তীর্থপথে যাত্রা করিয়া ধন্য হইয়াছেন এবং আজও হইতেছেন, তাহার দৃষ্টান্ত অনেক। শ্রীপাদ হরিদাস তো নামসাধনার এক জীবন্ত বিগ্রহ, কিন্তু 'নাম' কেমন করিয়া 'ভবমহাদাবাগ্নিকে নির্বাপিত করিয়া যুগযুগ-সঞ্চিত গ্লানি ও মলিনতা মুক্ত করিয়া চিত্ত-দর্পণকে স্বচ্ছ নির্মল করিয়া ব্রহ্মের চিদ্‌ঘন আনন্দসুন্দরের প্রতিফলনযোগ্য করিয়া তুলে, তাহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত খুঁজিতে গেলে আমাদের একবার যাইতে হইবে নবদ্বীপে।

সুদক্ষ জীবন-শিল্পীর সূক্ষ্মতম মধুরতম রূপায়ণে কেমন করিয়া দুইটি কঠিন শিলার রূপান্তর ঘটিল সুন্দর প্রাণময় প্রতিমাতে, তাহার দৃষ্টান্ত জগন্নাথ আর মাধব—নবদ্বীপের কুখ্যাত দুই ভাই 'জগাই আর মাধাই'। হেন পাপ নাই যে তাহারা করে নাই ; পরধন-হরণ, লুণ্ঠন, গৃহদাহ, নরনারী-নির্যাতন, কি নহে ? দুই মহামস্তপ সারাদিন নবদ্বীপের পথে পথে ঘুরিয়া বেড়ায়। কখন পরস্পরে গলাগলি, কখন বা কদর্য কুৎসিত ভাষায় গালাগালি. নবদ্বীপের লোক সন্ত্রস্ত, ভীত ; যে পথে জগাই-মাধাই, সে পথে জনপ্রাণী নাই।

প্রভুর আদেশ, শ্রীপাদ নিত্যানন্দ আর বৃদ্ধ হরিদাসকে নবদ্বীপের গৃহে গৃহে ভিক্ষা করিতে হইবে। ভিক্ষার প্রার্থনা অন্ন নহে, কৃষ্ণনাম ; 'কহ কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণ নাম'—এই তাঁহাদের ভিক্ষা। দয়াল নিতাইচাঁদ দ্বারে গিয়া দাঁড়ান, সকরুণ গৃহস্থ দুই হাতের অঞ্জলি ভরিয়া ভিক্ষার সামগ্রী আনেন ; নিতাই বলেন, 'ওগো, তোমার এই দান ফিরাইয়া লও, আমাকে কৃষ্ণনাম দান দাও। বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, এই শুধু আমার ভিক্ষা'। সৌভাগ্যবান্ সুকৃতিবান্ কেহ বা এই ভিক্ষা দান করেন, নয়নে অশ্রু আসে, সুগঠিত সুন্দর গৌর তরুণ সন্ন্যাসীর কেন এই আকৃতি ? কেহ বা করেন বিদ্রূপ, সুতীক্ষ্ণ হাস্যবাণে বিঁধিতে থাকেন এই নবীন ভিক্ষাপ্রার্থীর নূতন ভিক্ষাপ্রণালীকে, অবহেলায় কেহ বা রুদ্ধ করেন গৃহদ্বার। কিন্তু 'অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়ের ক্রোধ নাই, বিরতি নাই !

সেদিন দূরে দেখিলেন, বলবান্ দুই মস্তপ পরস্পর কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া টলিতে

টলিতে চলিতেছে ; কি বলে, কি করে, কিছুরই স্থিরতা নাই। পার্শ্ববর্তী লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করিয়া যখন তাহাদের পরিচয় জানিলেন, তখন ঘৃণায় নহে, করুণায় নিত্যানন্দের বক্ষ আলোড়িত হইয়া উঠিল, বলিলেন, 'হরিদাস! আমাদের উপর আদেশ হইয়াছে নাম বিতরণ করিতে, যদি নাম বিতরণ করিতেই হয়, তবে এই তো শ্রেষ্ঠ স্থান, চলো যাই।' 'হায় হায়' করিয়া বলিয়া উঠিলেন নিত্যানন্দ, 'সদ্‌ব্রাহ্মণকুলজাত দুইটি মানুষ, কি ইহাদের পরিণতি! যদি ইহাদের মন ফিরাইতে না পারিলাম তবে কিসের প্রভু গৌরাঙ্গসুন্দর, কতটুকু বা তাঁহার ক্ষমতা ?

পাপী উদ্ধারিতে প্রভু কৈলা অবতার।
এমত পাতকী কোথা পাইবেন আর ॥

. ...

"তবে হও নিত্যানন্দ—চৈতন্যের দাস।
এ দুইরে করে"। যদি চৈতন্য প্রকাশ ॥
এখানে যে মদে মত্ত আপনা না জানে,
এই মত হয় যদি শ্রীকৃষ্ণের নামে ॥ —চৈঃ ভাঃ

যাহারা এখন ইহাদের দেখিয়া শুচি হইবার জন্য গঙ্গাস্নান করেন, এমন যদি হয় যে, ইহাদের দর্শনে লোকে গঙ্গাস্নানের মতোই পবিত্রতা ও পুণ্য লাভ করেন, তবেই সার্থক হইবে আমাদের সকল প্রয়াস, সফল হইবে আমার চৈতন্যের দাসত্ব, আমার নিত্য আনন্দ! হরিদাস! তুমি ইহাদের প্রতি সদয় হও, শুভ সঙ্কল্প করো, তবেই ইহারা উদ্ধার পাইবে।'

হরিদাস বুঝিলেন, নিত্যানন্দের কৃপাদৃষ্টি যখন দুই পতিতের উপরে পতিত হইয়াছে তখন উদ্ধারের আর দেরি নাই।

উপস্থিত ভব্য লোকগণ নিষেধ করিতে লাগিলেন, কেহ করিতে লাগিলেন বিদ্রূপ—'তোমাদের নবীন সন্ন্যাসের ভড়ং এখানে খাটিবে না। বাপু হে প্রাণটি লইয়া ঘরে ফিরিয়া যাও।'

নিত্যানন্দ অগ্রসর হইলেন, সঙ্গে হরিদাস।

সবারে ভজিতে কৃষ্ণ প্রভুর আদেশ।
তার মধ্যে অতিশয় পাপীরে বিশেষ ॥
বলিবার ভারমাত্র আমরা দুই-র।
বলিলে না লয়, তবে সেই মহাবীর ॥

—কৃষ্ণনাম বিলাইবার ভার মাত্র আমাদের ; নাম লয় কি, না লয়, তাহার দায় আমাদের নয়। যিনি ভার দিয়াছেন, সে দায় তাঁহার।

নিত্যানন্দ জগাই-মাধাই-এর কাছে গেলেন, বলিলেন, 'বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণনাম'—শুনিবামাত্র নেশা যেন ছুটিয়া গেল ; মহাক্রোধে দুই নয়ন আরক্ত হইয়া উঠিল, দুই মদ্যপ পরম আক্রোশে দুই প্রভুর দিকে ধাবিত হইল। চারিদিকে লোকে আতঙ্কে বিহ্বল, কেহ কেহ আর্তস্বরে বিপদভঞ্জন মধুসূদনকে ডাকিতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ দ্রুত ধাবিত হইলেন ; বৃদ্ধ বলহীন হরিদাসও যথাসাধ্য নিত্যানন্দের অনুসরণ করিলেন। নিরাপদ দূরত্বে আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া হরিদাস সক্ষোভে বলিয়া উঠিলেন, 'চঞ্চল এক পাগলের সঙ্গে আসিয়া আজ আমার এই দশা, বৃদ্ধ বয়সে মার খাইয়া প্রাণ যায় আর কি!' নিত্যানন্দ যেন জ্বলিয়া উঠিলেন, 'কে চঞ্চল, আমি, না, তোমার প্রভু গৌরাঙ্গচন্দ্র ? জন্মিয়াছেন দরিদ্র ব্রাহ্মণ হইয়া, কিন্তু আদেশ করেন যেন মহারাজাধিরাজ! আদেশ হইল, নাম বিলাও, এখন দোষ হইল আমার ?'

দুইজনে পৌঁছিলেন আসিয়া প্রভুর দরজায়। শ্রীপাদ অদ্বৈতাচার্যকে দেখিয়া হরিদাস গেলেন তাঁহার কাছে। একমন একপ্রাণ অদ্বৈত-হরিদাস! আজিকার সঙ্কটের কথা হরিদাস বলিলেন আচার্যের কাছে। আচার্য বলিয়া উঠিলেন, 'এক মাতাল নিত্যানন্দ, জুটিল আরও দুই মাতাল, হইল ভাল, তিন মাতালকে আরও মাতাল করিয়া তোমাদের গৌরাঙ্গ-গোঁসাই নাচিবেন, তাহাও দেখিব চোখে ? চলো চলো হরিদাস, জাতি লইয়া আমরা পালাই।' হাসিয়া হরিদাস নিবৃত্ত হইলেন। দ্বিতীয় দৃশ্যপট দর্শনের জন্য প্রস্তুত হইলেন আচার্য আর হরিদাস।

প্রভুর কাছে নিবেদিত হইল, আজিকার দুর্দৈবের কথা। নিতাই বলিলেন, 'গৌর, কিসের তোমার করুণার বড়াই, আমাকে উদ্ধার করিয়াছ তাই ? এই দুই মহাপতিতকে ত্রাণ কর, তবে তো জানিব তোমার মহিমা!'

পরম নিশ্চিন্ত প্রসন্নতায় গৌর বলিলেন, 'শ্রীপাদ! আপনি যখন ইহাদের ভাবনার ভার গ্রহণ করিয়াছেন, আর তাহাদের ভয় কি ?'

বৈষ্ণব-সমাজ জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন, জগাই-মাধাই-এর ত্রাণ বুঝি হইয়াই গেল!

'নাম' ভবমহাদাবাগ্নিকে নির্বাপিত করেন, ঘনঘোর মহাদাবানলে ঘিরিয়া ধরিয়াছে জগাই আর মাধাই-এর দেহ মন, কিন্তু আর ভয় নাই! ঐ যে আকাশ

আবৃত করিয়াছে কৃষ্ণমেঘে, এখনই নামিবে অমৃত-রসধারা, সিক্ত হইবে জগন্নাথ আর মাধব, নির্বাপিত হইবে অগ্নি।

প্রভু যে ঘাটে স্নান করেন, সেই ঘাটের কাছে স্থান লইল দুই ভাই, জগাই-মাধাই। বৈষ্ণবগণ এমন কি স্বয়ং প্রভু পর্যন্ত তাহাদের এড়াইয়া চলিলেন অন্য ঘাটে, অপর পথে।

রাত্রিতে রুদ্ধদ্বার গৃহে আরম্ভ হয় ভক্তসঙ্গে প্রভুর নামসঙ্কীর্তন, বাহির হইতে দুই মত্তপ তাহা শোনে, মৃদঙ্গ-মন্দিরা ও সঙ্গীতের তালে তালে টলমল পদভারে মহানন্দে নৃত্য করিতে থাকে। 'চেতোদর্পণমার্জনং' চিত্তদর্পণে যুগযুগ-সঞ্চিত মলিনতার মার্জন আরম্ভ হইল, শ্রবণে প্রবেশ করিল কীর্তনের আনন্দধ্বনি।

পরদিন প্রভুকে পথে দেখিয়া জগাই-মাধাই প্রসন্নহাস্যে বলিয়া উঠিল, 'নিমাই পণ্ডিত, কাল রাত্রে তোমার বাড়ীতে মঙ্গলচণ্ডীর গীত খুব ভাল হইয়াছে। আমাদের এখানে একদিন গান কর না? গায়ক-বাদক সব নিয়া আসিও, তোমাদের যাহা যাহা প্রয়োজন সমস্তই আমরা দিব।'

প্রভু ঈষৎ হাসিয়া দূরে সরিয়া গেলেন, কিন্তু তিনি অন্তর্যামী, তাহ প্রার্থনা স্বীকার করিলেন মনে মনে; যাহা প্রয়োজন, তাহা তিনি চাহিয়াই লইবেন।

এক রাত্রিতে পথে পড়িয়া আছে দুই ভাই, দূর হইতে দেখিলেন নিত্যানন্দ—আনন্দ নাই তাঁহার, নাই শান্তি; পাতকী-উদ্ধারের ব্রত লইয়াছেন, কিন্তু ব্রত তো আজও রহিল অসম্পূর্ণ।

নির্ভীক নিত্যানন্দ ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন। দুই মত্তপ কঠোরকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল, 'কে, রে?'

'অবধূত!'

শুনিবামাত্র মাধাই রুষ্ট হইয়া এক ইষ্টকখণ্ড (মুট্কী) লইয়া শ্রীনিত্যানন্দের ললাটে ভীষণ আঘাত করিল। সেই পূত দেহ হইতে অজস্র রুধিরধারা পড়িতে লাগিল, হস্তে ললাট চাপিয়া ধরিয়া পরমদয়াল নিত্যানন্দ বলিতে লাগিলেন, 'ভজ গোবিন্দ, কহ গোবিন্দ, লহ গোবিন্দ-নাম রে।' মাধাই অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া পুনরায় আঘাত করিতে উদ্যত হইলে জগাই-এর মনে জাগিল করুণার একবিন্দু প্রকাশ, জগাই মাধাই-এর হাত সবলে চাপিয়া ধরিয়া বলিল, 'কেন ভাই, নিরপরাধ সাধুকে আঘাত করিতেছ?'

প্রভুর কাছে এই খবর পৌঁছিতে মুহূর্ত বিলম্ব হইল না। প্রেমঘন গৌরাঙ্গ-সুন্দর স্তম্ভিত হইয়া গেলেন, ক্রোধে দুই নয়ন জ্বলিয়া উঠিল, মুহূর্তে বিস্মৃত হইলেন

নিজের প্রতিজ্ঞার কথা 'কাঁদিয়া জগৎকে কাঁদাইব।—সে কথা মনে রহিল না, গৌর ছুটিয়া আসিলেন নিত্যানন্দের কাছে, দেখিলেন তাঁহার আঘাত; দুই অরুণ নয়নের প্রজ্বলিত ক্রোধবহ্নি বুঝি এখনই ঘটাইবে প্রলয়, ঘটাইবে চরম সর্বনাশ— নিত্যানন্দের পুণ্যদেহ হইতে রক্তপাত? আকুল নিত্যানন্দ প্রভুর দুই হাত চাপিয়া ধরিলেন, কণ্ঠে ব্যগ্র মিনতি, 'ক্ষমা করো, ক্ষমা করো, ইহারা অজ্ঞান, তোমার ক্রোধের অযোগ্য। দৈবেঃ আমি ব্যথা পাইয়াছি, ইহারা আমাকে আঘাত করে নাই। তুমি ক্ষমাসুন্দর নেত্র মেলিয়া একবার ইহাদের দিকে চাও, ভাই। আর জগন্নাথ তো কোন দোষ করে নাই, বরং বাধা দিয়াছে মাধবকে, তাহার প্রতি তোমার রোষ কেন? ধীরে প্রলয়বহ্নি যেন নির্বাপিত স্তিমিত হইয়া আসিল, প্রশান্তি আসিল গৌরবদনে। 'জগন্নাথ, তুমি আমার নিত্যানন্দকে রক্ষা করিয়াছ? কোন্ ধনে, কোন প্রতিদানে আমি তোমার ঋণ প্রতিশোধ করিব? এই বক্ষ পাতিয়া দিলাম, তুমি এসো আমার বক্ষে।'

বিস্মিত মুগ্ধ জগন্নাথ সে অপরূপ জ্যোতির্ময় দেবতার দুই শীতল চরণতলে লুণ্ঠিত হইলেন, বহুদিনের পুঞ্জীভূত গ্লানির ভার অশ্রু হইয়া ঝরিতে লাগিল প্রভুর পায়ে। প্রভু বলিলেন, 'জগন্নাথ। আজ তুমি আমাকে কিনিয়া লইলে, বলো, কি তোমার প্রার্থনা?

কি প্রার্থনা, কেমন করিয়া তাহা চাহিতে হয়? বিহ্বল দৃষ্টি মেলিয়া ধরিলেন জগন্নাথ প্রভুর মুখে।

প্রভু বলিলেন, আজ হইতে প্রেম-ভক্তি লাভ করিয়া তুমি ধন্য হও, তোমার কৃষ্ণপ্রেম লাভ হোক। জগন্নাথ চাহিয়া দেখিলেন সেই গৌরতনুখানি কখন রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছে; সম্মুখে দাঁড়াইয়া চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী অপরূপ শ্যামতনু!

আনন্দে ভক্তিতে জগন্নাথ মূর্ছিত হইয়া পড়িলেন। বিস্মিত বাক্যহত মাধব নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া আছেন, একি বিস্ময়! কি এই মহৎ উদার ক্ষমা!

একই আত্মা, একই কার্য, একই পাপ, দুই দেহ ধারণ করিয়া জগাই আর মাধাই। জগাই-এর প্রতি যখন প্রভুর কৃপা হইল, তখন মাধবের চিত্তেও শুভবুদ্ধি জাগিল, বলিলেন—

দুই জনে এক ঠাঞি কৈল প্রভু পাপ!

অনুগ্রহ কেনে প্রভু হয় দুই ভাগ? —চৈঃ ভাঃ

প্রভুর চরণে মাধব পতিত হইলেন। কঠোর হইল প্রভুর স্বর, বলিলেন, 'মাধব,

তোমার অপরাধ অপরিমেয়, আমার ক্ষমার অযোগ্য। যে নিত্যানন্দ-স্বরূপের দেহকে আমি পূজা করি, যিনি আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, তাঁহাকে তুমি আঘাত করিয়াছ! আমি তোমাকে ক্ষমা করিতে পারিব না।' 'ভবমহাদাবাগ্নি'-জ্বালার অনুভূতি এতদিন ছিল না, এখন তীব্র দাহে প্রাণ যেন অস্থির হইয়া উঠিল, ব্যাকুল অশ্রুজড়িত কণ্ঠে মাধব মিনতি করিতে লাগিলেন, 'ওগো পতিতপাবন! উপায় বলো, তুমি বৈদ্যশিরোমণি, আমার ভব-ব্যাধির চিকিৎসা করিয়া তুমি যদি আমাকে নিরাময় না কর, তবে কে আর করিবে? দয়া কর, তোমার পতিতপাবন নাম সার্থক কর, প্রভু!'

প্রভু যেন কিঞ্চিৎ বিচলিত হইলেন, নিত্যানন্দের পানে চাহিয়া কহিলেন, 'ক্ষমা করিতে হয়, তুমি কর নিতাই, এই কঠিন অপরাধের ক্ষমা আমার কাছে নাই।'

নিত্যানন্দের চোখ হইতে করুণার সুরধুনী-ধারা বহিয়া মাধবকে স্নাত করিয়া দিল। 'সর্বাত্মস্নপনং' দেহ-মন ইন্দ্রিয়-প্রাণ স্নিগ্ধ স্নাত হইতেছে, মাধবের অন্তর ভরিয়া উঠিতেছে অমৃতরসে।

নিতাই বলিলেন, 'গৌর! কৃপা করিবার জন্য দুই হাত প্রসারিত করিয়া বসিয়া আছ, তুমিই কৃপা করিবে, কিন্তু আমাকে উপলক্ষ করিতে চাও? বেশ তাই হোক। আমার জন্ম-জন্মান্তরের যদি কোন সুকৃতি থাকিয়া থাকে, সবই আমি মাধবকে দিলাম, তাহার সকল দুষ্কৃতির ভার গ্রহণ করিলাম আমি। এবার মায়া ছাড়, তুমি তাহাকে গ্রহণ করো।'

ধন্য দয়াল নিতাইচাঁদ, ধন্য তোমার মহতী ক্ষমা, সার্থক তোমার পতিতোদ্ধারণ ব্রত। দুঃখ, আনন্দ, বেদনার বিচিত্র প্রকাশে প্রভুর মুখখানি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল, বলিলেন, 'শ্রীপাদ! যদি ক্ষমাই করিয়াছ, তবে মাধবকে একবার তোমার করুণাবিশাল বক্ষে স্থান দাও, তাহার জন্ম সার্থক হোক।'

সার্থক হইলেন মাধব, পরম নিশ্চিন্ত নির্ভয় আশ্রয় মিলিল নিতাইচাঁদের বক্ষে।

প্রভুর আদেশে দুই ভাইকে প্রভুর গৃহে তুলিয়া লইয়া গেলেন ভক্তগণ, আজই ইঁহাদের লইয়াই হইবে নাম-সঙ্কীর্তন আর মহানৃত্য!

আচার্য অদ্বৈত হাসিতেছেন, 'হরিদাস! কি বলিয়াছিলাম, মনে আছে? ঐ দেখ সব মাতাল একত্র জুটিয়াছে, এখনই আরম্ভ হইবে নেশার কোলাহল আর নৃত্য; চলো এই বেলা আমরা পালাই।' হরিদাসও হাসিলেন, পালাইবেন কোথায়, কেমন করিয়া? চোখে তো নেশা লাগিয়াই আছে, সবই গৌরময়, সমস্ত ভুবনেই যে গৌর-ফাঁদ পাতা!

নৃত্য-কীর্তন আরম্ভ হইল, মঙ্গলচণ্ডীর গীত নয়, পরম সুমঙ্গল নাম। নূতন উষার অরুণোদয়ে রাঙা হইয়া উঠিল জগন্নাথ-মাধবের চিত্ত, এ কি নব অভ্যুদয়! ক্রমে পূর্ণ সূর্য প্রকাশিত হইতে লাগিলেন জগন্নাথ-মাধবের চিত্তদর্পণে। 'চেতোদর্পণমার্জনং' আজ চিত্তদর্পণ মার্জিত, স্বচ্ছসূর্য প্রকাশযোগ্য হইয়াছে।

দুই ভাই অনুতাপের অশ্রুজলে প্রভুর চরণ ধুইয়া দিলেন। প্রভু তাঁহাদের লইয়া চলিলেন জাহ্নবী-সলিলে। কলুষ-নাশিনীর বক্ষে নামিয়া দাঁড়াইলেন প্রভু, দুইপাশে দুই ভাই—জগন্নাথ আর মাধব। দিব্যানন্দ-স্মিতমুখে প্রভু দুই ভাই-এর দিকে তাকাইলেন। সুগম্ভীর দূরাগত ধ্বনির মতো তাঁহার কণ্ঠ হইতে যেন বাণী বাহির হইল, বলিলেন, 'শোন জগন্নাথ, শোন মাধব! তোমাদের জন্ম-জন্মান্তরের যত পাপভার সমস্তই আমি গ্রহণ করিলাম, আর পাপ করিও না। আজ হইতে তোমরা আমার হইলে।'

তো সভার মুখে মুঞি করিব আহার,
তোর দেহ হইবেক মোর অবতার। —চৈঃ ভাঃ

আজন্ম কলুষিত-জিহ্বায় যে জড়তা আসিয়াছিল, আজ কোথায় সে জড়তা? ব্রহ্মবিদ্যা যেন আবির্ভূতা হইলেন দুই ভাই-এর জিহ্বায়, বিহ্বল ব্যাকুল চিত্তে অদ্ভুত স্তুতি করিতে লাগিলেন প্রভুকে। নূতন এক অপূর্ব দৃশ্যপটের যেন একটির পর একটি পরম বিস্ময়, পরম রহস্য, পরম আনন্দ খুলিয়া ধরিতেছেন চোখের সম্মুখে কোন অদৃশ্য শিল্পী, আর তাহারই সৌন্দর্য-মাধুর্যের নিবিড়তর আবেশে মগ্ন হইয়া যাইতেছে দেহ-মন-প্রাণ!

সকল বৈষ্ণবকে প্রভু বলিলেন, 'তোমরা ইহাদের অনুগ্রহ করো, কৃপা করিয়া এই আশীর্বাদ করো, আজ হইতেই যেন ইঁহারা কৃষ্ণদাস হন, ইঁহাদের প্রাণকমল আজই অর্ঘ্য হইয়া নিবেদিত হোক কৃষ্ণের চরণে।'

হরিধ্বনি করিয়া বৈষ্ণবমণ্ডলীর প্রত্যেকেই আলিঙ্গন করিলেন সেই দুই দুরাচার মদ্যপকে, যাহাদের ভয়ে নবদ্বীপে বাস করাই কঠিন হইয়া উঠিয়াছিল।

পরম শ্রেয়ঃ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইলেন দুই ভাই। 'শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকা-বিতরণং'—হৃদয়-কুমুদটি গৌরচন্দ্রের করুণা-জ্যোৎস্নাধারায় অভিষিক্ত হইয়া নিজেকে উৎসর্গ করিল জীবননাথের পদতলে।

জগন্নাথ ও মাধব ছিলেন অজ্ঞান, অবিদ্যায় আবৃত ছিল তাঁহাদের চিত্ত, কিন্তু পরমপুরুষের কৃপাবারি-সিঞ্চনে সে অবিদ্যা দূর হইয়া গেল। মুহূর্তে নবজীবন লাভ করিয়া তাঁহারা ধন্য হইলেন। কিন্তু বিদ্যা দূর হইবে কিসে? নাম কি-

সাধককে বিদ্যা-অবিদ্যার পারে লইয়া যাইতে পারেন, পারেন কি আনন্দসমুদ্রের সন্ধান দিতে? কেবল বিদ্যা তথা শুষ্ক জ্ঞানের সাধ্য নাই সেই প্রেম, সেই আনন্দ দান করিতে; প্রভু বলেন, এক নামেরই আছে সেই সাধ্য। অথচ কি দুর্দৈব, সেই নামেই জীবের রুচি হইল না।

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্ মমাপি
দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ। —মহাপ্রভু-কৃত দ্বিতীয় শ্লোক

—ভগবান্ বহুভাবে নিজ নাম প্রচার করিয়াছেন, এবং সেই সমস্ত নামে নিজের সর্বশক্তি ন্যস্ত করিয়াছেন, সেই নামের স্মরণ বিষয়ে (দেশ) কাল-সম্বন্ধে কোন বিধিনিষেধই নাই। হে ভগবান! এমনই তোমার কৃপা; কিন্তু আমার এমনই দুর্দৈব যে, এমন নামেও আমার অনুরাগ জন্মিল না!

যিনি এক, তিনিই আপনাকে নানা বিচিত্র রূপে প্রকাশিত করিতেছেন, 'একোঽপি সন্ বহুধা যো বিভাতি'।* বিচিত্র তাঁহার প্রকাশ, বিভিন্ন তাঁহার নাম, কিন্তু সকল নামের আশ্রয় সেই একমাত্র নামী। নাম নামীকেও নামাইয়া আনেন, ভক্তের হৃদয়কেও নমনীয় করিয়া তোলেন। জীবের পরম কাম্য প্রেমধন লাভ হয় শুধু নামেরই আশ্রয়ে, এবং তাহাই জীবের পরম বা পঞ্চম পুরুষার্থ!

প্রভু বারাণসীতে আসিলেন, বৃন্দাবনে যাতায়াতের পথে দুইবারই কিছুকাল তথায় রহিলেন। নাম চিন্তামণি সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ, তাঁহাতেই মগ্ন হইয়া আছেন প্রভু; কানে আসে তীব্র নিন্দা, কিন্তু নীরবে তাহা উপেক্ষা করেন।

সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ সরস্বতী অদ্বৈতবৈদান্তিক। নির্গুণ ব্রহ্মই তাঁহার প্রতিপাদ্য; শ্রীভগবানের চিন্ময় আনন্দবিগ্রহও তাঁহার কাছে 'মায়িক'! কাজেই নামসংকীর্তন তাঁহার কাছে মাত্র 'ভাবকালি' অর্থাৎ নেহাৎ ভাবালুতা-মাত্র।

বারাণসীর সন্ন্যাসীসমাজে আপন মহিমায় সমাসীন প্রকাশানন্দ, সুতীক্ষ্ণ বিদ্রূপবাণে বিঁধিতেছেন অলক্ষ্যে 'ভাবুক' সন্ন্যাসীকে; 'মূর্খ! একদল লোক লইয়া কীর্তন করিয়া বেড়ায়, সন্ন্যাসীর যাহা ধর্ম, বেদান্ত-পাঠ তাহাই সে করে না, কে এই কৃষ্ণচৈতন্যনামধারী অর্বাচীন সন্ন্যাসী?' শুনিয়াছেন পরম পণ্ডিত পরম বেদান্তী

* শ্রুতি, গোপালতাপনী ৩।১

বাসুদেব সার্বভৌমও এই ভাবুক সন্ন্যাসীর পংগামী হইয়া এখন ভক্তি-পথকেই শ্রেষ্ঠ ভাবিয়া সেই রসেই মত্ত হইয়াছেন, তাই বোধ করি প্রকাশানন্দের অধিক বিরক্তি, অধিক তিক্ততা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রতি।

তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের হাসি হাসিয়া প্রকাশানন্দ স্বামী বলিলেন, কাশীতে এই সমস্ত 'ভাবকালি' বিকাইবে না, ইহা অদ্বৈতজ্ঞানের রাজ্য।

প্রভুর নিন্দা শুনিতে হয়—তপন মিশ্র ও শূদ্র চন্দ্রশেখর প্রভৃতি ভক্তের হৃদয় ব্যথায় ভরিয়া উঠে, প্রভুকে দুঃখ নিবেদন করিয়া প্রতিকার তো কিছু হয়ই না, প্রভু নীরব হইয়া থাকেন।

অল্প কিছুদিন বাস করিয়া প্রভু বৃন্দাবনে চলিয়া গেলেন, সেখান হইতে ফিরিয়া পুনরায় আসিলেন বারাণসী। সমস্ত ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ভক্তি প্রচার করিয়াছেন, বাকী আছে কাশী,—অদ্বৈতজ্ঞানের কঠিন স্থান; যদি এখানেও রসের সঞ্চার না করিতে পারিলেন, তবে বৃথাই তাঁহার অবতরণ, বৃথাই তাঁহার রসমাধুর্য!

'অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ', এ সত্য মহাপ্রভু একাধিক বার উচ্চারণ করিয়াছেন। নবদ্বীপে 'অষ্টপ্রহর'-কালীন ঐশ্বর্যপ্রকাশে এবং আরও কয়েক দিন বহুবার নিজেকেই তিনি 'মুঞি সেই মুঞি সেই' বলিয়া ব্রহ্মবস্তুর সহিত অভেদ বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, সন্ন্যাসও গ্রহণ করিয়াছেন দশনামী সম্প্রদায় হইতেই। ব্রহ্মের একত্ব বা অদ্বৈতবাদে প্রভুর সংশয় নাই, তিনি তাহা নিজেই জানেন, কিন্তু তিনি জানেন, 'বাঁশির একটি রন্ধ্রেই সমস্ত সুর বাজে না, সাতটি রন্ধ্রে সাতটি সুর লইয়াই বাঁশি বাজানোর সার্থকতা, বাঁশির সৌন্দর্যমাধুর্য।' বৃন্দাবন হইতে ফিরিবার পর সংসারবন্ধন ছিন্ন করিয়া শ্রীসনাতন আসিয়া প্রভুর সঙ্গে মিলিত হইলেন। প্রায় দুই মাসকাল যাবৎ প্রভু তাঁহাকে আপনার কাছে রাখিয়া অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব, কিন্তু রসস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণভজন সম্বন্ধে শিক্ষা দিতে লাগিলেন, উত্তরোত্তর বর্ধিত সন্ন্যাসীসমাজের সমালোচনা তাঁহাকে স্পর্শমাত্র করিতে পারিল না! কিন্তু স্পর্শ করিল প্রভুভক্ত মহারাষ্ট্রী বিপ্রকে। তিনি প্রভুনিন্দা আর সহ্য করিতে পারিলেন না, একদিন কাশীবাসী প্রায় দশ সহস্র সন্ন্যাসীকে তিনি আপন ভবনে নিমন্ত্রণ করিলেন। তারপর আশা-আকাঙ্ক্ষার দোলায় দুলিতে দুলিতে উপস্থিত হইলেন প্রভুর কাছে, ভয়, পাছে প্রভু নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু প্রভু ঈষৎ হাসিয়া নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন, তিনি ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু!

বিপ্রের পত্রপুষ্প-সুসজ্জিত, অগুরু-ধূপ-চন্দন-সুরভিত অঙ্গনে উচ্চাসনে বসিয়া আছেন জ্ঞানোজ্জ্বল, স্বকীয় মহিমায় মহিমান্বিত সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ সরস্বতী ; পাদপীঠতলে সহস্র সহস্র সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী দীপ্তি পাইতেছে।

এমন সময়ে তপঃকৃশ সুকুমার উজ্জ্বল তনুখানি লইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সেই অঙ্গনে প্রবেশ করিলেন, পাদ প্রক্ষালন করিয়া সেই স্থানেই বসিয়া পড়িলেন, দীনাতিদীনের মতো।

ক্ষীণ শীর্ণ তনু কিন্তু যেন 'কোটি সূর্য-প্রভাময়, মুগ্ধ সন্ন্যাসীসমাজ 'হা-হা' করিয়া উঠিলেন। প্রকাশানন্দও বিচলিত হইলেন, বলিলেন, 'এ কি! তুমি ওই স্থানে বসিলে কেন? এইখানে আমার নিকটে আসিয়া আসন গ্রহণ করো।'

স্বভাবসিদ্ধ বিনয়নম্র হাস্যে বলিলেন, 'তিনি ভারতী-সম্প্রদায়ী সন্ন্যাসী, কাজেই (শ্রেষ্ঠ সম্প্রদায়ী, সরস্বতী) সন্ন্যাসীসমাজে বসিবার যোগ্যতা বা অধিকার তাঁহার নাই। 'নমো নারায়ণ' সন্ন্যাসীদের এই চিরন্তন সম্ভাষণ করিয়া প্রকাশানন্দ স্বহস্তে প্রভুকে তুলিয়া আনিয়া নিজের অতি সন্নিকটে বসাইলেন। প্রভুর রূপলাবণ্য ও বিনয়নম্র ব্যবহারে প্রকাশানন্দের অন্তর দ্রবীভূত হইল, বলিলেন, 'কৃষ্ণচৈতন্য! নারায়ণ-সম তোমার অঙ্গকান্তি, তুমি কেন হীন হইবে?' হয়তো বা পরম সুকুমার এই তরুণের প্রতি প্রৌঢ় সন্ন্যাসীর একটু বাৎসল্যের সঞ্চার হইল।

—বলিলেন, 'কৃষ্ণচৈতন্য, তোমার আকৃতি সুন্দর, বাক্য সুন্দর ; তুমি সন্ন্যাসী, তবে কেন তুমি বেদান্ত না পড়িয়া, ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনা না করিয়া নৃত্যগীতে মত্ত হইয়াছ?'

সকরুণ মধুর হাস্যে প্রভু বলিলেন, 'বেদান্ত আলোচনা বা পাঠ করার অধিকার ও যোগ্যতা আমার হয় নাই, তাই আমার গুরু আমাকে কৃষ্ণমন্ত্র দান করিলেন। 'হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং, কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা'—এই শ্লোকটিও কণ্ঠস্থ করাইয়া আমার গুরু বলিলেন, এই হরিনাম মহামন্ত্র জপ করিতে করিতেই আমার সিদ্ধিলাভ হইবে। গুরুবাক্যে দৃঢ় নিষ্ঠা করিয়া আমি এই মহামন্ত্র জপ করিতে আরম্ভ করিলাম, কিন্তু দেখিলাম এই নাম বড় অবিবেচক ; আমি নামকে আশ্রয় করিলাম, অথচ নাম আমাকে বশে থাকিতে দিলেন না, হাসাইয়া কাঁদাইয়া নৃত্য করাইয়া আমাকে উন্মাদ করিয়া তুলিলেন! কি করিব, আমি বুঝিতে পারি না, বিহ্বল ব্যাকুল হইয়া ছুটিয়া গেলাম গুরুর কাছে, 'কিবা মন্ত্র দিলা গোঁসাই, কিবা তার বল—এই মন্ত্র যে আমাকে পাগল করিয়া দিয়েছেন!'

পরম স্নেহভরে আমার দয়াল গুরু হাসিয়া উঠিলেন, 'ওরে অবোধ, ওরে পাগল,

কৃষ্ণনামের যে পরম কাম্য ফল অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, তাহাই তো লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছ তুমি! দেবদুর্লভ ধনে ধনী হইয়া, পঞ্চম পুরুষার্থ লাভ করিয়া আজ আমার কাছে আসিয়াছ তাহা ফিরাইয়া দিতে? যাও, যাহা করিতেছ তাহাই কর গিয়া, বেদ-বেদান্ত যাঁহার সন্ধান করিয়া সারা হইতেছেন, সেই সারাৎসারকেই যে অন্তরতম করিয়া লাভ করিয়াছ তুমি, আর তোমার কিসের প্রয়োজন? আমাকেও তুমি ধন্য করিয়াছ বৎস, আর কি তোমার প্রার্থনা?' আশ্বস্ত চিত্তে পরম নির্ভয়ে আমি ফিরিয়া আসিলাম, তবে ইহা নামেরই ফল, আমার বিকৃত মস্তিষ্কের কার্য নয়! এখনও যে আমি হাসি কাঁদি নাচি গাই—আমার এ 'ভাবকালি' আমার ইচ্ছাধীন নয়, আমি স্বতন্ত্র নই, নামই আমাকে অধীন করিয়া এই সমস্ত করাইতেছেন!

অননুভূত অনাস্বাদিত অশ্রুতপূর্ব এই কৃষ্ণপ্রেম; তথাপি জগদ্‌গুরু প্রকাশানন্দের চিত্ত যেন প্রসন্ন হইয়া উঠিল। ব্রহ্মবিদ্যা তাঁহার আয়ত্ত, নির্গুণ ব্রহ্মানুভূতির কথা প্রকাশানন্দ জানেন, কিন্তু খোসা-বিচি বাদ দিয়া তিনি বেলের ওজন করেন, সমগ্র বেলের ওজন করিবার কথা কোন দিনই তাঁহার, তথা তৎকালীন বারাণসীবাসী জ্ঞানমার্গী সন্ন্যাসীসমাজের মনে হয় নাই। 'লোকবত্তু লীলাকৈবল্যম্'—লীলা তত্ত্ব। সৃষ্টিকে মায়া বলিয়াই জানেন, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের আনন্দলীলারসানুভূতির কথা জানা নাই, জানিবার বিন্দুমাত্র অভিরুচিও নাই।

প্রকাশানন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভালো কথা। নাম করিয়া ভগবৎপ্রেম তোমার লাভ হইয়াছে, কিন্তু সন্ন্যাসী তুমি! "বেদান্ত না পড় কেনে, কি ইহার দোষ?"' আকুল আগ্রহে সমবেত সন্ন্যাসীরাও চাহিয়া আছেন নবাগত ভাবুক সন্ন্যাসী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দিকে—কি উত্তর দিবেন তিনি?

বিনীত কণ্ঠে প্রভু বলিলেন, 'আপনারা যদি মনের মধ্যে দুঃখ গ্রহণ না করেন, তবে ইহার কারণ আমি বলিতে পারি।'

সন্ন্যাসীমণ্ডলী প্রভুর উত্তর শুনিবার জন্য সাগ্রহে ও সানন্দে সম্মত হইলেন। প্রকাশানন্দ বলিলেন, 'তোমার কথা শুনিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি, স্বচ্ছন্দে তুমি তোমার কথা বলো।

ভাবুক সন্ন্যাসী অপূর্ব ভাবে মগ্ন হইলেন, জ্ঞানের দীপ্তিতে ভাস্বর হইয়া উঠিল তাঁহার বদনমণ্ডল, সুগম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন, বেদবেদান্ত-সঙ্কলয়িতা ভগবান বেদব্যাস উপনিষৎ প্রভৃতি শ্রুতি-প্রমাণসহ যে 'ব্রহ্মসূত্র' রচনা করিয়াছেন, তাহা অভ্রান্ত, কারণ তাঁহার বাক্যে ভ্রম থাকার কথা নয়, তিনি ভগবানের অংশ। পূর্বে

নীলাচলে মহাপণ্ডিত বৈদান্তিক বাসুদেব সার্বভৌমকেও এই কথা বলিয়াছিলেন প্রভু, 'ব্যাসের সূত্রের অর্থ সূর্যের কিরণ, কল্পিত ভাষ্যমেঘে করে আচ্ছাদন।'

'কিন্তু আপনারা ব্যাস ভ্রান্ত বলিয়া ব্রহ্মের শক্তি ও পরিণাম অস্বীকার করিয়া বিবর্তবাদ স্থাপন করিতে যে চেষ্টা করিতেছেন, তাহাই আমাকে আঘাত করে, তাই আমি বেদান্ত আলোচনা করি না।'

বিস্মিত হইলেন সংঘ সন্ন্যাসী, জগদ্‌গুরুর সম্মুখে কি বলিতেছেন ইনি? সভা অধীর প্রতীক্ষায় নীরব। প্রভু বলিলেন, 'শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ সকলে যে শক্তিমান্ ব্রহ্ম স্থাপন করিতেছেন, আপনারা তাঁহাকেই অস্বীকার করিতেছেন; ব্রহ্মের শক্তি অস্বীকার করিলে ব্রহ্মের পূর্ণতার হানি হয়।

শ্রুতি যেমন বলিয়াছেন, 'নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনম্। দিব্যো হ্যমূর্তঃ পুরুষঃ সবাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ॥—তেমনই বহুবার বলিয়াছেন, ব্রহ্ম 'সত্যং শিবং সুন্দরম্, 'রসো বৈ সঃ,' 'আনন্দং ব্রহ্ম', এবং তাঁহার 'স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়া চ' স্বাভাবিকী জ্ঞান-বল-ক্রিয়াও আছে। শ্রুতি ইহাও বলেন, 'স ঐক্ষত', 'সোঽকাময়ত', তিনি ঈক্ষণ করিলেন, কামনা করিলেন বহু হইব—কাজেই ব্রহ্ম শক্তিমান্। অগ্নি এবং তাহার দাহিকাশক্তি অথবা মৃগমদ-কস্তুরী আর তাহার গন্ধ যেমন ওতপ্রোত অবিচ্ছিন্ন অভেদ, তেমনি শক্তি আর শক্তিমানেও অভেদ।

'অর্দ্ধস্বরূপ না মানিলে পূর্ণতা হয় হানি।' সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের তিনটিই প্রধান শক্তি, সদংশে সন্ধিনী, চিদংশে সম্বিত আর আনন্দাংশে হ্লাদিনী। যিনি স্বরূপ শক্তি, তিনিই অন্তরঙ্গা। যিনি জীবশক্তি, গীতার মতে তিনি 'ক্ষেত্রজ্ঞা'—বৈষ্ণবগণ তাঁহাকেই বলেন, 'তটস্থা'; আর যাঁহাকে বলা হয়, 'ন সৎ ন অসৎ'—সেই মায়া বহিরঙ্গা শক্তি।

জীব ব্রহ্মস্বরূপেরই অংশ, অঙ্গ—চিদংশে জীব ও ব্রহ্ম অভেদ, কিন্তু বহিরঙ্গা মায়া জীবকে কবলিত করিবার শক্তি রাখেন, তাই জীব মায়ার বিক্ষেপাত্মিকা ও আবরণাত্মিকা শক্তির দ্বারা আচ্ছন্ন হন। তটস্থা অর্থাৎ জীবশক্তি, তিনি মধ্যবর্তিনী; স্বরূপ শক্তি ও বহিরঙ্গা শক্তি তাঁহার যেন দুই প্রান্ত।

জীব মায়াবশ এবং ঈশ্বর মায়াধীশ। বৈষ্ণব-মতে এই মায়া আগন্তুক নহে, দ্বিতীয় কোন বস্তুও নহে, ব্রহ্মেরই শক্তি।

কাজেই বিবর্তবাদে যে নির্গুণ ব্রহ্ম স্থাপন করা হয়, বৈষ্ণবগণ সে সিদ্ধান্ত মানিতে পারেন না। জগৎ মিথ্যা নয়, নশ্বর। দেহে যে জীবের আত্মবুদ্ধি, বৈষ্ণব-মতে একমাত্র তাহাই বিবর্ত। একই ব্যক্তি যেমন পিতা-পুত্র, জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ,

প্রভু-ভৃত্য প্রভৃতি নানাভাবের সম্বন্ধ দ্বারা বিচ্ছিন্ন, কিন্তু সমগ্র ভাব ও বৈচিত্র্যের মিলিত সত্তার এক অখণ্ড প্রকাশ এবং সমস্ত বিচিত্র ভাবকে অতিক্রম করিয়াও তাঁহার যেমন একটি একক সত্তা ও ব্যক্তিত্ব, ব্রহ্ম-বস্তুও তেমনই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ, কিন্তু লীলারসে, আনন্দরসে বহু বিচিত্র ভাবে ব্যক্ত।

জগৎ ব্রহ্মেরই শক্তি, শক্তির পরিণাম। 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' এবং 'আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ' প্রভৃতি ব্রহ্মসূত্রে স্পষ্টই পরিণামবাদের সমর্থন পাওয়া যায়। পরিণামবাদে ব্রহ্ম বিকারী হইতে পারেন না। প্রাকৃত জগতে চিন্তামণি যেমন হেমভার প্রসব করিয়াও অবিকৃত থাকে, তেমনই জগদ্রূপে নিজেকে ব্যক্ত করিয়াও ব্রহ্ম অপরিণামী ও অবিকারী থাকেন। তিনিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা এবং সৃষ্টিতে তিনি অন্তরে-বাহিরে অনুস্যূত হইয়াও তদতিরিক্ত। বিবর্তবাদ স্থাপন করিলে উপাস্য-উপাসনা কিছুই থাকে না। জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম হইলেও স্বরূপভূত তথা ব্রহ্মভূত হওয়ার জন্যও উপাসনার প্রয়োজন, নতুবা 'অদ্বয়জ্ঞান-তত্ত্বে' পৌঁছানো অসম্ভব। যিনি ভক্ত, তিনি ব্রহ্মনির্বাণ চাহেন না, 'চিনি না হইয়া তিনি চিনির আস্বাদন করিতে চাহেন।'

যিনি 'ব্রহ্মভূত',—তিনি প্রসন্নাত্মা; সবত্র তাঁহার ব্রহ্মদর্শন ও লীলারস-আস্বাদনের বাসনা এবং সুকৃতি যদি তাঁহার থাকে, তবে তিনি সেই আস্বাদনে যে অপূর্ব আনন্দ লাভ করেন, সেই আনন্দের সঙ্গে তুলনা হইতে পারে তেমন কোন বস্তু ব্রহ্মলোকেও নাই। ব্রহ্মনির্বাণের আনন্দ হইতেও তাঁহার কাছে সেই আনন্দ অনেক অধিক।

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥

—হরির এমনই গুণ, এমনই তাঁহার লীলামাধুর্য যে, আত্মারাম-সিদ্ধ সাধকগণও হরির প্রতি অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন। আত্মারাম সনক-সনন্দাদির কথা ছাড়িয়া দিলেও আজন্ম ব্রহ্মজ্ঞ শুকদেবের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলেই আমরা লীলারস-মাধুর্যের বিন্দুমাত্র আস্বাদন করিতে পারি। পিতা ব্যাসদেবের আদেশে রাজর্ষি জনকের কাছে গিয়াছিলেন ব্রহ্মনিষ্ঠ শুকদেব, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিবার মানসে। রাজর্ষির ইচ্ছাকৃত অবহেলা ও পরে ঐশ্বর্য ও ভোগ-বিলাসের আয়োজনে শুকদেব বিচলিত হন নাই। নিরাসক্ত সেই ঋষির নিকট তাই রাজর্ষি জনক উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন ব্রহ্মজ্ঞানের ভাণ্ডার!

আত্মসমাহিত এই ষোড়শ বর্ষীয় সুন্দর কিশোর শুকদেব চলিয়াছিলেন পথ

বাহিয়া। পথে পড়িল একটি নদী, তাহাতে স্নানরতা বিবস্ত্রা অপ্সরার দল। শুকদেবকে দেখিয়াও তাঁহাদের মন বিচলিত হইল না, দেহ আবৃত হইল না বসনে!

পশ্চাতে আসিতেছেন বৃদ্ধ পিতা, বেদ-সঙ্কলয়িতা মহামুনি বেদব্যাস। মুহূর্তে বসন সংবৃত করিয়া তীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন লজ্জাবনতা অপ্সরাগণ!

ব্যাসদেব বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আমি স্থবির বৃদ্ধ আর আমার পুত্র উদ্ভিন্নযৌবন, সুন্দর, সুকুমার। আমাকে দেখিয়া তোমরা সংযত হইলে, কিন্তু কই, আমার পুত্রের সম্মুখে তো তোমাদের লজ্জা হইল না?'

হাসিয়া উঠিলেন গন্ধর্বকন্যাগণ, 'আপনার স্ত্রী-পুরুষে ভেদজ্ঞান আছে মহর্ষি। কিন্তু আপনার পুত্রের তাহা নাই। তাই তাঁহার সম্মুখে লজ্জারও কোনও প্রশ্নই উঠে নাই আমাদের মনে।'

সেই শুকদেব বসিয়া আছেন গভীর নিস্তব্ধ বনভূমির শান্ত নীরবতায়, ব্রহ্মসমাধিতে মগ্ন—দিনের পর দিন অতিক্রান্ত হইয়া যাইতেছে, কিন্তু ব্যুত্থানের কোন লক্ষণই নাই, নাই কোন চেতনার সাড়া, কিন্তু প্রশান্ত জ্যোতির্লেখা ঘিরিয়া আছে বদনমণ্ডল। ব্যাসদেব অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করিতেছেন কখন ব্যুত্থিত হইবেন পুত্র, কখন তপস্যালব্ধ জীবনশেষের ধন, আনন্দ-রসঘন ভাগবতী কথা শুনাইবেন পুত্রকে, জগতে কে আর আছেন অধিকারী? তবে কি জগৎ এ আনন্দ হইতে বঞ্চিত থাকিবে?

অধীর আগ্রহে ব্যাসদেব রাখাল-বালকদের কণ্ঠস্থ করাইলেন ভাগবতের কয়েকটি শ্লোক, শুকদেবের কানের কাছে বালকগণ মধুর সুরে গাইতে লাগিল সেই 'লোকবত্তু লীলাকৈবল্যো'র কথা।

ব্রহ্মভূত শুকদেবের শ্রবণে পৌঁছিল সে ভাগবতী কথা, কৃষ্ণের মোহন বাঁশরির সুরে হৃদয় পরিপ্লুত হইয়া উঠিল, সুধারসে সিক্ত হইয়া উঠিল প্রাণ! চোখ মেলিয়া চাহিলেন শুকদেব—সমস্তই ব্রহ্মময়, সমস্তই শ্যামময়, সমস্তই রসময় 'রসো বৈ সঃ,' যিনি জ্ঞান, তিনিই প্রেম, তিনিই আনন্দ!

ভাগবতী কথার বক্তা হইলেন ব্রহ্মর্ষি, আত্মারাম, আজন্ম ব্রহ্মচারী শুকদেব আর শ্রোতা হইলেন মরণব্রতী অনশন-অবলম্বনকারী মহারাজ পরীক্ষিত এবং সহস্র সহস্র সিদ্ধ সাধক মুনি-ঋষি। জগতের বিস্মিত নয়ন আর মুগ্ধ শ্রবণের সম্মুখে উদ্‌ঘাটিত হইল বেদান্তের রূপায়ণ ও রসায়ন! এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব, এক বহু হইলেন (একোঽহম্ বহু স্যাম্), রসতত্ত্ব আকার প্রাপ্ত হইলেন

রাসলীলায়, যত গোপী তত কৃষ্ণপ্রেম ও রসের বহু-বিকশিত, বহু পল্লবিত আনন্দ-লীলাবিহার।

ইহাই ভাগবতী কথা, ইহাই প্রেম ও প্রেমের চরম পরিণতি—মহাভাব। মহাভাব-স্বরূপা শ্রীমতী রাধিকা—কৃষ্ণময়ী কৃষ্ণ-তাদাত্ম্যপ্রাপ্তা ; মিলনেও চরম আনন্দ, বিরহেও তাই। 'বাহে বিষজ্বালা', কিন্তু ভিতরে অমৃতপ্লাবন। কৃষ্ণ-বিরহের ক্রন্দনেও কত আনন্দ, সেই অতলস্পর্শী বিরহের এতটুকু ছোঁয়া, জীবের তাহাই কাম্য, তাহাই সাধনা, তাহাই সাধ্য। মিলনে বিরহে বেদনায় সেই পূর্ণত্বেরই অভিব্যক্তি, বিরহেও তাহার বিয়োগ নাই—

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে॥

মুগ্ধ হইলেন প্রকাশানন্দ—আনন্দ প্লাবনে মগ্ন হইলেন সন্ন্যাসীসমাজ।

প্রভু বলিলেন, 'এই পূর্ণ শক্তিমান্ ব্রহ্মস্বরূপ ; লীলা বাদ দিলে তাঁহার পূর্ণতার হানি হয়, জীবের তাহাতে অপরাধ হয়।'

মীমাংসা, সাংখ্য-পাতঞ্জল, ন্যায়-বৈশেষিক ব্রহ্ম সম্পর্কে প্রত্যেক দর্শনের বিভিন্ন মত। ভগবান ব্যাস সমস্ত মত আবর্তন করিয়া তার পরে ব্রহ্মের স্বরূপ-নির্ণয়ের জন্য 'ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করিলেন।

বেদান্ত-মতে 'ওম ইতি ব্রহ্ম'—ওঙ্কার তথা প্রণবই ব্রহ্মের স্বরূপ, প্রতীক এবং বাচক। ব্রহ্ম তথা ওঙ্কার হইতেই বিশ্বের সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয়। ওঙ্কারই আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম এবং 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি'—আনন্দ হইতেই সমস্ত ভূতের জন্ম, আনন্দ দ্বারাই জাত ভূতসমূহ জীবনধারণ করে এবং পরে আনন্দেই প্রবেশ করে।

কাজেই ওঙ্কার শক্তিরই বাচক এবং ইহাই মহাবাক্য। 'এতদ্ বৈ সত্যকাম পরঞ্চ অপরঞ্চ ব্রহ্ম যদ্ ওঙ্কারঃ'* —ওঙ্কারই পরব্রহ্ম এবং অপর ব্রহ্ম—ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান, এই দৃশ্যমান জগৎ, এবং ত্রিকালের অধীন ও অতীত সমস্তই এই ওঙ্কার তথা ব্রহ্ম। এই ওঙ্কারকে উপাসনা করাই বিধি। 'তত্ত্বমসি' বাক্য এই ওঙ্কারেরই অন্তর্গত ; 'তত্ত্বমসি' বাক্যে জীব ও ব্রহ্মের স্বরূপ-জ্ঞান লাভ হয়, কিন্তু শক্তিমান সমগ্র ব্রহ্মের স্বরূপ জানা যায় মহাবাক্য প্রণবের উপাসনায়। এই প্রণবই জীবকে আনন্দলীলার ভিতর দিয়া চরম তত্ত্বে পৌঁছাইয়া দিতে সমর্থ।

* প্রশ্নোপনিষৎ ৫।২।

সৃষ্টির প্রাক্কালে ভগবান ব্রহ্মাকে যে 'চতুঃশ্লোকী' উপদেশ করিয়াছিলেন, ব্রহ্মা তাহা নারদকে বলেন, নারদ আবার তাহা ব্যাসদেবকে বলেন। বেদ বিভাগ করিয়া 'বেদান্তসূত্র' রচনা এবং অন্যান্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াও ব্যাসদেব যখন পূর্ণ আনন্দের সন্ধান না পাইয়া তাহা লাভের আশায় ধ্যানস্থ হইলেন, তখনই তিনি এই চতুঃশ্লোকী পাইলেন। গায়ত্রীর যে অর্থ, চতুঃশ্লোকীরও অর্থ তাহাই। ভগবান ব্যাসদেব গায়ত্রীর অর্থানুরূপ শ্লোকেই 'ভাগবত' আরম্ভ করেন—

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি॥

—অর্থাৎ যাঁহা হইতে জগৎপ্রপঞ্চের সৃষ্টি-আদি, যিনি ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদ প্রকাশ করেন, স্বীয় তেজ দ্বারা যিনি কুহককে নিরস্ত করেন, সেই সত্যস্বরূপ পরমপুরুষের ধ্যান করি।

ইহা ছাড়া 'বেদান্তসূত্রে' বেদ ও উপনিষদের যে যে ঋক সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়াছে, শ্রীমদ্‌ভাগবতেও সেই সেই ঋকই শ্লোকাকারে নিবদ্ধ হইয়াছে। একটি শ্লোক এই—

আত্মাবাস্যমিদং বিশ্বং যৎ কিঞ্চিজ্জগত্যাংজগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্॥ —ভাঃ ৮।১।১০

কাজেই ব্যাসদেব সর্বশেষে যে শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশ করিলেন তাহা বেদান্তেরই ভাষ্য—এবং লীলাপুরুষোত্তম রসস্বরূপ ব্রহ্মের আনন্দবিলাসেরই প্রকাশ।

সেই আনন্দব্রহ্মকে লাভ করাই জীবের কাম্য, 'ভাগবত' জীবকে সেই পথের সন্ধানই দিতেছেন। জীবের সম্বন্ধ, সেই পরম সচ্চিদানন্দ পুরুষ!

বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্‌জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥ —ভাঃ ১।২।১১

পরাজ্ঞান আর পরাভক্তি একই বস্তু, পার্থক্য কেবল আস্বাদন বৈচিত্র্যে। সাধ্যবস্তু যেমন আনন্দস্বরূপ, সাধনাও তেমনই আনন্দময়। শুষ্ক জ্ঞানে অথবা শক্তিহীন ভাষ্যে সে আনন্দের স্পর্শমাত্র লাভ করাও সুদূরপরাহত। কাজেই শ্রীমদ্ভাগবত জীবকে সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন-তত্ত্ব উপদেশ করিতেছেন চরম আনন্দলাভের জন্যই। 'সম্বন্ধ'-তত্ত্ব শ্রীভগবান, 'অভিধেয়' সাধন—ভক্তি, এবং 'প্রয়োজন' পঞ্চম পুরুষার্থ- প্রেম। এই প্রেমধন লাভ করিলেই জীব কৃতকৃতার্থ

হন, আর তাঁহার কিছুই চাওয়া-পাওয়ার থাকে না ; ভক্তের কাছে ব্রহ্মানন্দ প্রেমানন্দ হইতে অনেক ন্যূন।

প্রকাশানন্দ মুগ্ধ হইলেন, লোভাতুর হইয়া উঠিল মন-প্রাণ। একদিন দেখিলেন পরম-প্রেমের প্রকাশ -অশ্রু-স্তম্ভ-পুলক-নৃত্যের দিব্যানন্দ শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যের দেহে। সঙ্গে সঙ্গে ভাসিয়া গেল জ্ঞানের কঠোরতা—ঐ অপার্থিব আনন্দ-লাভের জন্য প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠল, বুঝিলেন— জ্ঞানই ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মই আনন্দ, তিনিই রস এবং তিনিই রসিক, তিনি শক্তিমান্। তপঃকৃশা পার্বতীর মতোই ব্রহ্মবিদ্যা যাঁহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, সেই সত্য-শিব-সুন্দরের আবির্ভাব হইল সম্মুখে—সেই পরমপতির দর্শনে আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিলেন বিদ্যারূপিণী বধূ, জীবননাথের পদতলে উৎসর্গ করিলেন আপনাকে। প্রিয়-মিলনের আনন্দ নিবিড়তর হইতে লাগিল ক্ষণে ক্ষণে, আর তাহাতে বিচ্ছেদ রহিল না।

·বিদ্যাবধূজীবনং আনন্দাম্বুধিবর্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং সর্বাত্মস্নপনং

জ্ঞানের নিমজ্জন হইল প্রেমে—আনন্দের আর অবধি রহিল না। সে সুধাসমুদ্রে নিমজ্জিত হইয়া দেহ-মন-প্রাণ সিক্ত স্নিগ্ধ হইয়া গেল—প্রতিপদে পূর্ণামৃত আস্বাদন। প্রকাশানন্দ প্রেমের দীক্ষা গ্রহণ করিলেন প্রেমাবতার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের কাছে।

হরিনাম সাধককে যে বিদ্যা-অবিদ্যার পারে উত্তীর্ণ করাইয়া দিয়া নামীর সহিত মিলন করাইয়া দেন, তাহার দৃষ্টান্ত দেখা গেল ; কিন্তু কিরূপে নাম করিলে সে-নাম ফলপ্রদ হয়, তাহা প্রভু বলিলেন তৃতীয় শ্লোকে—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥

কবিরাজ গোস্বামী 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত'-গ্রন্থে ইহার ভাবানুবাদে বলিয়াছেন :

উত্তম হঞা আপনাকে মানে 'তৃণাধম'।
দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম।
বৃক্ষ যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়।
শুখাইয়া মৈলে কারে পানি না মাগয়॥
যেই যে মাগয়ে তারে দেয় আপন ধন।
ঘর্ম-বৃষ্টি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ।
উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি 'কৃষ্ণ অধিষ্ঠান'॥

নবদ্বীপ, শান্তিপুর প্রভৃতি বাংলার বিভিন্ন অঞ্চল হইতে শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈতাচার্য, শ্রীবাস, মুরারি, মুকুন্দ প্রভৃতি ভক্তগণ তাঁহাদের প্রাণগৌরের সঙ্গে মিলিত হইবার আকুল আগ্রহে দীর্ঘ কঠিন পথ পরিক্রমান্তে নীলাচলে সমুদ্রের তীরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। একদিকে অসীম অনন্ত সুনীল সাগর আপন অন্তরের পূর্ণতাকে প্রকাশ করিতেছে তরঙ্গে তরঙ্গে, সেই তরঙ্গ আসিয়া যেন সীমা খুঁজিতেছে শুভ্র বালুকাময় বেলাভূমিতে, অপর দিকে আর একটি অনন্তবিস্তারী ঘনকৃষ্ণ সাগর, আপন অন্তরের অহেতুক আনন্দকে প্রকাশ করিতেছেন লীলাতরঙ্গে, সেই তরঙ্গ আসিয়া আপনাকে উৎসর্গ করিতে চাহিতেছে এক স্নিগ্ধ জ্যোতির্ময় গৌর-তটভূমিতে। আত্মসমর্পণের সুতীব্র গতিবেগে কত শত স্রোতস্বিনী সাগরে আসিয়া মিলিতেছে—সাগরও যেন স্ফীত হইয়া উঠিয়াছে ভক্তহৃদয়-জাহ্নবীধারার স্পর্শ কামনায়। প্রভু অধীর আনন্দে অগ্রসর হইয়া আসিয়া পথে দাঁড়াইয়াছেন, দূর হইতেই সুগম্ভীর মেঘগর্জনের মতো মৃদঙ্গ-মন্দিরার ধ্বনি ও সংকীর্তনের রোল শোনা যাইতেছে। রাজপথের দুইধারে আগ্রহাকুল নীলাচলবাসী, রাজহর্ম্যের বাতায়নে প্রতীক্ষমাণা রাজবধূ, রাজবালা, হর্ম্যশিখরে প্রতীক্ষারত মহারাজ প্রতাপরুদ্র—সঙ্গে রাজপণ্ডিত বাসুদেব সার্বভৌম। ভক্ত-ভগবানের মিলন-দর্শনের আশায় সকলেই আগ্রহে আকুল।

সমুদ্রসঙ্গমে আসিয়া সমস্ত ধারা একত্র মিশিয়া গেল, রাজপথ প্লাবিত হইয়া গেল আনন্দতরঙ্গে।

দীর্ঘ বিচ্ছেদের অবসান, প্রভু-ভক্ত সকলের চোখে জল, প্রগাঢ় আলিঙ্গনে-বদ্ধ নদী ও সাগর, ভক্ত ও ভগবান! ধীরে ধীরে, মিলনের প্রথম আনন্দবেগ প্রশমিত হইয়া আসিল, সজল প্রসন্ন নয়ন মেলিয়া কাহাকে খুঁজিতেছেন প্রভু, 'হরিদাস কোথায়?'

দূরে পথের প্রান্তে ধূলায় লুটাইতেছেন ভক্তশ্রেষ্ঠ হরিদাস। 'রাজপথে—জগন্নাথের ভক্ত সেবকের চলার পথে পদ রাখিবার অধিকার কোথায় আমার, আমি নীচকুলজাত অধম, অভক্ত!'

প্রভু আসিয়া কাছে দাঁড়াইলেন, দূর হইতে দণ্ডবৎ লুটাইয়া পড়িলেন হরিদাস, প্রভুর চরণের উদ্দেশ্যে। প্রভু স্বহস্তে হরিদাসকে উঠাইলেন, নিবিড় গাঢ় আলিঙ্গনে হৃদয়ে বদ্ধ করিয়া বলিলেন, 'হরিদাস, এত দৈন্য করিও না, দেখিতে কি পাও না আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে?'

'প্রভু গো!' কাঁদিয়া উঠিলেন হরিদাস! 'তুমিও কি দেখিতে পাও না তৃণের চেয়েও যে অধম তাহাকে এত মান দিলে অভিমানে সেও যে ফাটিয়া যায়?'

উড়িষ্যারাজগুরু কাশী মিশ্রের ভবনে প্রভু আছেন, নিকটেই এক নিভৃত উদ্যান। প্রভু কাশী মিশ্রের কাছে নিভৃত ভজনের জন্য সেই উদ্যানস্থিত ছোট একটি কুটির প্রার্থনা করিয়া লইলেন। তারপর হরিদাসকে লইয়া আসিলেন ঐ কুটিরে আপন একান্ত সান্নিধ্যে। দীনাতিদীন হরিদাস আপনার এই সৌভাগ্যে ধন্য হইয়া গেলেন, দিনে একবার জগন্নাথ-মন্দিরের চূড়াগ্র দর্শন করেন, দিনে একবার প্রভু আসিয়া দর্শন দান করেন তাঁহাকে, এই তো পরমপ্রাপ্তি—হরিদাসের চাওয়া-পাওয়ার আর কিছুই রহিল না বাকী! গৌড়ের ভক্তগণ-সঙ্গে সারাদিন প্রভুর কত আনন্দ—কীর্তন, ভোজন, সমুদ্র-অবগাহন—দূর হইতে সেই আনন্দলহরী হরিদাসের কানে ভাসিয়া আসে, নির্জন কুটিরে বসিয়াই হরিদাস সে-আনন্দে আপনাকে মিলাইয়া দেন।

সারাদিন নাম করেন হরিদাস, প্রভুর সেবক গোবিন্দ আসিয়া প্রসাদ দিয়া যান, দিনান্তে হরিদাস তাহা গ্রহণ করেন।

'তৃণাদপি সুনীচ' হরিদাস, কিন্তু প্রভু জানেন 'তরোরিব সহিষ্ণু', শুধু তরু নয়, বিরাট্ বনস্পতি হইতেও অধিকতর সহিষ্ণু হরিদাস এবং তাহা হইতেও অধিকতর ছায়াশীতল! তাই নবদ্বীপে মহাপ্রকাশের দিনে প্রভু ডাকিলেন—'হরিদাস! কোথায় তুমি, একবার আসিয়া আমায় দর্শন কর। এই কলিকালে পৃথিবীতে ভক্তি নাই, ভক্ত নাই বলিয়া যে তোমার তীব্র দুঃখ, আচার্য অদ্বৈতের যে ব্যাকুল আহ্বান, তাহার জন্যই তো আমাকে শীঘ্র প্রকাশিত হইতে হইল।

'হরিদাস! তুমি হরিনাম কর, তোমার শুধু এই অপরাধে যেদিন মুলুকের যবন-অধিপতি তোমাকে কঠোর অত্যাচারে জর্জরিত করিতেছিল, সেদিন কি বৈকুণ্ঠে আমার আসন কাঁপিয়া উঠে নাই, দুর্দম অপ্রতিহত বেগে আমার সুদর্শন-চক্র কি ভক্ত রক্ষা করিতে নামিয়া আসে নাই? সেইদিন খণ্ড-ছিন্ন-বিছিন্ন হইয়া যাইত তোমার প্রহারকারিগণ, কিন্তু কি মহৎ তোমার করুণা, কি বিশাল তোমার হৃদয়, তুমি আমাকে স্তব্ধ করিয়া দিলে, প্রার্থনা করিলে—"প্রভু! যাহারা আমাকে আঘাত করিতেছে তাহারা অজ্ঞান, তুমি তাহাদের দোষ গ্রহণ করিও না দয়াল, তাহাদের ক্ষমা করো!" '

'কি করিব, আমি নিরুপায়! তোমার আঘাত যে আমার বক্ষ বিদীর্ণ করিয়া দিতে চায়? আমি পৃষ্ঠ পাতিয়া দিয়া তোমাকে আড়াল করিয়াছিলাম হরিদাস, এই দেখ সেই নিদারুণ নির্যাতনের চিহ্ন আজও রহিয়াছে আমার দেহে!'

'হরিদাস কাঁদিয়া উঠিলেন, 'একি করিয়াছ, প্রভু? দীনের ব্যথা নিজ অঙ্গে

নিয়া এমনি করিয়াই কি তাহাকে রক্ষা করিতে হয়, দীননাথ? কি প্রয়োজনে লাগিবে এই তুচ্ছ দেহ?'

যশোহরের বেনাপোলের বুঢন গ্রামে যবনকুলে হরিদাস জন্মগ্রহণ করেন। আশৈশব সংসার-বিরক্ত, ভগবদনুরক্ত হরিদাস যৌবনে স্বগ্রাম ত্যাগ করিয়া ফুলিয়া-শান্তিপুরে এক নির্জন গুহায় বসিয়া ধ্যান ভজন ও নাম-কীর্তনে মগ্ন থাকেন, হয়তো বা আচার্য অদ্বৈতের ও মুষ্টিমেয় কতিপয় ভক্তের সঙ্গসুখ-লালসাও আছে মনে।

মুলুকের যবন-অধিপতি যখন জানিতে পারিল—স্বধর্মাচরণ ত্যাগ করিয়া হরিদাস হিন্দু দেবতার নাম করিতেছে, তখন শাহী দরবারে হরিদাসের ডাক পড়িল। নির্ভীক ভক্ত নাম করিতে করিতে আসিয়া অধিপতির সম্মুখে দাঁড়াইলেন।

সুকুমার সুদর্শন যুবকের নির্ভীক প্রসন্ন মুখের দিকে চাহিয়া অধিপতির মনে শ্রদ্ধার উদয় হইল, আসনে বসিবার অনুরোধ করিয়া তিনি হরিদাসকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কেন ভাই! স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া তুমি বিধর্মীর পথ গ্রহণ করিয়াছ, কেনই বা পরম করুণাময় নিখিল-বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্‌তালার নাম পরিত্যাগ করিয়া হরিনাম জপ করিতেছ?'

মৃদু মধুর হাস্যে হরিদাস কহিলেন, 'তাহাতে দোষ কি শাহানশাহ্, যিনি আল্লাহ্, তিনিই কি হরি নহেন? আল্লাহ্ এক অদ্বিতীয়, তাঁহার কি দ্বিতীয় আছে?' মুলুকের অধিপতি বলিলেন, তাহাই যদি না থাকে, তবে তুমি কেন নিজ উপাস্য আল্লাহ্‌র নাম ত্যাগ করিয়া অন্য নাম গ্রহণ করিয়াছ? তোমার ধর্মই কি তোমাকে পূর্ণতা দিতে পারে না?'

ধীর প্রশান্ত কণ্ঠে হরিদাস বলিলেন, 'যিনি এক অখণ্ড, তাঁহারই বিভিন্ন নাম, বিচিত্র প্রকাশ। একই ব্যক্তি. কেহ তাঁহাকে ডাকে পিতা, কেহ পুত্র, কেহ ভাই। তাহাতে কি তাঁহার ব্যক্তিত্ব খণ্ডিত হইয়া যায় বাদশাহ্? যাঁহার যে নামে, যে ভাবে রুচি, তিনি সেই নামে, সেই ভাবেই আল্লাহ্‌কে ডাকেন, তাহাতে আল্লাহ্ নারাজ হন না।'

অধিপতি বলিলেন, 'কিন্তু ভাই, যে হিন্দুগণকে দেখিলে ঘৃণায় আমরা অন্ন পর্যন্ত গ্রহণ করি না, তুমি উচ্চধর্মাশ্রয়ী, উচ্চকুলজাত হইয়াও কেন তাহাদের ধর্ম গ্রহণ করিয়াছ?'

ক্ষুব্ধ হইয়া হরিদাস বলিলেন, 'কে ছোট, কে বড় মহারাজ! এই দীন দুনিয়ার মালিকের কাছে সকলেই কি সমান নহে?'

পাশেই ছিলেন কাজী, দরবারের বিচারক। হরিদাসের স্পর্ধা তাঁহার সহ্যের

সীমা অতিক্রম করিল, সক্রোধে বলিয়া উঠিলেন, 'বিধর্মী! বিশ্বাসঘাতক! প্রাণদণ্ডই তোমার বিধান! কুকুর দিয়া হত্যা করাইলেও তোমার প্রায়শ্চিত্ত পূর্ণ হয় না!

'তবু শোন! শেষবারের মতো তোমাকে বলিতেছি--নিজ শাস্ত্র উচ্চারণ করিয়া, কলেমা জপ করিয়া তোমার কলুষিত রসনার প্রায়শ্চিত্ত যদি কর, তবে তোমার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা রহিত করিতেও পারি।'

পরম অভয়পদে আত্মসমর্পণ করিয়া 'অভীঃ' হইয়াছেন ভক্ত, বলিলেন—

খণ্ড খণ্ড যদি হই, যায় দেহ প্রাণ,
তবু আমি বদনে না ছাড়িব হরিনাম। —চৈঃ ভাঃ

অপরিসীম ক্রোধ ও ঘৃণায় কাজীর দুই নয়ন আরক্ত হইয়া উঠিল, মুলুকপতির দিকে ফিরিয়া বলিলেন, 'না বাদশাহ্, এই নরকের কীট কাফেরের আর ক্ষমা নাই, ইহাকে কঠোর বেত্রাঘাত করা হোক—একবার নয়, একস্থানে নয়—বাইশ বাজারে বাইশ বার।'

প্রহরীবেষ্টিত বন্দী হরিদাস চলিয়াছেন, চোখে-মুখে আতঙ্কের এতটুকু ছায়ামাত্রও নাই, কণ্ঠ হইতে উচ্চারিত হইতেছে ভুবনমঙ্গল হরিনাম। রাজপথের দুইপাশে জনতা কেহ-বা হরিদাসের নিগ্রহ-আশঙ্কায় ব্যাকুল—যবন হইয়াও হরিনাম-উচ্চারণের ঘোর অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি হইবে ভাবিয়া আবার কোন-বা উচ্চ-কুলজাত ব্রাহ্মণ আনন্দে আকুল।

এক বাজার, দুই বাজার, তিন বাজারের অধিক কোন দিন কাহাকেও প্রহার করিতে হয় নাই, বেত্রাঘাত-খণ্ডিত দেহ ছাড়িয়া প্রাণ বাহির করিতে এ পর্যন্ত কোন অপরাধীকেই চতুর্থ বাজারে যাইতে হয় নাই। ভীমকান্তি যমদূতসদৃশ প্রহারকারীরা পর্যন্ত বিস্মিত, 'এ কি দৈবী মায়া! নিদারুণ তীব্র বেত্রাঘাতে জর্জরিত হইতেছে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, রুধিরধারায় ধরণী লিপ্ত! বাইশ বাজারে আঘাত করা হইল, তথাপি মৃত্যু নাই, নাই এতটুকু আর্তনাদ, কে এই ব্যক্তি?' দর্শকগণ পর্যন্ত যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন, কেহ বা কাতর আবেদন জানাইতেছেন, 'ওগো বন্দীরা! আমাদের কাছ হইতে যত খুশি অর্থ লও, নিবৃত্ত করো তোমাদের এই পাশবিক অত্যাচার!'

হরিদাসের অঙ্গে রুধিরধারা, নয়নে প্রেমাশ্রু. ডুবিয়া আছেন নাম-রস-সমুদ্রে—'কৃষ্ণ!' 'কৃষ্ণ!' 'রক্ষ মাং' নয়, ডাকিতেছেন 'হে কৃষ্ণ, হে পতিত-পাবন, 'রক্ষ তান্'—এই অজ্ঞান দ্রোহকারীদের রক্ষা করো, ইহাদের অজ্ঞানতা ক্ষমা করো প্রভু!' কিন্তু আকাশ হইতে নামিয়া আসিল প্রলয়বহ্নি, রুদ্রতেজে নামিয়া আসিল

সুদর্শন-চক্র। কিন্তু। কোথায় কাহার মস্তকে পতিত হইবে এই উদ্যত কঠোর বজ্র, হরিদাসের কল্যাণকামনা যে ঐ প্রহারকারীদের চারিদিক ঘিরিয়া রহিয়াছে। সুতরাং এইবার সুদর্শনধারীকেই নামিয়া আসিতে হইল—এমনি করেবারই নামিয়া আসিতে হয়। পাহাড়ে, সমুদ্রে, জ্বলন্ত অনলে বক্ষ পাতিয়া ভক্তকে রক্ষা করিতে হয়, সুধা মনে করিয়া বিষ গ্রহণ করিতে হয় তাঁহাকেই, ভক্ত তো তাঁহাকেই ডাকেন নাই, নির্দেশ করিয়া দেন নাই তাঁহার কর্তব্য, তাই কর্তব্যের চেয়েও বেশী করিতে হয়, ভাগ করিয়া লইতে হয় ভক্তের ব্যথার অংশ। হরিদাসের অঙ্গও আবৃত করিয়া রহিলেন কৃষ্ণ-জলধর, অমৃতধারা-বর্ষণে হরিদাসের সকল জ্বালা জুড়াইয়া গেল।

রক্ষীরা হার মানিল, 'ইনি কি সাধারণ মানুষ? না জানিয়া কোন পীর বা মহাসাধকের অঙ্গে আঘাত করিতেছি নিষ্ঠুরের মতো?'

করজোড়ে রক্ষীরা বলিল, 'ওগো মহাতপস্বী। বাদশাহের আদেশে নিষ্ঠুর ঘাতক আমরা তোমার সিদ্ধদেহে আঘাতের পর আঘাত করিয়াছি, তথাপি তুমি আমাদের ক্ষমা কর। তুমি মৃত্যুঞ্জয়ী, কিন্তু আজ তোমার মৃত্যু না ঘটিলে রাজশাসনে আমাদেরও মৃত্যু বরণ করিতে হইবে।

হরিদাস হাসিয়া উঠিলেন, 'তাই কি? বেশ, বেশ, এই আমি মরিতেছি।' হরিদাস যোগস্থ হইলেন, নিস্তরঙ্গ সমাধিভূমিতে ক্রমে মন স্থির করিয়া চলিয়া গেল, দেহে জীবনের বিন্দুতম চিহ্নও আর দেখা গেল না। সেই সমাধিবান্ পুরুষের দেহটি মুলুকপতির নিকটে বহিয়া যাওয়া হইল। অধিপতি তাঁহার দেহ কবরস্থ করিবার আদেশ দিলেন, কিন্তু কাজীর ক্রোধ তখনও প্রশমিত হয় নাই, তিনি বলিলেন, 'ইসলাম-ধর্মমতে কবর দিলে তো এই কাফেরের মুক্তিই লাভ হইবে, অনন্ত স্বর্গ এই পাপীর প্রাপ্য নয়, ইহাকে নদীতে নিক্ষেপ করা হোক।

রক্ষীরা বহু চেষ্টা করিলেন, সেই পুণ্য দেহকে একচুল নাড়বার সামর্থ্য হইল না, ভক্তশ্রেষ্ঠ হরিদাসের অজ্ঞাতেই যোগবিভূতি তাঁহার দেহ আশ্রয় করিলেন। অধিপতি, কাজী ও দর্শকগণ বিস্ময়বিমূঢ় হইয়া রহিলেন, দীর্ঘ সময় কাটিয়া গেল, ধীরে ধীরে হরিদাস ব্যুত্থিত হইলেন, ক্ষমাসুন্দর চোখে একবার সকলের দিকে চাহিলেন।

অধিপতি নতমস্তকে অগ্রসর হইয়া আসিলেন, সসম্ভ্রমে বলিলেন, 'হে সিদ্ধ তপস্বী। সত্যই আপনি মহাজ্ঞানী আল্লাহ্‌র অনুগ্রহভাজন। আপনি আমাদের ধৃষ্টতা মার্জনা করুন। আর অমরা আপনার সাধনপথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিব না, আপনি স্বচ্ছন্দে গঙ্গাতীরে গিয়া তপস্যা করুন।

নাম-মহামণি কণ্ঠে গাঁথিয়া ফিরিয়া আসিলেন হরিদাস তাঁহার নির্জন গুহায়!

শান্তিপুরবাসী আচার্য অদ্বৈত ও ভক্তগণ হরিদাসকে ফিরিয়া পাইয়া আনন্দে উল্লসিত হইয়া উঠিলেন, তাঁহাকে ঘিরিয়া আনন্দের যেন হাট বসিয়া গেল, কিন্তু হরিদাসের কুটিরে এত তীব্র জ্বালা কেন? যেখানে অহর্নিশি হরিনামামৃতের প্লাবন বহিতেছে, সেখানে কিসের এত দাহ?

কারণ অনুসন্ধান করিতে করিতে জানা গেল, তীব্র বিষধর এক মহানাগ সেই গুহাবিবরে বাস করে, তাহারই বিষের দাহে ভক্তগণ দগ্ধ হন।

ভক্তগণ হরিদাসকে শীঘ্র ঐ কুটির ত্যাগ করিবার অনুরোধ জানাইলেন, নতুবা তাঁহারাই বা কোন্ ভরসায় এইস্থানে আসিবেন? হরিদাস একটু বিস্মিত হইলেন, 'কই, তিনি তো কোন বিঘ্নই অনুভব করেন নাই এতদিন?'

তথাপি ভক্তদেব কষ্ট নিবারণ করা তাঁহার কর্তব্য, তাই বলিলেন, 'এইখানে যেই মহাশয় বাস করিতেছেন, তিনি যদি কৃপা কবিয়া এই গুহা ত্যাগ করিয়া যান তবেই ভালো, নতুবা আগামী কল্য আমিই এই স্থান ত্যাগ কবিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইব, আপনারা নিশ্চিন্ত হোন।' কালরূপী মহাসর্পেব সঙ্গে বাস কবিতেও হবিদাস কিছুমাত্র দ্বিধা করিতেন না, যদি না ভক্তগণের কষ্ট হইত।

সন্ধ্যা আসন্নপ্রায়, ভক্তসঙ্গে কৃষ্ণকথার রসাস্বাদন কবিতেছেন হবিদাস, এমন সময় দেখা গেল ধীরে ধীরে গৃহকোণ হইতে মাথা তুলিতেছে মহানাগ, লাল-নীল-পীত-কৃষ্ণ, বিচিত্র বর্ণে দেহ চিত্রিত, সুপ্রশস্ত ভয়ঙ্কর উজ্জ্বল ফণার দুইপাশে দুই আরক্ত নয়ন, নিঃশ্বাসে সুতীব্র হলাহল! ধীর হিল্লোলিত গতিতে সর্প যেন কুটির ত্যাগ করিতে উদ্যত হইল, ভক্তগণ ভয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া বহিলেন, শান্ত অবিচল হরিদাস সর্পের দিকে চাহিয়া রহিলেন ক্ষমাপ্রার্থনাব ভঙ্গিতে। সর্প মাথা নত করিয়া যেন ভক্তশ্রেষ্ঠ হরিদাসকে অভিবাদন জানাইয়া ধীরে ধীরে বাস্তু ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেল, হয়তো কোন সুদূর গহন অরণ্যে। ভক্তগণ নিশ্চিন্ত নির্ভয় হইলেন। তৃণ হইতে সুনীচ, তরু হইতেও সহিষ্ণু হরিদাস। কিন্তু 'অমানী মানদ' হওয়া, নিজে অমানী হইয়া অপরকে মান দেওয়া, কিংবা যে মান্য করে না তাহাকেও মান দেওয়া, তাহা কি সহজসাধ্য?

মহাপ্রভু শিক্ষা দিয়াছেন, 'জীবে সম্মান দিবে, জানি কৃষ্ণ অধিষ্ঠান'—শুধু মানুষ নহে, পশুপাখি-কীটপতঙ্গ সকলের মধ্যেই কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান, কাজেই শুধু 'জীবে দয়া' নয়, জীবের সেবা করিবে, জীবকে সম্মান দিবে ভগবৎ-জ্ঞানে। হরিদাসের জীবনে প্রভুর সমস্ত শিক্ষাই সার্থক হইয়াছে, তাই মূর্তিমান্ হিংসা এবং প্রলোভনও হরিদাসের পদমূলে আপনাদের বিসর্জন দিয়াছে অক্লেশে!

বেনাপোলের জমিদার রামচন্দ্র খান, ঐশ্বর্যগর্বে স্ফীত, ভক্তের মর্যাদা তো জানেন-ই না, অধিকন্তু ভক্তকে অপমান করাই জীবনের অন্যান্য নানা কদর্য ব্যসনের মতোই শ্লাঘ্য মনে করেন। একদিন শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে অপমান করিতেও তাঁহার বাধে নাই। এই ধনী জমিদারের সহিত নিষ্কিঞ্চন দরিদ্র ভক্ত হরিদাসের প্রতিযোগিতা করিবার সাধ্য নাই, অভিপ্রায়ও নাই। তাঁহার ঐশ্বর্যের মধ্যে ভক্তি, তাহারই আকর্ষণে দীনাতিদীন হইতে লক্ষপতি পর্যন্ত শত শত ভবব্যাধিগ্রস্ত রোগী হরিদাসের জীর্ণ কুটিরে সমাগত হন ব্যাধিশান্তির আশায়, নিরভিমান হরিদাস বিনামূল্যে নামামৃত বিতরণ করেন। রামচন্দ্র খানের তাহাও সহ্য হইল না—ঈর্ষার বিষে হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হইতে লাগিল, 'কপট সাধুত্বের' আবরণটি উন্মোচন করিয়া হরিদাসের 'আসল স্বরূপ' লোকচক্ষুর সম্মুখে প্রকট করিয়া লোকের ভক্তি খর্ব করিতে তিনি বদ্ধপরিকর হইলেন।

একদিন এক সুন্দরী পতিতাকে নিভৃতে কিছু অর্থ ও পরামর্শ দিয়া রামচন্দ্র খান উৎফুল্ল চিত্তে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন—অস্ত্র তাঁহার হাতেই আছে, প্রয়োগ করার অপেক্ষামাত্র—হরিদাসের 'ভাণ্ডামি' ঘুচাইতে বেশী দেরি হইবে না।

গভীর নিশীথে নানা অলঙ্কারে আভরণে সজ্জিতা সেই নারী হরিদাসের ভজন কুটিরে উপস্থিত হইল ; হরিদাস ভজনরসে মগ্ন, হাতে জপমালা—চিত্ত তন্ময় ; ছলনাময়ীর বহু-পরীক্ষিত বিলাস-কটাক্ষের বহু শরাঘাত হরিদাসের উপরে নিক্ষিপ্ত হইল, কিন্তু হরিদাস নির্বিকার, নিশ্চল! রমণী মনে মনে হাসিল, তাহার তূণে এই কয়টিমাত্র অস্ত্রই নহে, আরও আছে বহু সুতীক্ষ্ণ শর।

রমণীর অঙ্গসৌষ্ঠব ও যৌবনশ্রীতে হরিদাস যখন মোহগ্রস্ত হইলেন না, তখন সহসা রমণী রূপমুগ্ধ পতঙ্গের মতোই যেন আপনাকে হরিদাসের রূপ-শিখানলে বিসর্জন করিতে কৃতসংকল্প হইল। তাহার কাতর প্রার্থনার উত্তরে হরিদাস বলিলেন 'আমি ব্রতধারী, আমার ব্রত সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত তোমাকে আমি অঙ্গীকার করিতে পারি না, তুমি অপেক্ষা কর, আমি নামসংখ্যা পূর্ণ করিয়া লই, তুমি বরং ততক্ষণ বসিয়া নাম শ্রবণ কর।'

সারারাত্রি বৃথাই কাটিয়া গেল, নামও সমাপ্ত হইল না, রমণীর অভিলাষও পূর্ণ হইল না। ক্ষুণ্ণ ক্ষুব্ধ মনে রমণী নিশাশেষে উঠিয়া গেল, কিন্তু একেবারে নিরাশ হইল না।

সমস্ত শুনিয়া রামচন্দ্র খান যেন কতকটা হতাশ হইলেন, অস্ত্র শাণিততর করিবার উপদেশ দিয়া রমণীকে বিদায় দিলেন।

দ্বিতীয় রাত্রি। রমণী আসিয়া তুলসী প্রণাম করিয়া দ্বারে বসিল। মনোহারিণীর হাস্যে লাস্যে আজও হরিদাসের বিকারের কোন লক্ষণই দেখা গেল না, কিন্তু যেন লজ্জিত সুরে রমণীকে বলিলেন, 'কাল আমার ব্রত সমাপ্ত হয় নাই, তাই তোমাকে দুঃখ দিয়াছি, তুমি কিছু মনে করিও না, আজ ব্রত সমাপ্ত হইলেই তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে।'

অধিকতর আশায় বুক বাঁধিয়া রমণী প্রতীক্ষা করিতে লাগিল, কিন্তু বিধাতার কি লিখন, আজও রজনীর শেষ প্রহর ঘোষণা করিয়া পাখি ডাকিয়া উঠিল, কিন্তু হরিদাস তাহাকে ডাকিলেন না, আজও ব্রত সমাপ্ত হইল না। চরম নিরাশায় অপমানে যখন রমণী উঠিয়া দাঁড়াইল, ব্যথিত হরিদাস তাহার কাছে মার্জনা চাহিলেন। আগামী রাত্রিতে আর দেরি হইবে না, নিশ্চয়ই তাহার ব্রতশেষে তিনি তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিবেন।

তৃতীয় রাত্রি। আজ রমণীর মন আনন্দে পূর্ণ, সাধুর বাক্য মিথ্যা হইবে না, আজ নিশ্চয়ই তাহার মনস্কামনা পূর্ণ হইবে।

গভীর রাত্রি, আকাশের বুকে জাগিয়া আছে শুধু কয়েকটি স্তব্ধ তারা, জনপ্রাণী আর কেহই জাগিয়া নাই, এই তো সময়! রমণী অধীর আগ্রহে চাহিয়া আছে হরিদাসের দিকে, আর কত দেরি? সহসা কি এক পুলকের জোয়ার আসিয়া যেন ভাসাইয়া গেল তাহার সমস্ত মোহ-মলিনতা, হৃদয় যেন ময়ূরের মতো নৃত্য করিয়া উঠিল! একি পুণ্য জ্যোতি, একি আনন্দধারা তপস্বীর অঙ্গ হইতে বিচ্ছুরিত হইয়া আসিয়া তাহার সমস্ত দেহ-মন-প্রাণকে স্নিগ্ধ সিক্ত করিয়া দিতেছে! আকাশে কত আলো, বাতাসে কত না গান! দেহের অণু-পরমাণু সে আলোয়, সে সুরের ঝরনা-ধারায় যেন স্নান করিয়া উঠিল। তাহার দেহ আর দেহ-সঙ্গাভিলাষী নয়, এবার হৃদয় উন্মুখ, 'হে মহাপুরুষ! দাও দাও, আমার প্রাণ ভরিয়া, তৃষ্ণা হরণ করিয়া তোমার অমৃত-আনন্দের স্পর্শ আমাকে দাও।'

আপন দেহ-বিপণির কদর্য পসরার দিকে তাকাইয়া লজ্জায় রমণী বিবশ হইয়া গেল। কাহাকে ভুলাইতে আসিয়াছে সে এই দীন মলিন আবেদন লইয়া? রমণী হরিদাসের চরণতলে লুণ্ঠিত হইল, কণ্ঠে ব্যাকুল মিনতি, 'ওগো বৈরাগী, আমার এ স্খলিত শিথিল কামনার ভার আর আমি বহিতে পারিব না, তোমার তপস্যার বজ্রানলে আমার সকল কালো তুমি ধ্বংস করো, আমার কামনাকলুষিত দেহকে তোমার দেবালয়ের প্রদীপ করিয়া তাহাকে জ্বালাও প্রভু!'

হরিদাস আপন কল্যাণ-হস্তখানি তাহার মাথায় রাখিলেন, সেই পুণ্যস্পর্শে

তাঁহার দেহ-মন-চিত্ত পুণ্যময় হইয়া উঠিল, আত্মায় আত্মায় মিলনের এক সেতু রচিত হইয়া গেল নিমেষেই। হরিদাস বলিলেন, 'ওঠো নারী, তুমি সার্থক হও, তোমাকে পরমপতির সন্ধান দিবার জন্যই এই তিনদিন আমি প্রতীক্ষা করিয়াছিলাম, এইবার আমারও ব্রত পূর্ণ হইয়াছে, পরমপতির সহিত মিলনে তুমিও পূর্ণ হও।'

হরিদাসের আদেশে সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়া দিয়া মস্তক মুণ্ডন করিয়া পুণ্যশীতল সলিলে অবগাহন করিয়া শুচিস্মিতা দীক্ষাভিলাষিণী নারী আসিয়া দাঁড়াইলেন যুক্তকরে অশ্রুসজল চোখে।

হরিদাস তাঁহার কর্ণে নামমহামন্ত্র দান করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত দেহ-মন পুলকিত ধন্য হইয়া উঠিল!

গুরু হরিদাস আপন সাধনার শক্তিসঞ্চারিত ভজন-কুটির, আসন ও তুলসীমঞ্চ তাঁহাকে দান করিয়া চলিয়া গেলেন সুদূর কোন দেশে। সুদৃঢ় হইয়া সেই আসনে বসিলেন সাধিকা, একাহারে কাটিতে লাগিল দিনের পর দিন, তপঃক্লিশ তনুখানি ধীরে ধীরে হৃদয়নাথের অধিষ্ঠানযোগ্য মন্দির হইয়া উঠিল, মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হইলেন অপরূপ এক বিগ্রহ। সে-মন্দিরের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হইয়া আসিতে লাগিলেন কত সাধু, কত বা দর্শনার্থী বৈষ্ণব!

প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবী হৈলা পরম মহান্তি।
বড় বড় বৈষ্ণব তাঁর দর্শনেতে যান্তি॥ —চৈঃ চঃ

সাধু হরিদাস। শুধু জীবের অন্তরে কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান জানিয়াই তিনি সম্মান দিয়া সরিয়া আসিলেন না, রূপোপজীবিনীর অন্তরেও কৃষ্ণ-প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিয়া দিয়া আসিলেন, আপন তপস্যালব্ধ ধন সমর্পণ করিয়া আসিলেন অক্লেশে, এতটুকু ঘৃণার সঞ্চার হইল না মনে।

জীবনের প্রতিটি দিন-ক্ষণ-পল-কেও যিনি কৃষ্ণনামে অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছেন, বৃথা যাইতে দেন নাই, আজ জীবনসায়াহ্নে সেই হরিদাস নির্দিষ্ট সংখ্যা নামজপ সম্পূর্ণ করিতে পারেন না, তাই গোবিন্দের আনা প্রসাদের কণামাত্র স্পর্শ করিয়াই আবার বসেন আসনে, কিন্তু বার্ধক্যশিথিল দেহ যেন আর ভার বহিতে পারে না!

সেদিন হরিদাসের কুটিরে আসিয়া প্রভু বলিলেন, 'হরিদাস! গোবিন্দ বলিল, সংখ্যাজপ সারা হয় না বলিয়া তুমি আহার্য স্পর্শ কর না? নামে সিদ্ধ দেহ তোমার, এত জপে আর তোমার কি প্রয়োজন? এখন বৃদ্ধ হইয়াছ, নামের সংখ্যা কমাও।' হরিদাস সে কথার উত্তর না দিয়া বলিলেন, 'প্রভু! আমার একটি

প্রার্থনা রাখিবে বলো ! আমার মন বলে তুমি শীঘ্রই লীলা সংবরণ করিবে। এই ধূলীর ধরণীকে নন্দন-কানন করিয়া তুলিয়া, পরমুহূর্তেই তাহাকে শ্মশান করিয়া তুলিতে তুমি পারো এবং তাহাই করিতেছ যুগে যুগে বার বার ! আমাকে তোমার এই নিষ্ঠুর খেলা দেখাইও না দয়াল ! হৃদয়ে তোমার শ্রীপ্রাদপদ্ম ধারণ করিয়া, নয়নে তোমার রূপসুধা পান করিয়া, বদনে তোমার "কৃষ্ণচৈতন্য" নাম উচ্চারণ করিতে করিতে তোমার দীনাতিদীন হরিদাসের প্রাণত্যাগ হোক, ইহাই প্রার্থনা।'

প্রভুর চোখ অশ্রুসজল হইয়া উঠিল ; বলিলেন, 'হরিদাস ! তুমি ভক্তোত্তম, কৃষ্ণ তোমার ইচ্ছা নিশ্চয়ই পূর্ণ করিবেন, কিন্তু তুমি কেন এত নিষ্ঠুর হইতে চাও ? তোমাদের লইয়াই যে আমার সকল আনন্দ, সকল পূর্ণতা !' তুমি গেলে আমি কি লইয়া থাকিব বলো !'

দীন-ক্ষীণ হরিদাসের কণ্ঠে আজ যেন দাবীর শক্তি আসিল, বলিলেন, 'ওগো রাজাধিরাজ ! তোমাব কোটি কোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেব মধ্যে একটি পিপীলিকাব মৃত্যুতে যদি তোমার ক্ষতি হয়, তবে তাই হোক। তুমি মায়া ছাড়, আমার প্রার্থনা তোমাকে পূর্ণ করিতেই হইবে।'

বিষণ্ণ নয়নে প্রভু হরিদাসের দিকে চাহিলেন ; সেই চাহনিতে কি ছিল, আশ্বাস না অভয় ? অসুস্থ হরিদাস যেন সুস্থ নিরাময় হইয়া উঠিলেন। পরদিন বিশিষ্ট ভক্তগণ-সঙ্গে প্রভু আসিয়া হরিদাসের অঙ্গনে দাঁড়াইলেন ; বলিলেন—

'হরিদাস ! কহ সমাচার।'

হরিদাস কহে, 'প্রভু ! যে কৃপা তোমার !' হরিদাস ক্ষীণকণ্ঠে বলিলেন, 'আমার আর খবর কি প্রভু ! এইবার খবর তো দিবে তুমি, এই পারের খবর আমার শেষ। তুমিই জানো, কি খবর আছে সেই পারে।'

হরিদাসকে বহিরঙ্গনে আনিয়া শোয়ানো হইল। ভক্তসঙ্গে প্রভুও তাঁহাকে ঘিরিয়া ঘিরিয়া নামসংকীর্তন আরম্ভ করিলেন। হরিদাসের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে করিতে প্রভুর আনন্দবারিধি যেন ক্রমেই উদ্বেলিত হইয়া উঠিতে লাগিল। ভক্তগণ হরিদাসের পদধূলি লইয়া মাথায় অঙ্গে লেপন করিতে লাগিলেন, কম্পিত দক্ষিণ হস্তে হরিদাসও ভক্ত-পদধূলি গ্রহণ করিয়া মাথায় রাখিলেন।

অন্তিম মুহূর্ত ! হরিদাস নিজের সম্মুখে প্রভুকে বসাইলেন, তাঁহার দুই নয়নভৃঙ্গ প্রভুর রূপকমলের সুধাপানে বিবশ হইয়া রহিল, বদনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম উচ্চারণ করিতে করিতে নামের সহিত হরিদাস প্রাণ উৎক্রমণ করিলেন।

'কীর্তনীয়ঃ সদা হরিঃ'। সারাজীবন নামসাধনার ফল, স্বয়ং নামী আসিয়া

দাঁড়াইলেন সম্মুখে! মহাভারতের মহাপুরুষ ভীষ্মের মতোই হরিদাসের মহানির্বাণ হইল আপন ইষ্টের সম্মুখে!

হরিদাসের যবন-দেহ ঢাকিয়া গেল বালুকারাশির তলে, কিন্তু বিদেহী আত্মা মুক্ত বিহঙ্গের মতোই হয়তো বা দুই পাখা মেলিয়া আনন্দলীলায় সঞ্চরণ করিতে লাগিলেন অসীম অনন্ত চিদাকাশে!

মহাপ্রভু-কৃত চতুর্থ শ্লোক—

> ন ধনং ন জনং ন সুন্দরীং
> কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
> মম জন্মনি জন্মনীশ্বরে
> ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি॥ —চৈঃ চঃ

—হে জগদীশ! আমি তোমার চরণে ধন কামনা করি না, জন কামনা করি না, সুন্দরী পত্নী কিংবা কবিতা অর্থাৎ কাব্যপ্রতিভা বা পাণ্ডিত্য—কিছুই কামনা করি না, আমার একমাত্র প্রার্থনা এই যে, হে ঈশ্বর, তোমাতে যেন আমার জন্মে জন্মে অহৈতুকী ভক্তি থাকে।

এত পৃথিবীতে যখনই যে অবতার পুরুষ বা মহাপুরুষ অবতীর্ণ হইয়াছেন, তখনই তাঁহার আহ্বানে ছুটিয়া আসিয়াছেন কত শত শত ধনীর দুলাল, কত পণ্ডিত—ঐশ্বর্য, পাণ্ডিত্য, জননীর বক্ষবিদারী আর্তনাদ, যুবতী পত্নীর বিচ্ছেদজ্বালা—সমস্তই অগ্রাহ্য করিয়া!

মহাপ্রভুর পদতলেও সমবেত হইয়াছেন রূপ, সনাতন, রঘুনাথ, গোপীনাথ, গদাধর, জগদানন্দ, স্বরূপ—কত ঐশ্বর্যবান্, বিত্তবান্, বিদ্বান্! ঐশ্বর্য ও আরামের মোহ তাঁহাদিগকে বাধা দিতে পারে নাই, সংসার তাহার শত বাহুডোরেও তাঁহাদের বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই!

দাস-রঘুনাথ যখন সংসারের শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া বারেবারেই পালাইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন, তখন তাঁহার জননী একমাত্র প্রাণধনটিকে হারাইবার ভয়ে স্বামীর কাছে কাঁদিয়া পড়িয়াছিলেন, 'ওগো, উহাকে বাঁধিয়া রাখ, তবু ঘরে থাকুক সেই নিষ্ঠুর! ম্লান হাসি হাসিয়া রঘুনাথের পিতা বলিয়াছিলেন, 'ইন্দ্র-সম ঐশ্বর্য, অপ্সরা-সম স্ত্রী যাহার মন বাঁধিতে পারিল না, তুচ্ছ দড়ির বাঁধনে তাহাকে কেমন করিয়া ধরিয়া রাখিবে বলো!' গৌরের রঘুনাথকে কেহই বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই।

শ্রীসনাতন গৌড়ের বাদশাহের মন্ত্রী এবং মন্ত্রণাদাতাই নহেন, বাদশাহের বল-

ভরসা, এক কথায় বাদশাহের দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ ! শ্রীরূপও রাজসরকারে বড় কর্মচারী, তাঁহাদের জমিদারির তৎকালীন আয় বার্ষিক ছাপ্পান্ন লক্ষ টাকা ; এই অপার সম্মান ও ঐশ্বর্যের আরাম অবহেলায় ত্যাগ করিয়া যখন দুই ভাই প্রভুপদে আশ্রয় গ্রহণের আশায় দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া দণ্ডবৎ হইলেন, তখন প্রভু পরম সমাদরে, পরম আনন্দে দুই ভাইকে একেবারে অন্তরঙ্গ করিয়া লইলেন। কিছুকাল দুই ভাইকেই নিজের কাছে রাখিয়া ধীরে ধীরে আপন ভক্তিরত্ন-ভাণ্ডার রক্ষা করিবার উপযুক্ত আধার-রূপে গড়িয়া তুলিলেন। তারপর এক শুভক্ষণে জ্ঞান ভক্তি ও প্রেমের অমূল্য রত্নগুলি সেই আধারের নিভৃত মণিকোঠায় সযত্নে রক্ষা করিলেন। রত্নের দীপ্তিতে প্রাণ জ্যোতির্ময় হইয়া উঠিল—পূর্ণ ভাণ্ডার বক্ষে করিয়া প্রভুর আদেশে দুই ভাই চলিয়া আসিলেন বৃন্দাবনে।

কুসুমকোমল দুগ্ধফেননিভ শুভ্র শয্যা গৃহে যাঁহাদের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত, বৃন্দাবনের কঙ্কর-মিশ্রিত রুক্ষ ধূলায় আজ তাঁহারা শয়ন রচনা করিলেন! দীর্ঘ দিনের অভ্যস্ত আরাম ও সুখের নেশা জীর্ণ বস্ত্রের মতোই অনায়াসে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছেন, তথাপি হয়তো অবচেতন মনের অজ্ঞাতে কোথায় রহিয়াছে বিন্দুতম সুখ-অভ্যাসের রেশ! যমুনাতীরে অনভ্যস্ত উপাধানবিহীন বালুকাশয্যায় সনাতনের চোখে কিছুতেই নিদ্রা আসিতেছে না—হঠাৎ এক উপায় আবিষ্কৃত হইল। কতকগুলি কোমল বালুকা একত্র করিয়া উপাধানের মত হইলে পরম স্বস্তিতে সনাতন সহজেই নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। সহসা কাহার যেন কলকণ্ঠের হাস্যধ্বনিতে নিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল, চাহিয়া দেখেন—নীল বসনে হেম-তনু ঢাকা, কুঞ্চিত কালো কেশপাশে ঘিরিয়া আছে বদনকমল, অঙ্গসৌরভে আকাশ-বাতাস হইয়া উঠিয়াছে মধুময়—এক নবীনা কিশোরী বিদ্রূপের হাসিতে ওষ্ঠ-অধর কুঞ্চিত করিয়া ডাকিতেছেন অদূরবর্তিনী সখীকে—'সখী দেখ্! এই দেখে যা, সংসার ত্যাগ করে এসেছেন সাধু! আবার বিলাসিতা কত! বালিশ ছাড়া যাঁর ঘুম হয় না, তাঁর আবার বৃন্দাবন-বাসের সাধ কেন, তপস্যারই বা দরকার কি?'

'কে? ইনি কে, কেমন করিয়া জানিলে, আমার বৃন্দাবন-বাসের সঙ্কল্প?—তবে কি ইনিই বৃন্দাবনেশ্বরী শ্রীমতী?' চমকিত সনাতন ফিরিয়া চাহিয়া দেখেন, কোথায় কে? চারিদিকে শুধু গভীর রাত্রির নৈঃশব্দ্য, আকাশ অন্ধকারে ঢাকা, কেবল কালো যমুনা বহিয়া চলিয়াছে কলকল ছলছল রবে।

'জয় হোক বৃন্দাবনেশ্বরী, জয় রাধারানী, অধমের প্রতি কত তোমার করুণা!'

আরাম ও সুখনেশার ক্ষীণতম আভাসটুকুও যমুনার কালো জলস্রোতে মিলাইয়া দিয়া সনাতন ডুবিয়া গেলেন ধ্যানের গভীরে।

বৃন্দাবনের বহু লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করিলেন নিঃসম্বল দুই ভাই। গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহনের প্রতিষ্ঠা হইল রাজসমারোহে ; ভোগরাগ উপচারেরই বা কত আয়োজন !

কিন্তু নিষ্কিঞ্চন অযাচকবৃত্তি দুই ভাই দূরে দূরে দুই বনে সাধন-ভজন ও গ্রন্থাদি রচনায় নিমগ্ন রহিলেন।

পিতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীবও আসিয়া বৃন্দাবনে দুই জ্যেষ্ঠতাতের স্নেহ পক্ষচ্ছায়ায় আশ্রয় লাভ করিয়া ধন্য হইলেন। শ্রীরূপের হস্তেই তাঁহার শিক্ষা-দীক্ষার ভার অর্পিত হইল। শ্রীরূপ আপন সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়া শ্রীজীবকে ক্রমেই প্রকৃত বৈষ্ণব গড়িয়া তুলিতে লাগিলেন।

মহাপ্রভু শ্রীরূপ-সনাতনকে একদিকে যেমন বৃন্দাবনের লুপ্ত তীর্থ উদ্ধারের ভার দিয়াছিলেন, অপরদিকে তেমনই মানুষের হৃদয়-গুহার অন্ধকারাবৃত সম্পদ্ উদ্ধারের ভারও দিয়াছিলেন। সুযোগ্য দুই ভাই বহু অমূল্য গ্রন্থ-রচনার মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণ-লীলামৃতের প্রকাশ করিতে লাগিলেন, ভক্ত বিদগ্ধ সমাজ সেই সমস্ত গ্রন্থের সৌন্দর্যে ও মাধুর্যে মুগ্ধ হইলেন।

পাণ্ডিত্যের খনি দুই ভাই, কিন্তু বাহিরে তাহার বিন্দুমাত্র প্রকাশও নাই। পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন তাঁহাদের কাছে ততখানিই, যতখানি কৃষ্ণলীলা-রচনার কাজে লাগে। অন্যথা পাণ্ডিত্যের কোন মূল্যই তাঁহাদের কাছে নাই।

বৃন্দাবনে এক দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত আসিয়াছেন ; সঙ্গে অশ্ব, হস্তী, বাদ্যভাণ্ড-কোলাহল, বিজয়গর্বের নিশানা। শ্রীজীব যমুনায় স্নান করিতেছিলেন, হঠাৎ তুমুল কোলাহলের ধ্বনি শুনিয়া কিছুটা কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া যমুনার তীরে উঠিয়া আসিলেন।

সরব হুঙ্কারে দিগ্বিজয়ী চলিয়াছেন পথ বাহিয়া—কণ্ঠে বিলম্বিত জয়মাল্য, হস্তে জয়পত্র। শুনিয়াছিলেন শ্রীরূপ-সনাতন অপরাজেয় পরম পণ্ডিত, তাঁহাদের পরাজিত করা দিগ্বিজয়ীর সাধ্যের বাহিরে। হয়তো বা কিছুটা ভীতি, কিছুটা বা কৌতূহলের বশবর্তী হইয়াই দিগ্বিজয়ী শ্রীরূপ-সনাতনের কাছে গিয়া বিচারে তাঁহাদের আহ্বান করিলেন। এখন হাস্য সংবরণ করাই কঠিন হইয়া উঠিতেছে ; এই কি এত নাম, এত খ্যাতি ? বিচার করা দূরে থাকুক, দিগ্বিজয়ীর আহ্বান শোনামাত্র ভয়ে পরাজয় স্বীকার করিলেন রূপ-সনাতন, তথাকথিত অপরাজেয় পণ্ডিতদ্বয় !

শ্রীজীব বিস্মিত হইলেন। তাঁহার গুরু, তাঁহার পরমজ্ঞানী জ্যেষ্ঠতাতদ্বয় সত্যই কি পরাজিত হইয়াছেন এই দাম্ভিক পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তির কাছে? শ্রীজীবের ললাটের রেখায় জাগিল কুঞ্চন, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই মনে মনে বুঝিলেন, কেন শ্রীরূপ-সনাতনের স্বেচ্ছাকৃত এই পরাজয়-স্বীকার!

তথাপি মন অশান্ত হইয়া উঠিল, 'আমি তো তাঁহাদের পুত্র—শিষ্য! অধম হইতে পারি, কিন্তু আমি থাকিতে তাঁহাদের অসম্মান, তাহা কেমন করিয়া হইবে? গুরুনিন্দা শ্রবণ করিয়াও যদি তাহার প্রতিকার না করিলাম, তবে বৃথাই আমার শিষ্যত্বাভিমান!'

শ্রীজীব অগ্রসর হইলেন—দিগ্বিজয়ীকে বিচারে আহ্বান করিয়া বলিলেন, 'আপনি মানীর মান এবং পাণ্ডিত্যের মর্যাদা দিতে জানেন না বলিয়াই গর্বিত হইয়াছেন। আমি শ্রীরূপ-সনাতনের এক অধম অক্ষম শিষ্য, তথাপি আপনাকে বিচারে আমি আহ্বান করিতেছি, আমাকে পূর্বে পরাজিত করুন, তারপর শ্রীরূপ-সনাতনকে পরাজিত করিবার স্বপ্ন দেখিবেন।'

তরুণের ঔদ্ধত্য ও সাহস দেখিয়া দিগ্বিজয়ী একটু বিরক্ত এবং একটু বিস্মিত হইলেন। অবজ্ঞামিশ্রিত হাস্যে বলিলেন, 'এস বালক! তোমার তর্কের নেশা চূর্ণ করিয়া দিই।'

কিন্তু চূর্ণ হইল দিগ্বিজয়ীর অহঙ্কার, তাঁহার অভ্রংলিহ দাম্ভিকতা ধূলিসাৎ করিতে শ্রীজীবের অধিকক্ষণ লাগিল না। জয়পত্র, জয়মাল্য ও জয়ের সমস্ত উপঢৌকন শ্রীজীবের করে সমর্পণ করিয়া দিগ্বিজয়ী বৃন্দাবন ত্যাগ করিতে উদ্যত হইলেন। শুধুমাত্র জয়পত্রখানি লইয়া শ্রীজীব চলিয়া গেলেন যমুনার ঘাটে—গুরুর গৌরব রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, ইহাই তাঁহার পুরস্কার, আপন গৌরবের বিন্দুমাত্র স্পৃহাও নাই মনে।

কমণ্ডলুতে শ্রীরূপের জন্য পূজার জল ভরিয়া লইয়া শ্রীজীব ভজন-কুটিরের দিকে দ্রুত চলিয়া গেলেন।

'পূজার সময় অতিক্রান্তপ্রায়; জীবের আজ এত বিলম্ব কেন?' রূপ গোস্বামী একটু বা অধীর চিত্তেই জীবের প্রতীক্ষা করিতেছেন—কমণ্ডলুহস্তে এতক্ষণে জীব প্রবেশ করিলেন। শ্রীরূপ বিলম্বের কারণ জানিতে চাহিলে গুরুর পাদবন্দনা করিয়া জীব বিলম্বের কারণ জানাইলেন। তিনি যে দাম্ভিক পণ্ডিতের মিথ্যা অহঙ্কার নাশ করিয়া গুরুর সম্মান রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, সে আনন্দের সামান্য প্রকাশ হইয়া পড়িল তাঁহার বাক্যে।

নির্বাক্ শ্রীরূপ কিছুক্ষণ জীবের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন, ধীরে ধীরে রুক্ষ কঠোর হইয়া উঠিল ললাটের রেখা। কঠিন সুরে বলিলেন, 'বৃন্দাবনে বাস করিতে আসিয়া আজও যাহার অহঙ্কার-অভিমান ত্যাগ হয় নাই, বৃন্দাবনে তাহার স্থান নাই। যাও, বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া পুনরায় সংসারেই ফিরিয়া যাও, আজ হইতে আমি আর তোমার মুখ দর্শন করিব না।'

কত মিনতি, কত অশ্রু ঝরিয়া পড়িল বজ্রকঠোর গুরুর পদতলে, কিন্তু পাষাণে রেখা পড়িল না—শ্রীরূপ অবিচল!

ধীরে ধীরে শ্রীরূপের সম্মুখ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন পিতৃহীন তরুণ জীব—অপরিমেয় বেদনার ভারে মুহ্যমান; জ্যেষ্ঠতাত একবার ফিরিয়া ডাকিলেন না।

বৃন্দাবনের এক নিভৃত বনে গিয়া জীব ধূলিশয্যায় পড়িয়া রহিলেন। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস কাটিতে লাগিল। অর্ধাশনে-অনশনে দেহ ক্রমেই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমালাভের আশাও!

পিতৃহীন তরুণ জীবের সুকুমার জীবনটি যাঁহাদের নিশ্চিন্ত সুখময় আশ্রয়ে ধীরে ধীরে বিকশিত হইয়া উঠিতেছিল, আজ যদি সেই পরম আশ্রয় হইতেও বিচ্যুত হইতেই হইল, তবে বঞ্চিত বুভুক্ষু এই জীবন থাকিয়াই বা কি লাভ? অনাহারে জীবনত্যাগের জন্যই শ্রীজীব কৃতসংকল্প হইলেন।

এতদিনে শ্রীসনাতনের কাছে যখন এই খবর পৌঁছিল, তখন তিনি দ্রুত আসিয়া জীবের কাছে উপস্থিত হইলেন। অতিকষ্টে কোন মতে শীর্ণ দেহখানি টানিয়া আনিয়া জ্যেষ্ঠতাতের চরণে জীব মাথা ঠেকাইলেন। অবরুদ্ধ মৌন বেদনার দুঃসহ ভার এতদিনে আপনাকে প্রকাশ করিবার পথ পাইয়া যেন বাঁচিয়া গেল। পরমস্নেহাস্পদ জীবের দশা দেখিয়া শ্রীসনাতনের হৃদয় হাহাকার করিয়া উঠিল। কঠোর ত্যাগী সনাতন—হৃদয় পাষাণ, কিন্তু পাষাণের নীচেও কি স্নিগ্ধ শীতল নির্ঝরিণীধারা লুকাইয়া থাকে না, পাষাণেও কি রেখা পড়ে না, আর সে-রেখা বিদীর্ণ করিয়া দেখা যায় না অমৃতরসধারা?

দুই ব্যাকুল বাহু বাড়াইয়া শ্রীসনাতন পুত্রোপম প্রাণাধিক জীবকে বক্ষে তুলিয়া লইলেন, আপন কল্যাণ-দক্ষিণহস্তখানি জীবের মাথায় রাখিলেন, সর্বাঙ্গে বুলাইয়া দিলেন সেই স্নেহ-শীতল স্পর্শ!

কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল মৌন নীরবতায়—ধীরে শ্রীসনাতন উঠিয়া দাঁড়াইলেন, জীবকে আরও একটু ধৈর্য ধরিয়া প্রতীক্ষা করিবার উপদেশ দিয়া রূপের ভজন-কুটিরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন!

সসম্ভ্রমে অগ্রজের অভ্যর্থনা করিয়া শ্রীরূপ সনাতনের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। পরস্পর কুশল-প্রশ্ন বিনিময়, গ্রন্থাদি সম্পর্কে যথাবিধি দুই-চারিটি আলোচনা হইল। সনাতন আর উদ্বেগ চাপিতে পারিতেছেন না, তথাপি শান্ত কণ্ঠেই জিজ্ঞাসা করিলেন, 'খুব সংক্ষেপে আমাকে বল দেখি ভাই, বৈষ্ণবের প্রধান কর্তব্য কি কি ?'

শ্রীরূপ একটু বিস্মিত হইলেন—'বৈষ্ণব-শিরোমণি আজ আমাকে বৈষ্ণবের কর্তব্য জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন, তবে কি আমার কোন ত্রুটি ঘটিল !'

তথাপি অগ্রজের প্রশ্নের উত্তরে সবিনয়ে নিজ সিদ্ধান্ত জানাইলেন, 'বৈষ্ণবের প্রধান কর্তব্য তিনটি—নামে রুচি, বৈষ্ণব-সেবন ও জীবে দয়া।' 'তাহাই যদি হয়, তবে "জীবে" এত অ-দয়া কেন ভাই ?' আকুল মর্মবিদারী সুরে যখন শ্রীসনাতন এইকথা জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন সমস্তই বুঝিলেন শ্রীরূপ। অগ্রজেব কাছে মার্জনা চাহিয়া তখনই শ্রীরূপ জীবের কাছে উপস্থিত হইলেন। প্রিয়তম পুত্রাধিক ভ্রাতুস্পুত্রের দশা দেখিয়া এবার বজ্রাদপি কঠোর হৃদয়ও কাঁদিয়া উঠিল। পদতলে লুণ্ঠিত জীবকে নিবিড় আলিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া শ্রীরূপ আপন কুটিরে লইয়া আসিলেন, বর্ষণসিক্ত ফুল্ল যূথীর মতোই শ্রীজীবের দেহ-মন স্নিগ্ধ সুরভিত হইয়া উঠিল।

ত্যাগ করিতে হয় ধন, জন, মান, প্রতিষ্ঠা, পাণ্ডিত্য ; কিন্তু গ্রহণ করিতে হয় কি ?—ভালবাসা, প্রেম ? না—তাহাও নয়, ভালবাসিতেও হয় শুধু দেওয়ার জন্যই, শুধুই দেওয়া—চাওয়া নয়, পাওয়া নয়—নিষ্কাম অহৈতুকী ভালবাসা।

কেমন সেই ভালবাসা—মহাপ্রভু তাহা শ্রীরূপ-সনাতনকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, হৃদয়-মন পূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন সেই প্রেমপরশমণির ছোঁয়ায়, শ্রীরূপ সনাতন অহৈতুকী ভালবাসার সাধনাই করিতেছিলেন বৃন্দাবনে।

শ্রীসনাতনের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ মদনমোহন জীবন্ত জাগ্রত এক ভুবনমোহন বালক যেন ; তাঁহার মান-অভিমান, আদর-আবদার সমস্তই সনাতনকে সহিতে হয়। সাধিয়া আসিয়াছে সত্য, তাই বলিয়া সেবা না করিয়া তো আর পারা যায় না ?

সনাতনের এক শিষ্যেব উপরে মদনমোহনের সেবার ভাব। একদিন মদনমোহনের পুষ্প-শৃঙ্গার সমাপন করিয়া দীপ-ধূপ আরতির পরে শিষ্যটি চামব ব্যজন করিতেছেন, বিচিত্র পুষ্পমাল্য-আভরণে সজ্জিত মদনমোহনের আজ একি নয়নভোলানো রূপ ! অপলক নেত্রে শিষ্য বিগ্রহের দিকে চাহিয়া আছেন, কখন তাঁহার হাতে চামর থামিয়া গিয়াছে তাহা খেয়াল নাই।

পাশেই ধ্যানে বসিয়াছিলেন সনাতন। বৃন্দাবনের প্রখর মধ্যাহ্ন-জ্বালার তাপে বোধ করি মদনমোহনের অঙ্গে ঘর্ম দেখা দিল, আর সেই তাপ গিয়া লাগিল

সনাতনের ভাবঘন তনুতে। চমকিত সনাতন চাহিয়া দেখেন, তন্ময় শিষ্য মদন-মোহনের রূপের নেশায় বিভোর, ব্যজন কখন থামিয়া গিয়াছে তাহা বোধ নাই।

সনাতন শিষ্যের হাত হইতে চামর টানিয়া লইলেন, কতক্ষণ ব্যজন করিয়া শ্রীঅঙ্গের তাপ শীতল করিয়া শিষ্যের দিকে ফিরিলেন। গুরু চামর টানিয়া লইতেই শিষ্যের সম্বিত ফিরিয়াছিল—এখন গুরুর কঠোর মুখের দিকে চাহিয়াই ভয়ে কম্পিত হইতে লাগিলেন। গম্ভীর কঠিন সুরে সনাতন শিষ্যকে বলিলেন, 'যাহার নিজের আনন্দ ভগবৎসেবার কাজে বাধা জন্মায়, ঈশ্বরের সেবক হওয়ার অধিকার বা যোগ্যতা তাহার নাই। যাও, আজ হইতে তোমাকে আর বিগ্রহসেবা করিতে হইবে না।'

একে সেবা-অপরাধ, তাহাতে গুরুর বিরক্তি—শিষ্য বিভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। আর এইরূপ অপরাধের পুনরাবৃত্তি হইবে না বলিয়া গুরুর পদতলে লুটাইয়া পড়িয়া কাতরচিত্তে ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু গুরু প্রসন্ন হইলেন না—কঠোর স্বরে বলিলেন, 'আজও তোমার আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা দূর হয় নাই, কৃষ্ণপ্রীতির বাসনা মনে জাগে নাই। তোমার এই স্বার্থময় ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র ভালবাসায় কৃষ্ণসেবা হয় না। যাও, দূর হও আমার সম্মুখ হইতে।'

গুরুর কঠোর তিরস্কারে ও নিজের অপরাধের গুরুত্ব বুঝিয়া নতমস্তকে শিষ্য বাহির হইয়া গেলেন। কৃষ্ণসেবা ও গুরুসেবার কাজে আর তাঁহার প্রয়োজন হইবে না শুনিয়া শিষ্যের অন্তর বিদীর্ণ হইয়া যাইতে লাগিল। সারাদিন কাটিল অনাহারে, অশ্রুজলে সিক্ত হইল ধূলি।

ধ্যানাবসানে গভীর রাত্রিতে ক্ষণিক বিশ্রামের অবকাশে সনাতন সামান্য তন্দ্রাভিভূত হইয়াছেন মাত্র, হঠাৎ কাহার ভূষণশিঞ্জন-ধ্বনি যেন কানে আসিয়া প্রবেশ করিল, সনাতন জাগিয়া উঠিলেন। চাহিয়া দেখেন, অঙ্গের শুচিশুভ্র জ্যোৎস্নায় চারিদিক আলোকিত করিয়া এক তরুণী আসিয়া সনাতনের শয্যাপার্শ্বে দাঁড়াইয়াছেন, রাজরাজেশ্বরীর মতোই মহিমান্বিতা! চমক ভাঙিতেই সনাতন বুঝিলেন, শ্রীমতী রাধারানী বৃন্দাবনেশ্বরী।

কণ্ঠে করুণা, কিছুটা বা বেদনা! শ্রীমতী বলিলেন, 'হ্যা গা গোঁসাই! ছোট একটি বালক, না হয় একদিন সামান্য একটি ভুলই করিয়াছে, আর ভুলই বা কি, ভুবনমোহনের রূপ দেখিয়া সে ভুলিয়াছিল, তা কাহার নয়নই বা ঐ রূপে না ভোলে, তাহার জন্য কি এত কঠোর হইতে হয়? আহা রে! সারাদিন গেল, রাত্রি গেল, না খাইয়া কাঁদিতেছে, তোমার কি একটু দয়াও হয় না?'

সনাতন ততক্ষণে প্রকৃতিস্থ হইয়াছেন, গম্ভীর গুরু-গৌরবে বলিয়া উঠিলেন, 'ঠাকুরানী! শত হইলেও গোয়ালার কন্যা আপনি, গোয়ালিনী। দধি-দুগ্ধের ব্যবসা করিতে জানেন, তাহাই করুন গিয়া। শিষ্যকে কি করিয়া শাসন করিতে হয়, আপনি তাহার জানেন কি? ঐ ভারটুকু অনুগ্রহ করিয়া আমার উপরই ছাড়িয়া দিন।'

শ্রীমতী লজ্জিতা হইলেন, রাগও হইল মনে মনে—'শিষ্য শাসন করিতে হয়, কর না গিয়া বাপু? তা আবার মানুষের জাত তোলা কেন?'

শ্রীমতীর চরণের নূপুর একটু যেন বেসুরা বাজিতে বাজিতেই বিলীয়মান হইয়া গেল।

সনাতন মৃদু হাসিয়া উঠিয়া গেলেন অনুতপ্ত শিষ্যের কাছে—'শাসন করা তারেই সাজে, সোহাগ করে যে'—শিষ্যের মাথাটি আপন ক্রোড়ে সস্নেহে টানিয়া লইলেন, ক্ষমার মাধুর্যে ও আনন্দে শিষ্য অভিষিক্ত হইয়া গেলেন!

গুরুর কৃপা ও অহৈতুকী ভালবাসার মধ্যে আপনাকে ঢালিয়া দিয়া ক্রমে শিষ্যও নিষ্কাম শুদ্ধাভক্তির অধিকারী হইয়া উঠিলেন—কৃষ্ণসেবার আর কোন বাধা রহিল না।

ভগবানের প্রতি জীবের যখন অহৈতুকী ভালবাসার উদয় হয়, তখনই ভগবানের সঙ্গে একটি সম্বন্ধ-জ্ঞানের স্ফুরণ হয়। বৈষ্ণব মহাজনগণ সেই সম্বন্ধকে চারটি ভাগে ভাগ করিয়াছেন: দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর। দাস্যে যে প্রেমের সূচনা, মধুরে তাহারই চরম পূর্ণতা। মহাপ্রভু বলেন, 'দাস্যভক্তিই সাধারণ জীবের কাম্য।' কারণ,

> জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস,
> কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ। —চৈঃ চঃ

স্বরূপতঃ জীব ও ভগবানে কোন ভেদ নাই, চিদংশে জীব ও ভগবান অভেদ; কিন্তু ঈশ্বর বিভুচৈতন্য, জীব অণুচৈতন্য, ঈশ্বর মায়াধীশ, জীব মায়াবশ। মায়া ঈশ্বরেরই বহিরঙ্গা শক্তি, তাই মায়া ঈশ্বরকে কবলিত করিতে পারে না, কিন্তু জীব অণুচৈতন্য বলিয়া মায়া তাহাকে কবলিত করিবার শক্তি রাখে। জীব স্ব-স্বরূপ ভুলিয়া যায় বলিয়া, ভগবানকে ভুলিয়া যায় বলিয়াই মায়া তাহাকে সংসারবন্ধনে আবদ্ধ করে।

> কৃষ্ণ ভুলি সেই জীব অনাদি বহির্মুখ,
> অতএব মায়া তারে দেয় সংসার-দুঃখ। —চৈঃ চঃ

এই মায়ার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইতে হইলে ভগবানের শরণ লইতে হয়, আন্তরিক

ব্যাকুলতার সঙ্গে ভগবদ্-দাসত্ব প্রার্থনা করিতে হয়। গীতায় শ্রীভগবান স্বমুখেই এই আশ্বাস দিয়াছেন—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ —গীতা ৭।১৪

—হে পার্থ, আমার এই দুরত্যয়া মায়ার হাত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে হইলে একমাত্র আমারই শরণ লও।

জীবের কল্যাণের আশায় প্রভু জীবভাব, ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া কৃষ্ণের কাছে দাস্যভক্তির জন্য আকুল প্রার্থনা করিলেন, পঞ্চম শ্লোকে—

অয়ি নন্দতনুজ কিঙ্করং
পতিতং মাং বিষমে ভবাম্বুধৌ।
কৃপয়া তব পাদপঙ্কজ-
স্থিতধূলীসদৃশং বিচিন্তয় ॥

কবিরাজ গোস্বামী ইহার ভাবানুবাদে লিখিয়াছেন,

তোমার নিত্যদাস মুঞি তোমা পাসরিয়া।
পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হঞা ॥
কৃপা করি কর মোরে পদধূলি সম।
তোমার সেবক, করোঁ তোমার সেবন ॥ —চৈঃ চঃ

—হে নন্দাত্মজ কৃষ্ণ! আমি জীব স্বরূপতঃ তোমার নিত্যদাস, কিন্তু মায়া দ্বারা কবলিত হইয়া আমি বিষম ভবসমুদ্রে পতিত হইয়াছি। তুমি কৃপা করিয়া আমাকে তোমার চরণতলের ধূলি করিয়া লও, আমাকে তোমার সেবার অধিকার দাও।

জীবের প্রকৃতি যেন অনাদিকাল হইতেই কৃষ্ণ-বহির্মুখ হইয়া রহিয়াছে; শ্রুতিও বলেন—

পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভু-
স্তস্মাৎ পরাঙ্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্।
কশ্চিদ্ধীরঃ প্রত্যগাত্মানমৈক্ষদ্
আবৃত্তচক্ষুরমৃতত্বমিচ্ছন্ ॥ —কঠ ২।১।১

—বহির্মুখ ইন্দ্রিয়সমূহকে পরমেশ্বর বিনাশ করিয়াছেন, সুতরাং জীব বহির্বিষয়-সমূহই দর্শন করে, অন্তরাত্মাকে নহে। কোন বিবেকী অমৃতত্বের অভিলাষী হইয়া ইন্দ্রিয় সংযমপূর্বক প্রত্যগাত্মাকে দর্শন করেন।

যদি কোন জীব জন্মজন্মান্তরের সুকৃতিবলে সাধু গুরুর কৃপায় কৃষ্ণের সন্ধান লাভ করেন, তবেই মায়ার দাসত্ব হইতে তাঁহার মুক্তি হয় এবং ভগবদ্‌-দাসত্ব লাভ করিয়া তিনি ধন্য হন।

ঈশ্বর করুণাময়, জীবের দুঃখে তাঁহার হৃদয় কাঁদে, তাই অবতাররূপে, গুরুরূপে, সাধুরূপে অবতীর্ণ হইয়া তিনি জীবের কল্যাণ-সাধনে ব্রতী হন। শিষ্য যদি ভুল পথে পদক্ষেপ করে, তবে গুরু কেশাকর্ষণ করিয়াও শিষ্যকে ঠিক পথে ফিরাইয়া আনেন।

গোবিন্দ (শ্রীমৎ ঈশ্বরপুরী-প্রেরিত প্রভুসেবক গোবিন্দ নহেন) অকৃতদার, আজন্ম-ব্রহ্মচারী, প্রভুর পরম ভক্ত; একবার প্রভুর তীর্থযাত্রা-পথে সঙ্গী হইয়া চলিয়াছেন। দিনের পর দিন অনশনে অর্ধাশনে চলিয়াছেন প্রভুর সঙ্গে নীরবে, পরমানন্দে;—প্রভুর যাহা গতি, ভৃত্যেরও তাহাই।

যেদিন অযাচিত যাহা কিছু আসে, তাহাই নিবেদন করিয়া প্রভু প্রসাদ গ্রহণ করেন, তারপরে গ্রহণ করেন গোবিন্দ; যেদিন কিছু আসে না, সেই দিন হরিনামামৃত-পানেই কাটিয়া যায়।

আজ মিলিয়াছে কিছু অন্ন, মধ্যাহ্নে গ্রামান্তে বৃক্ষচ্ছায়াতলে সেই অন্ন প্রস্তুত করিয়া প্রভু কৃষ্ণের কাছে নিবেদন করিলেন। তারপর সেই নিবেদিত প্রসাদের সামান্য মাত্র গ্রহণ করিয়া আচমনান্তে গোবিন্দের দিকে হাত বাড়াইলেন, মুখশুদ্ধির জন্য একখণ্ড হরীতকীর প্রয়োজন। গোবিন্দ চিন্তায় পড়িলেন, সামান্য একখণ্ড হরীতকী, তাহাও তাঁহার কাছে নাই, তিনি এমনই হতভাগ্য সেবক!

মধ্যাহ্নের প্রখর সূর্যতাপ অগ্রাহ্য করিয়াই গোবিন্দ দূর গ্রামের দিকে ছুটিলেন, কোন মতে হরীতকী সংগ্রহ করিয়াই আবার ছুটিয়া আসিলেন প্রভুর কাছে, একখণ্ড হরীতকী প্রভুর হাতে দিতে পারিয়া এতক্ষণে গোবিন্দের মন সুস্থ হইয়া উঠিল।

পরদিন আবার চলিয়াছেন; অগ্রে প্রভু, পশ্চাতে গোবিন্দ। গ্রাম অরণ্য অতিক্রম করিতেছেন প্রভু—না তীর্থ-পরিক্রমা, কে জানে? যাহাকে সম্মুখে দেখিতেছেন, তাহাকেই কৃষ্ণনাম দিতেছেন; দুই হাতের অঞ্জলি পূর্ণ করিয়া যেন লইয়াছেন কৃষ্ণপ্রেম-ধন, তাহাই অকাতরে বিলাইয়া দিতেছেন, শুধু মানুষকে নহে, বনের হিংস্র পশু-পাখি পর্যন্ত সেই পরমধন-লাভে বঞ্চিত হইতেছে না। নামের বন্যায় সমস্ত দেশ প্লাবিত হইয়া যাইতেছে। যাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, যাঁহাকে একবার মাত্র স্পর্শ করিলেন, তিনিই যেন স্পর্শমণি হইয়া গেলেন। নামের রসে সিক্ত হইয়া সেই সুকৃতিমান্ যাঁহাকে স্পর্শ করিলেন তিনিও বলিতে লাগিলেন, 'কৃষ্ণ,

কৃষ্ণ'। বনের ব্যাঘ্র-সিংহও নির্ভয়ে অহিংসায় প্রভুর সঙ্গে চলিয়াছেন ; প্রভু তাহাদের কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলো।' অমনি তাহাদেরও কণ্ঠ হইতে বাহির হইয়া আসিল আনন্দধ্বনি, যেন অব্যক্ত নাম।

প্রায় দিনশেষে আজও আসিয়া উপস্থিত হইলেন এক গ্রাম-প্রান্তে। ভিক্ষায় প্রস্তুত করিয়া, ভোগ নিবেদন করিয়া সামান্য প্রসাদ গ্রহণান্তে আজও আবার প্রভু হাত বাড়াইলেন গোবিন্দের দিকে। আজ আর গোবিন্দের দেরি হইল না, সঙ্গে সঙ্গেই প্রভুর হাতে এক খণ্ড হরীতকী দিয়া গোবিন্দ আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিলেন। প্রভু যেন বিস্মিত হইয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, 'একি গোবিন্দ, কাল যখন চাহিলাম, তখন তো হরীতকী দিতে তোমার অনেক বিলম্ব হইয়াছিল, আজ চাহিবামাত্র কোথা হইতে তাহা সংগ্রহ করিলে ?' আজ প্রভুর সামান্য সেবা করিতে পারিয়াছেন, তাই আনন্দিত গোবিন্দ বলিলেন, 'প্রভু, আপনার কষ্ট হইবে ভাবিয়া গতকল্যকার সংগৃহীত হরীতকীর দুই-একটি খণ্ড আমি রাখিয়া দিয়াছিলাম, তাই আজ এত শীঘ্র তাহা আপনার হাতে দিতে পারিলাম।

প্রভু হাসিলেন, গোবিন্দ অধিকতর উৎফুল্ল হইলেন, কিন্তু তখন কি গোবিন্দ জানিতেন, কি বজ্র লুকানো রহিয়াছে ঐ মধুর হাসির অন্তরালে ? ধীরে ধীরে প্রভু বলিলেন 'গোবিন্দ। আমি নিষ্কিঞ্চন সন্ন্যাসী, সঞ্চয়ধর্ম আমার পক্ষে নিষিদ্ধ। তুমি আমার সঙ্গী, কিন্তু সঞ্চয়বুদ্ধি তোমার আজও দূর হয় নাই, তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও, সংসারী হও, আমার সঙ্গে আর তোমার যাওয়া চলিবে না।'

উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ হইতে গোবিন্দ অতল সাগরে নিক্ষিপ্ত হইলেন। তিনি তো নিজের জন্য এতটুকু সঞ্চয় করেন নাই, প্রভুর পথযাত্রার ক্লেশ এতটুকু লাঘব করিবার আশাতেই তিনি এই সঞ্চয়টুকু করিয়াছিলেন মাত্র। 'প্রভু দয়া কর। আমি অজ্ঞান, না জানিয়া যে অপরাধ করিয়াছি, তাহার পুনরাবৃত্তি হইবে না। ক্ষমা কর, তোমার দীনাতিদীন দাসকে চরণছাড়া করিও না ; প্রভুর চরণে গোবিন্দ কাতর মিনতি করিতে লাগিলেন।

মধুর কোমল কণ্ঠ, কিন্তু তাহাতে বজ্রকঠোর আদেশের সুর। প্রভু বলিলেন, 'গোবিন্দ আমার আদেশ অমান্য করিও না, তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও, তীর্থপরিক্রমান্তে পুনরায় আমি তোমার কাছে আসিব।'

গোবিন্দের চোখের জলে ধরণী সিক্ত হইল, কিন্তু প্রভু সিক্ত হইলেন না। বার বার ফিরিয়া ফিরিয়া আকুল দুই তৃষিত নয়নে প্রভুর দিকে চাহিতে চাহিতে গোবিন্দ নিষ্ক্রান্ত হইলেন। অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মিলেখার সঙ্গে প্রভুর সুবর্ণ কান্তিরেখা

দূর দিগন্তে মিলাইয়া গেল, মিলাইয়া গেল গোবিন্দের শেষ আশা, প্রভু ফিরিয়া ডাকিলেন না।

অগ্রদ্বীপে এক কুটিরে গোবিন্দ বসিয়া আছেন অধীর প্রতীক্ষায়, কবে প্রভু আসিবেন। স্বকৃত অপরাধের গুরুত্ব বুঝিতে চায় না মন, প্রাণ সহিতে পারে না প্রাণারামের বিচ্ছেদ-দহন; তবু ধৈর্য ধরিতে হয়, প্রভু বলিয়াছেন, ফিরিয়া আসিবেন। প্রভু আসিলেন, গোবিন্দ আসিয়া লুটাইয়া পড়িলেন প্রভুর চরণতলে। প্রভু গোবিন্দকে সান্ত্বনা ও আশ্বাস দিয়া গোপীনাথের এক সুন্দর বিগ্রহ স্বহস্তে গোবিন্দের গৃহে প্রতিষ্ঠা করিলেন, বলিলেন, 'গোবিন্দ! তুমি কায়মনোবাক্যে এই শ্রীবিগ্রহের সেবা কর, ইহার মধ্যেই তুমি আমাকেও পাইবে। আর এক কথা, তুমি আমার বাক্য পালন করিয়া সংসারী হও, বিবাহ কর, তোমার ইহাতে কল্যাণ হইবে।' আজন্ম-ব্রহ্মচারী, সংসার-নিরাসক্ত গোবিন্দ স্তম্ভিত হইলেন, 'একি কঠোর আদেশ, কঠিন পরীক্ষা দুর্বলের প্রতি? প্রভু! দয়া কর, ফিরাইয়া লও তোমার এই আদেশ,' গোবিন্দ কাতর মিনতি করিতে লাগিলেন।

প্রভু বলিলেন, 'গোবিন্দ! সংসার কি তাঁহাকে ছাড়া? গোপীনাথের সংসার গোপীনাথ দেখিবেন, তুমি তাঁহার সেবক, ভৃত্য মাত্র। শুদ্ধ দাস-অভিমানে তুমি সংসারধর্ম পালন করো, ভুলিও না তুমি কৃষ্ণদাস; ইহাতেই তুমি পরম কল্যাণ, পরম প্রেম লাভ করিয়া ধন্য হইবে।'

গোবিন্দকে আশীর্বাদ করিয়া প্রভু অগ্রদ্বীপ ত্যাগ করিলেন! মুহ্যমান, মূর্ছাহত গোবিন্দ অপলক নেত্রে প্রভুর গমন-পথের দিকে চাহিয়া রহিলেন অসহায় অনাথের মতো। যন্ত্রণাময়ী রজনীর তন্দ্রাহীন প্রহরগুলি ধীরে ধীরে পার হইতে লাগিল, ক্রমে যেন শিথিল দেহ-মনে যন্ত্রণাবোধও আর রহিল না।

অবশেষে একদিন এই অব্যক্ত বেদনারও অবসান হইল; গৌর নাই, কিন্তু গোপীনাথ তো আছেন। গোবিন্দ উঠিলেন—ঐ তো, পরম প্রত্যাশায় স্নিগ্ধ করুণ দুই নয়ন মেলিয়া সুন্দর সুকুমার শান্ততনু গোপীনাথ চাহিয়া আছেন গোবিন্দের দিকে, 'আমাকে কি তুমি গ্রহণ করিবে না গোবিন্দ? আমিই যে তোমার গৌর!'

গোবিন্দ দ্রুতচরণে আসিয়া বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন গোপীনাথকে, যেন জাগ্রত জীবন্ত এক মধুর স্পর্শসুখে গোবিন্দ আত্মহারা হইয়া গেলেন; আনন্দে গোবিন্দের হৃদয়-মন উৎফুল্ল হইয়া উঠিল, এখন প্রভুর আদেশ পালন করিতে আর কি ভয়?

গোপীনাথের সেবায় গোবিন্দ আপনাকে ঢালিয়া দিলেন। মন-প্রাণ সেবানন্দে ডুবিয়া থাকিতেই চাহে, কিন্তু প্রভুর আদেশ। গোবিন্দ বিবাহ করিলেন।

কালক্রমে একটি পুত্রকে পৃথিবীর আলোকে আনিয়াই গোবিন্দ গৃহিণীর নয়নের আলো নিভিয়া গেল। মৃতা পত্নীর বক্ষ হইতে অসহায় কোমল ক্ষুদ্র শিশুটিকে গোবিন্দ আপন বক্ষে তুলিয়া লইলেন চোখের জলে বক্ষ ভাসিয়া গেল, 'আহা রে! নিরপরাধ এই কোমল বিহঙ্গটিকে তো বাঁচাইতে হইবে।' গোবিন্দ যেন সমস্ত হৃদয় দিয়া ইহাকে আবৃত করিয়া রাখিলেন। সারা দিনরাত্রি কোথা দিয়া কাটিয়া যায়, গোবিন্দ তাহা বুঝিতে পারেন না, পুত্রের সেবায় ঢালিয়া দিয়াছেন আপনাকে, আহা! ইহার যে মা নাই, আমি না দেখিলে কে ইহাকে দেখিবে?

গোপীনাথের নিত্য-পূজা সেবাও করেন, কিন্তু মন প্রাণ উৎকর্ণ হইয়া থাকে পুত্রের দিকে। গোপীনাথের শৃঙ্গার করিতে করিতে হঠাৎ চমকিত হইয়া দেখেন, 'কোথায় গোপীনাথ? অলকাতিলকা পুষ্প আভরণে যত্নক্ষণ ধরিয়া কাহাকে সজ্জিত করিতেছেন তিনি গোপীনাথের বিগ্রহে? এ যে দেখি পুত্রমুখ? গোপীনাথের অগ্রে ভোগ নিবেদন করিয়া বসিয়া আছেন সাধকে, চোখের উপরে ভাসিয়া উঠিতেছে পুত্রের ক্ষুধাতুর মুখ। ক্বচিৎ কখন বা পুত্রস্নেহের প্লাবনে যখন হৃদয়-মন পরিপ্লুত হইয়া উঠিয়াছে, তখন যেন মনের গহনে অতি সন্তর্পণে উঁকি দিতেছে একখানি সকরুণ মুখচ্ছবি, অবহেলিত গোপীনাথের মুখ। পুত্রে গোপীনাথে আরম্ভ হইল দ্বন্দ্ব, কিন্তু জয়লাভ করিল পুত্র, গোবিন্দ যেন এই নবলব্ধ পুত্রস্নেহের কাছে হার মানিলেন, 'আমি তো চাহি নাই, তথাপি তুমিই যখন সংসার জুটাইয়াছ গৌর, আনিয়া দিয়াছ এই পরম ধন, তখন তাহাকে ফেলিব কেমন করিয়া, আমি ছাড়া আর কে আছে ইহার?'

গোপীনাথের সংসার এখন গোবিন্দের সংসার হইল, এবং সংসারের কেন্দ্রে রহিল পুত্র।

বালক পাঁচ বৎসরের হইল, তাহার কচি কণ্ঠের মুখর আনন্দ-কাকলিতে গোবিন্দের নিরানন্দ গৃহ ভরিয়া উঠিল। কোমল কণ্ঠের আদরে, আহ্বানে, অভিমানে গোবিন্দের পিতৃহৃদয় এক অনাস্বাদিত মাধুর্যরসে ক্রমেই পূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল। এক মুহূর্তও পুত্রকে কাছছাড়া করিতে প্রাণ চায় না, মন অধীর হইয়া উঠে, কিন্তু তবু ছাড়িতে হইল, পঞ্চমবর্ষীয় বালকটিকে সহসা মৃত্যু হরণ করিয়া লইয়া গেল।

চোখের সম্মুখে সমস্ত বিশ্ব যেন এক ঘনঘোর কৃষ্ণ অন্ধকারে আবৃত হইয়া গেল, 'আলো কি কোথাও নাই, নাই কি বুক ভরিয়া গ্রহণ করিবার মতো কোথাও এতটুকু বাতাস?' গোবিন্দ মূর্ছিত হইয়া ধুলায় লুটাইয়া পড়িলেন, দিনরাত্রি কাটিয়া গেল, গোবিন্দ উঠিলেন না।

সহসা যেন বহু দূরাগত এক মৃদু করুণ সুর কানে বাজিল 'গোবিন্দ!'

'কে? এই করুণ কোমল কণ্ঠে কে ডাকে পুত্রের মতো সুরে? চৈতন্য লাভ করিয়া গোবিন্দ অধীর চিত্তে ধূলিশয্যা হইতে উঠিয়া বসিলেন, তখনও যেন মূর্ছার ঘোর কাটে নাই! ইহা কি স্বপ্ন? বড় বেদনাহত নয়নে চাহিয়া আছেন গোপীনাথ, বড় করুণ সুরে ডাকিতেছেন, 'গোবিন্দ! তুমি কি উঠিবে না? আমাকে আর কত উপবাসী রাখিবে? আমার যে বড় কষ্ট হইতেছে!'

'ও! তুমি? তোমার কষ্ট? তা হোক, গোপীনাথ! আমার যে বুক ভাঙিয়া যাইতেছে, এত কষ্ট যে প্রাণ পর্যন্ত বাহির হইতে পারিতেছে না, তাহা কি দেখিতেছ না তুমি? কেন, কেন দিলে, আবার দিয়াই বা নিলে কেন গোপীনাথ? আমি তোমার কাছে সংসার, পুত্র কিছুই চাহি নাই? নির্দয় নিষ্ঠুর তুমি, এতটুকু তোমার দয়া নাই?' গোপীনাথের মুখখানি আরও করুণ হইয়া উঠিল, বলিলেন, 'কে নিষ্ঠুর গোবিন্দ, আমি না তুমি? পুত্র লাভ করিয়া আমাকে কি তুমি ভুলিয়া যাও নাই?'

'না না গোপীনাথ, মিথ্যা কথা বলিও না, কোনদিন কি তোমার পূজা-সেবার ত্রুটি করিয়াছি আমি? পুত্রের সঙ্গে সঙ্গে তোমার সেবার আয়োজনও কি আমি করি নাই?'

'কিন্তু তুমি তো জানো গোবিন্দ, ভাগের কারবারে আমি নাই। হয় আমি, নয় পুত্র, দুইজনকে তো তুমি পাইতে পারো না? এখন ওঠ! আমার দিকে তাকাও, আজ হইতে আমিই তোমার পুত্র!'

'তুমি? তুমি তো পাষাণ-প্রতিমা, অচল বিগ্রহ; কি আছে তোমার—স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা, কৃতজ্ঞতা? আমার জন্য আমার পুত্র যাহা করিত, তুমি যে কখনও তাহা করিবে না, তাহা আমি জানি।'

গোপীনাথ এতক্ষণে যেন পথ খুঁজিয়া পাইলেন, মৃদু হাসিয়া বলিলেন, 'কি করিতে হইবে বলো না; একবার বলিয়াই দেখ না, করি কি, না?'

'তুমি আমার মৃত্যুর পরে শ্রাদ্ধ করিবে, পিণ্ড দান করিবে আমার?' 'প্রতিশ্রুতি দিলাম, পুত্রের সমস্ত কর্তব্যই পালন করিব।'

বিস্মিত গোবিন্দ চাহিয়া দেখিলেন মুখের দিকে, সেখানে কি কেবলই ছলনা, কেবলই ফাঁকি, না কি আছে কিছু স্নেহ, দয়া, প্রেম ? সেই কোমল সুন্দর মুখে কি দেখিলেন গোবিন্দ, কে জানে, সদ্যোলব্ধ পুত্রশোকের তীব্রতা যেন মুহূর্তে দিবাস্বপ্নেরই মতোই মিলাইয়া গেল !

গোপীনাথের চরণে লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিয়া উঠিলেন গোবিন্দ—

'তোমার নিত্যদাস মুঞি তোমা পাসরিয়া
পড়িয়াছোঁ ভবার্ণবে মায়াবদ্ধ হৈঞা ।'

'হে করুণাময়, কৃপা করিয়া আমার অপরাধ ক্ষমা কর, আমার অজ্ঞান-অন্ধকার, আমার কর্তৃত্বাভিমান দূর করিয়া আমাকে তোমার চরণের দাস করিয়া লও প্রভু !'

আবার গোপীনাথের সেবায় গোবিন্দ নিজেকে ঢালিয়া দিলেন, পুত্রস্নেহ যেন দ্বিগুণ হইয়া গোপীনাথকে ঘিরিয়া রহিল। শাশ্বত চিরসুন্দর গোপাল ; ইঁহাকে তো হারাইবার ভয় নাই, জরা ইহাকে বিকৃত করিতে পারে না, মৃত্যু ইঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না ! ইহাকেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন গোবিন্দ, কিন্তু গোপীনাথকে ভুলেন নাই, তাই আঘাতের পর আঘাত দিয়া ফিরাইয়া আনিলেন আপন একান্ত সান্নিধ্যে ! ফিরাইয়া আনিতেই হয়, প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন স্বমুখে—

সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ —গীতা ১৮।৬৬

প্রভুও বলিয়াছেন—

'কৃষ্ণ তোমার হঙ যদি বোলে একবার,
মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে পার !
শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ—
—কৃষ্ণ তারে তৎকালে করে আত্মসম ।'

কথিত আছে, গোবিন্দের দেহত্যাগ হইলে গোপীনাথ 'ধড়া' গলায় দিয়া অশৌচ ধারণ করিয়া, হবিষ্যান্ন গ্রহণ প্রভৃতি যথাবিধি শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান পালন করিয়া শ্রাদ্ধ-দিবসে স্বহস্তে গোবিন্দের আত্মার উদ্দেশে পিণ্ড দান করিয়াছিলেন।

গোবিন্দের পুত্রের ভূমিকায় গোপীনাথের অভিনয় নিখুঁত হইয়াছিল এবং গোবিন্দের প্রাণ বুঝিয়াছিল, ইহা অভিনয় নয়, প্রাণারামেরই লীলা। সেই লীলারসে গোবিন্দ আপনাকে নিমজ্জিত করিয়া দিলেন, প্রাণ প্রাণারামে লগ্ন হইয়া গেল, আর বিচ্ছেদের আশঙ্কা রহিল না। এই কৃষ্ণদাসত্বের কথাই প্রভু বলিলেন, ইহা লাভ করিলে জীবের আর চাওয়া-পাওয়া কিছুই বাকী থাকে না।

দাস্য-ভক্তির প্রার্থনা করিতে করিতেই ভক্তভাবে প্রভুর মনে হইল, তাঁহার তো দাস্য-ভক্তি নাই—কৃষ্ণসেবা! কই, তাহা তো আজও লাভ করা হইল না! অধীর চিত্তে ক্রন্দন করিয়া প্রভু ডাকিতে লাগিলেন, 'ওগো কৃষ্ণ! কবে আমার এমন দিন আসিবে, যেদিন—

নয়নং গলদশ্রুধারয়া
বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা।
পুলকৈর্নিচিতং বপুঃ কদা
তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি॥ —মহাপ্রভুকৃত ষষ্ঠ শ্লোক

—হে ভগবান! এমন দিন আমার কবে আসিবে, যখন তোমার নাম গ্রহণ করিতে করিতে বিগলিত অশ্রুধারায় আমার নয়ন পরিপ্লুত হইবে, বদন গদ্গদ বাক্যে রুদ্ধ হইবে, সমস্ত দেহ পুলকদ্বারা ব্যাপ্ত হইবে?'

জীবভাবে, ভক্তভাবে দাস্য প্রার্থনা করিতে করিতেই প্রভুর চিত্তে প্রেমের আবির্ভাব হইল। তিনি স্বয়ং প্রেমময়, মহাভাবস্বরূপা শ্রীমতী রাধার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়াই তাঁহার শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-রূপে অবতরণ, তথাপি জীব-শিক্ষার্থেই তিনি ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়াছেন। সেই ভাবেই দেখাইতেছেন যে, ভক্ত যখন প্রকৃত দাস্য-ভক্তি লাভ করেন, এবং কৃষ্ণসেবা-বাসনাই যখন তাঁহার অন্তরে একান্তভাবে জাগ্রত হয়, তখন সর্ববসের মূলাধার দাস্য-ভক্তিই ধীরে ধীরে সাধককে কৃষ্ণে মমত্বময় সম্বন্ধের দিকে, সখ্য-বাৎসল্য-মধুর রসের অহৈতুকী প্রেমের পথে অগ্রসর করিয়া লইয়া চলে। তখনই সাধক 'অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম' লাভের জন্য উন্মুখ হইয়া উঠেন, এবং তাহা লাভের আশায় এত ব্যগ্র হন যে, সাধকের তখন পার্থিব সুখ-দুখ, ভাল-মন্দ, এমন কি দেহবোধ পর্যন্ত থাকে না।

একদিন প্রভু নিজের চোখের সম্মুখে এইরূপ ব্যাকুলতার একটি চিত্র দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন এবং সহচরদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, 'এই শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম, ইহা লাভ করাই জীবের কাম্য।'

একদিন প্রভু জগন্নাথ-মন্দিরে নিত্যকার অভ্যাসমত গরুড়-স্তম্ভে হেলান দিয়া দুই নয়ন ভরিয়া শ্রীবিগ্রহের রূপসুধা পান করিতেছেন। সেদিন মন্দিরে অত্যন্ত ভিড়—তিল ধারণেরও স্থান নাই; এক রমণী ভিড়ের চাপে কেমন করিয়া গরুড়-স্তম্ভে আরোহণ করিয়াছেন, কেমন করিয়াই বা নীচে দণ্ডায়মান শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্কন্ধে তাঁহার দুই পদ রাখিয়াছেন—কিছুই তাঁহার বোধ নাই, একাগ্র অনিমেষ নয়নে চাহিয়া আছেন জগন্নাথের দিকে; প্রভুরও পরিবেশ বা নিজদেহে বিন্দুমাত্র অভিনিবেশ

নাই। হঠাৎ প্রভুর সেবক গোবিন্দের দৃষ্টিপথে যখন ইহা পড়িল, গোবিন্দ অস্থির হইয়া উঠিলেন। যে কঠোর সন্ন্যাসী স্ত্রীলোকের মুখদর্শন করা দূর থাকুক—'স্ত্রী' শব্দ পর্যন্ত যিনি মুখে উচ্চারণ করেন না, বৃদ্ধা পরম বৈষ্ণবী মাধবী দাসীর নিকটে একদিন মাত্র ভিক্ষা করার অপরাধে যিনি প্রিয়তম ছোট হরিদাসকে জন্মের মতো বর্জন করিয়াছেন—আজ এ কি দৈবদুর্বিপাক, তাঁহারই অঙ্গ স্পর্শ করিয়া রহিয়াছেন এক রমণী। সর্বনাশের আশঙ্কায় গোবিন্দ অধীর হইয়া উঠিলেন। তিনি দ্রুত রমণীকে নামাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

প্রভুর এতক্ষণ বাহ্যজ্ঞান ছিল না, এখন গোবিন্দের অস্থিরতায় কিঞ্চিৎ যেন বাহ্যজ্ঞান হইল, চাহিয়া ব্যাপারটি বুঝিলেন, কিন্তু মুহূর্তে আনন্দ-জ্যোতিতে মুখখানি দীপ্ত হইয়া উঠিল, সহচরগণকে স্তম্ভিত করিয়া প্রশান্ত স্বরে প্রভু বলিলেন—

'আদিবশ্যা*। এই স্ত্রীকে না কর বর্জন,
করুক যথেষ্ট জগন্নাথ দরশন।'

এতক্ষণে সেই রমণীরও চেতনা ফিরিয়া আসিল ; নিজের কৃতকার্যের অপরাধে ও লজ্জায় তিনি শিহরিয়া উঠিলেন, 'এ কি মহা সর্বনাশ'—দ্রুত গরুড়-স্তম্ভ হইতে নামিয়াই তিনি মহাপ্রভুর চরণে লুটাইয়া পড়িলেন—নিজকৃত মহা-অপরাধের জন্য অশ্রুবিজড়িত কণ্ঠে বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

প্রভু তাঁহাকে আশ্বস্ত করিয়া স্বরূপ, গোবিন্দ প্রভৃতির দিকে ফিরিয়া বলিলেন—

'জগন্নাথে আবিষ্ট ইহার তনু-মন-প্রাণ।
মোর কান্ধে পদ দিয়াছে, তাহো নাহি জ্ঞান॥
অহো! ভাগ্যবতী এই! বন্দোঁ ইহার পায়।
ইহার প্রসাদে ঐছে আর্তি আমারো বা হয়।'

বলিতে বলিতেই আর্তিতে বিদীর্ণ হইতে লাগিল প্রাণ—বলিলেন, 'হায় জগন্নাথ, হায় শ্যামসুন্দর! তোমার দর্শন-লালসায় কবে এই ভক্তিমতী নারীর মতো আমার তীব্র আর্তি হইবে প্রভু? কবে আমি এই রমণীর মতো বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া তোমার শ্রীমুখপঙ্কজের রূপসুধা পান করিব, হে নাথ।'

বলিতে বলিতে, কাঁদিতে কাঁদিতেই প্রভুর আবেশ ছুটিয়া গেল ; এতক্ষণ যেন বৃন্দাবনের কোন মাধবীকুঞ্জে শ্যামসুন্দরকে দর্শন করিতেছিলেন, এখন চাহিয়া দেখেন—বলরাম-সুভদ্রাসহ সম্মুখে জগন্নাথ বিরাজমান, মুহূর্তে মন বিষণ্ণ হইয়া

* স্নেহসূচক গালি।

উঠিল—এ তো বৃন্দাবন নহে, এ যে কুরুক্ষেত্র। এখানে কোথায় 'গোপবেশ বেণুকর, নবকিশোর নটবর?' এখানে যে দেখি—অশ্ব-হস্তী, রথ-রাজবেশ, রাজৈশ্বর্যের ছড়াছড়ি! হায় হায়! আর কি বৃন্দাবনের কুঞ্জে কুঞ্জে শ্যামসুন্দরের মোহন-বাঁশরী 'রাধা রাধা' বলিয়া বাজিয়া উঠিবে না,—'রজনী শাওন ঘন, ঘন দেয়া গরজন রিমঝিম'-মন্দ্রিত বরষায় আব কি নীল নিচোলে হেমতনুখানি আবৃত করিয়া শ্রীমতী অভিসারে যাইবেন না?'

রাধারস-জারিত-তনুমন প্রভু ভূমিতলে উন্মত্তের ন্যায় বসিয়া পড়িলেন—

ভূমিব উপবে বসি, নিজনখে ভূমি লেখে।
অশ্রুগঙ্গা নেত্রে বহে, কিছু নাহি দেখে।
'পাইলুঁ বৃন্দাবননাথ, পুনঃ হাবাইলুঁ।
কে মোর নিলেক কৃষ্ণ, কোথা মুঞি আইলুঁ?'
স্বপ্নাবেশে প্রেমে প্রভুর গরগর মন
বাহ্য হইলে হয় যেন হারাইল ধন॥ —চৈঃ চঃ

রায় রামানন্দ, স্বরূপের কণ্ঠ ধরিয়া প্রভু কাঁদিতে লাগিলেন—

প্রাপ্ত কৃষ্ণ হারাইয়া তাঁর গুণ সঙরিয়া
মহাপ্রভু সন্তাপে বিহ্বল।
রায়-স্বরূপের কণ্ঠ ধরি, কহে, হা হা হরি হরি,
ধৈর্য গেল হইল চপল। —চৈঃ চঃ

যিনি স্রষ্টা তিনিই সৃষ্টি—আবার তিনি তদতিরিক্ত, যিনি রূপকার তিনিই রূপ—আবার অরূপ, অবিচিন্ত্য এই ভেদাভেদ-তত্ত্ব, এই পুরুষোত্তমের লীলা দুরবগাহ, মনবুদ্ধির অগোচর এই অমূর্ত ব্রহ্মের মূর্ত প্রকাশ।

মহাপ্রভু জীবনশিল্পী; কত কঠিন পাষাণসম জীবনে আনিয়াছেন সুষমা ও সৌকুমার্য, কত বিচিত্র বর্ণে ও রেখায় অঙ্কিত করিয়াছেন এক-একটি চিত্র, কত কথায় আর কত সুরে রচনা করিয়াছেন একটি অখণ্ড সঙ্গীত; সেই সঙ্গীত ধরণীর সীমা লঙ্ঘন করিয়া চলিয়াছে অসীম অনন্তলোকে, কাহার যেন চরণ ছুঁইবার আশায়! যিনি সাধক, যিনি রসবেত্তা—তিনিই অন্তরে এই শিল্প ও সঙ্গীতের রস উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

পথিক বাহির হইয়াছেন পথে, সম্মুখে দিগন্তবিস্তারী বহু পথরেখা, কিন্তু সমস্ত পথই দুর্গম! মহাজনেরা বিভিন্ন পথের নির্দেশ রাখিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সমস্ত নিশানাই অবশেষে পথিককে লইয়া যাইতেছে এক লক্ষ্যে—একই তীর্থমন্দিরে।

মহাপ্রভু-প্রদর্শিত পথের মাঝে মাঝেই ছায়াশীতল পান্থশালা—সেই পান্থশালায় বিশ্রাম করিয়া পথিক চলিয়াছেন চিন্ময় ব্রজধামের পানে, চির-প্রেমের তীর্থে।

ফুল্ল-কুসুমিত বৃন্দাবন আজ শারদ-পূর্ণিমার গলিত-শুভ্ররজতধারায় প্লাবিত, বাতাস সুগন্ধবহ, প্রকৃতি পুলকিত!

ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥ —শ্রীমদ্ভাঃ ১০।২৯।১

ষড়ৈশ্বর্য-যুক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণও শরৎকালীন বিকশিত মল্লিকা-পুষ্পে সুশোভিত রজনী অবলোকন করিয়া যোগমায়া অবলম্বনে (যেহেতু তিনি আত্মক্রীড়, আত্মারাম) গোপীগণের নিকটে প্রতিশ্রুত ক্রীড়া করিতে মনস্থ করিলেন।

দৃষ্ট্বা কুমুদ্বন্তমখণ্ডমণ্ডলং
রমাননাভং নবকুঙ্কুমারুণম্।
বনঞ্চ তৎকোমলগোভিঃ রঞ্জিতং
জগৌ কলং বামদৃশাং মনোহরম্॥ —ভাঃ ১০।২৯।৩

—নবকুঙ্কুমের ন্যায় অরুণবর্ণ, অখণ্ডমণ্ডল, কুমুদবিকাশশীল রমানন-সদৃশ চন্দ্রকে দর্শন করিয়া এবং তাহার কোমল কিরণে সুরঞ্জিত বনস্থলী দর্শন করিয়া তিনি সুনয়নাগণের মনোহর অব্যক্ত মধুর গান করিয়াছিলেন—পক্ষান্তরে জগৎ-চিত্ত আকর্ষণকারী বীজ 'ক্লীং' উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

পরমকর্ষক শ্রীকৃষ্ণের সেই গীত শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণগৃহীতমানসা পরম-সৌভাগ্যশালিনী, পরমপ্রেমিকা ব্রজগোপীগণ প্রত্যেকে স্বতন্ত্রভাবে শ্রীকৃষ্ণের নিকট দ্রুত আগমন করিতে লাগিলেন। গৃহকর্মরতা কোন গোপী অসমাপ্ত গৃহকর্ম ফেলিয়া রাখিয়াই ছুটিয়া চলিলেন; পতি বা গুরুজনের সেবানিরতা কোন গোপবধূ কর্তব্য ত্যাগ করিয়াই চলিলেন পরমপতির উদ্দেশে; প্রসাধনরতা কোন গোপী চরণের নূপুর মণিবন্ধে ধারণ করিয়া অধীর চরণে ছুটিয়া চলিলেন অজানিত পথে। বহু-প্রতীক্ষিত রজনী আজ যদি আসিয়াই থাকে, শুভলগ্নের যদি উদয় হইয়াই থাকে, আজ তবে আর কিসের বাধা, কিসেরই বা বন্ধন?

কানের ভিতর দিয়া বাঁশরীর সুর মরমে প্রবেশ করিয়া প্রাণ আকুল করিলেও যে গোপী গৃহ হইতে বাহির হইতে পারিলেন না, পতি কর্তৃক অবরুদ্ধ হইলেন, নিরুপায় কৃষ্ণগতচিত্তা সেই গোপী নয়ন নিমীলিত করিয়া কৃষ্ণের ধ্যান করিতে লাগিলেন।

দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহতীব্রতাপধুতাশুভাঃ।
ধ্যানপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষনির্বৃত্যা ক্ষীণমঙ্গলাঃ॥ —ভাঃ ১০।২৯।১০

—প্রিয়তমের দুঃসহ বিরহতাপে সেই গোপীর সমুদয় অশুভ বিনষ্ট হইল এবং ধ্যানযোগে শ্রীকৃষ্ণের আলিঙ্গন প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দের উদয়ে তাঁহার সমস্ত পুণ্যও ক্ষীণ হইল এবং কৃষ্ণগতচিত্তা হইয়া ধ্যানে সেই পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া গোপী 'জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ' (ভাঃ ১০।২৯।১১)—সহজেই এই 'গুণময়' দেহ পরিত্যাগ করিয়া চিন্ময় দেহে কৃষ্ণ-সঙ্গে চিরমিলিতা হইলেন।

সমাগতা গোপীগণকে নিরীক্ষণ করিয়া বাগ্‌বিদগ্ধ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি গোপীগণের কোন্ প্রিয়কার্য সাধন করিতে পারেন?

গোপীগণের কুশল, ব্রজের কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিয়া বৃন্দাবনের শোভা-সৌন্দর্যের কথা বলিয়া কিছুক্ষণ পরেই পরম-আকাঙ্ক্ষিত মিলনলগ্নের প্রথম অভ্যুদয়েই গোপীজন-মনোহর শ্রীকৃষ্ণ নিষ্ঠুর বাক্যে গোপীগণকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। আর্যধর্ম, গৃহধর্ম, পতিসেবা প্রভৃতির সারবত্তা প্রদর্শন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ যখন গোপীগণকে গৃহে ফিরিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ, তথা আদেশ করিতে লাগিলেন, তখন অপরিসীম বেদনা ও বিস্ময়ে গোপীগণের চিত্ত বিচালত হইয়া উঠিল, অনাথার মতো ভূমিতলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া স্তম্ভিত মূর্ছিতপ্রায় গোপীগণ দাঁড়াইয়া রহিলেন।

আজ বৃন্দাবনে প্রিয়তমের বাঁশরী বাজিয়াছে, যে ধ্বনি শুনিবার আশায় কত মধুযামিনীর অতন্দ্র প্রহরগুলি বৃথাই কাটিয়া গিয়াছে, পল পল গণিয়া দিবস হইয়াছে, দিবস গণিতে গণিতে মাস, মাস গণিতে গণিতে বৎসর পার হইয়া গিয়াছে, তবুও যমুনাপুলিনে বাঁশরী বাজে নাই, আজ যদি সেই ঘর-ছাড়ানো বাঁশী বাজিয়া প্রাণ আকুল করিলই, তবে আবার সেই ঘরে ফিরিব কেমন করিয়া? অশ্রুসজল নয়নে গোপীগণ বলিলেন, 'ওগো নিষ্ঠুর দয়িত! যে স্রোতোধারা আপন উৎসমুখ ত্যাগ করিয়া দুর্বার বেগে ছুটিয়া আসিয়াছে সাগরসঙ্গমে, সে আবার কেমন করিয়া ফিরিয়া যাইবে গিরিগুহার বন্ধনে, তাহার উৎসমুখে?

তোমার এই বংশীধ্বনি তো শুধু আমাদেরই আকর্ষণ করিয়া আনে নাই। তুমি কি দেখিতে পাও না, এই ধ্বনি শুনিয়া আজ 'দরবহি দারু মুঞ্জরে নবপল্লব, যমুনা বহত উজান,' কঠিন শিলা দ্রব হইয়া সুধাধারা নির্গত হইতেছে, শুষ্ক তরু মঞ্জরিত হইতেছে, যমুনা উজান বহিতেছে, কৃষ্ণসার মৃগের বক্ষ ত্যাগ করিয়া মৃগী তোমার মুখকমল দর্শনের আশায় ছুটিয়া আসিতেছে, বৃক্ষরাজি পুলকাবলী ধারণ করিয়াছে, তাহাদের রোমাঞ্চিত দেহ হইতে মধুক্ষরণ হইতেছে, আকাশ বাতাস আজ মধুময়, মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।

বাঁশীর সুরে অপহৃতচিত্তা, মুগ্ধা, বিবশা আমাদিগকে আহ্বান করিয়া আনিয়া এখন তুমি আমাদের প্রত্যাখ্যান করিতেছ ; হে কপট ! ইহাই কি তোমার ধর্ম ?

শুধু আমাদের ধর্ম-উপদেশ দিয়া তুমি আর কি করিবে ? তোমার এই বাঁশীর সুরে "কত কুল ছাড়ে কুলবতী, সতী ছাড়ে নিজ পতি" তাহা কি তুমি নিজেই জানো না ? তুমিই তো পতির পতি, পরমপতি, তোমাকে ছাড়িয়া আবার কোন্ পতির কাছে ফিরিয়া যাইবার জন্য তুমি আমাদের বলিতেছ ?'

ব্রহ্মবাদিনী জ্ঞানদীপ্তা মৈত্রেয়ী যেমন বলিয়াছিলেন, 'যেনাহং নামৃতা স্যাম্ কিমহং তেন কুর্যাম্', গৃহবাসিনী গ্রাম্য গোপললনাগণ গলদশ্রুনয়নে তাহাই জানাইতে চাহিলেন অন্তরের আকুল ভাষায় ! ব্রহ্মবিদ্যা তাঁহাদের হয়তো জানা ছিল না, কিন্তু অন্তরে ছিল সর্বস্ব-সমর্পণ-করা, সর্বগ্রাসী প্রেম। বৃন্দাবনের সেই অহৈতুকী নিষ্কাম প্রেমের সৌগন্ধে, মাধুর্যে আপনাকে হারাইয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণ, নির্গুণ নিরাসক্ত পূর্ণব্রহ্ম !

ব্রহ্মজ্ঞ ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য একদিন গভীর উদাত্ত স্বরে ব্রহ্মবাদিনী মৈত্রেয়ীকে উপদেশ দিয়াছিলেন—

'ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো
ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি।
ন বা অরে সর্বস্য কামায় সর্বং প্রিয়ং
ভবত্যাত্মনস্তু কামায় সর্বং প্রিয়ং ভবতি।
আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো
নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয্যাত্মনো বা অরে দর্শনেন
শ্রবণেন মত্যা বিজ্ঞানেনেদং সর্বং বিদিতম্।'

'— হে প্রিয়ে মৈত্রেয়ি, পতির জন্যই যে পতি প্রিয় হন, তাহা নহে ; আত্মার জন্যই পতি প্রিয় হন। সর্ব বস্তুর জন্যই যে সর্ব বস্তু প্রিয় হয়, তাহা নহে ; আত্মার জন্যই সর্ব বস্তু প্রিয় হয়।

অতএব হে মৈত্রেয়ি, আত্মাই দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য ও নিশ্চিতরূপে ধ্যেয় ; হে প্রিয়ে, শ্রবণ, মনন, ও নিদিধ্যাসনের দ্বারা আত্মার দর্শন হইলেই এই সমস্ত বিদিত হয়।'

দীর্ঘকালের মনন নিদিধ্যাসন ও বংশীধ্বনি শ্রবণ এবং সমস্ত মনপ্রাণ ভরিয়া কেবল শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান দ্বারা আজ গোপীগণও সেই 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' পরমাত্মার দর্শন লাভ করিলেন, তাই আর কুল, শীল, মান ও গৃহধর্মের কোন সার্থকতাই

তাঁহারা খুঁজিয়া পাইলেন না, পরমপতির সন্ধান পাইয়া আজ আর পতিনামধারী দেহসর্বস্ব মানুষের কোন প্রয়োজনই তাঁহাদের কাছে রহিল না।

ভক্ত-ভগবানের মিলন, কিন্তু তাহা কি এতই সহজলভ্য ? দুঃখের নিকষ কষ্টি-পাথরে সুবর্ণদ্যুতির পরীক্ষা না করিয়া জহুরী কি সহজেই সুবর্ণ গ্রহণ করেন ?

শুদ্ধ গোপীপ্রেমের মাধুর্যে শ্রীকৃষ্ণ আনন্দিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণ আপনার হ্লাদিনী শক্তির সঙ্গে সহর্ষে মিলিত হইলেন। অমৃতলোক হইতে সুরধ্বনি নামিয়া আসিয়া ব্রজের আকাশ-বাতাস পূর্ণ করিয়া তুলিল, গগনের চাঁদ আজ মর্ত্যের কোটি চাঁদের জ্যোৎস্নাধারায় আপনাকে হারাইয়া ফেলিল।

পরমানন্দে, মধুর সঙ্গীতধারায় বনস্থলী প্লাবিত করিয়া শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের সঙ্গে যখন ক্রীড়া করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহাদের মনে 'অহং'-এর উদয় হইল ; ভাবিলেন, জগতে নিশ্চয়ই আমরাই প্রেয়সীশ্রেষ্ঠা নতুবা বিশ্বপতি আমাদেরই পতিরূপে আমাদের সঙ্গে বিহার করিবেন কেন ?

আত্মা পরমাত্মায় মিলিত হইয়াছেন, তথাপি যেন এখনও আছে আমিত্বের একটু আভাস। ভগবান্ সহসা অন্তর্হিত হইলেন।

ভক্ত-ভগবানের লীলা, একজনকে বাদ দিলে অপর অসম্পূর্ণ। গোপীগণ ক্ষুব্ধ হইলেন, লজ্জিত হইলেন। এইবার আরম্ভ হইল 'আমি'র বিলোপ, 'তুমি'র অনুসন্ধান,—'কোথায় পরমগতি, কোথায় তুমি ব্রজনাথ! দর্শন দাও।'

বনে বনে, কুঞ্জে কুঞ্জে খুঁজিয়াও যখন কৃষ্ণের দর্শন মিলিল না, তখন উন্মাদিনী গোপীগণ 'পপ্রচ্ছুরাকাশবদন্তরং বহির্ভূতেষু সন্তং পুরুষং বনস্পতীন্' (ভাঃ ১০।৩০।৪), যিনি আকাশের ন্যায় সকল ভূতের অন্তরে বাহিরে বিরাজমান, বৃক্ষগণের নিকট, সেই পরমপুরুষের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন: 'হে অশ্বত্থ, হে অশোক, হে কুরুবক! যিনি সপ্রেম হাস্য এবং সবিলাস অবলোকন দ্বারা আমাদের মন হরণ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, তোমরা কি তাঁহাকে দেখিয়াছ ?'

বৃক্ষরাজি যখন গোপীগণের ব্যাকুল প্রশ্নের কোন উত্তর দিল না, তখন গোপীগণ ভাবিলেন, ইহারা পুরুষ-জাতি, সুতরাং কৃষ্ণপক্ষ, কাজেই ইহারা জানিয়াও হয়তো কিছুই বলিবে না, তাই আরও অধীর হইয়া নারী, পরম পবিত্রা তুলসীর কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

'হে তুলসি! হে কল্যাণি! হে গোবিন্দ-চরণপ্রিয়ে, যিনি ভ্রমরগণ সহ সর্বদা তোমাকে ধারণ করেন, যিনি তোমার অতিশয় প্রিয়, তুমি কি তাঁহাকে দর্শন করিয়াছ ?'

তুলসীও নির্বাক হইয়া রহিলেন। মল্লিকা, মালতী, যূথিকা কেহই যখন এই আকুল প্রশ্নের কোন জবাব দিলেন না, তখন গোপীগণ ভাবিলেন—ইহারা কৃষ্ণদাসী, কাজেই কিছুতেই প্রভুর কথা বলিবেন না। তখন পৃথিবী, লতা-গুল্ম, হরিণ-করিণী প্রভৃতি চেতন-অচেতন সমস্ত পদার্থকেই গোপীগণ কৃষ্ণের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, কিন্তু কেহই উত্তর দিল না।

এইবার গোপীদের চিত্তের ব্যাকুলতা এত তীব্র হইল এবং কৃষ্ণতন্ময়তা এত প্রগাঢ় হইল যে, গোপীগণ প্রত্যেকেই—

ইত্যুন্মত্তবচো গোপ্যঃ কৃষ্ণান্বেষণকাতরাঃ।
লীলা ভগবতস্তাস্তা হ্যনুচক্রুস্তদাত্মিকাঃ॥ —ভাঃ ১০।৩০।১৪

—এইপ্রকার উন্মত্তবৎ প্রলাপ করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণান্বেষণ নিমিত্ত এত ব্যাকুল হইলেন যে, তদাত্মিকা অর্থাৎ কৃষ্ণময় হইয়া শ্রীকৃষ্ণের লীলার অনুকরণ করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মজ্ঞ যেরূপ ব্রহ্মই হইয়া যান, পরম প্রেমবতী গোপীগণও সেইরূপ প্রেমাস্পদই হইয়া গেলেন—ধ্যান, ধ্যাতা, ধ্যেয়, রস ও রসিক একীভূত হইয়া গেলেন।

কতক্ষণ এই মহাপ্রেমসমাধির মধ্যেই কাটিয়া গেল, কিন্তু সুতীব্র বিরহ-ব্যথার দহনে আবার গোপীগণ ব্যুত্থিতা হইলেন, কিন্তু কৃষ্ণদর্শন মিলিল না। অধিকন্তু দেখিতে পাইলেন, একমাত্র যে গোপীকে সঙ্গে লইয়া শ্রীকৃষ্ণ গোপীগণের মধ্য হইতে গোপনে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, সেই গোপীও কৃষ্ণ কর্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া অধীর কণ্ঠে—

হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ কাসি কাসি মহাভুজ।
দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিম্॥ —ভাঃ ১০।৩০।৪০

—'হা নাথ, হা রমণ, হে মহাবাহো! কোথায় তুমি? হে সখে! আমি অতি দীনা, তোমার দাসী, তুমি দেখা দাও' বলিয়া অতি করুণ স্বরে রোদন করিতেছেন, তখন গোপীযূথও আর ধৈর্যধারণ করিতে পারিলেন না; সকলের আর্তক্রন্দনে ব্রজস্থলীও যেন অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। গোপীগণ সমস্বরে কৃষ্ণকে ডাকিতে লাগিলেন, 'হে দুঃখহর! হে ব্রজজন-আর্তিনাশন! তোমার বদন-কমলের রূপসুধা একবার এই কিঙ্করীদের পান করাও, আমাদের বিরহতপ্ত জীবনে তোমার কথামৃত দ্বারা আমাদের সিক্ত কর। হে নাথ! কেমন করিয়া তোমার বিরহ সহ্য করিব বলো?'

অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং
ত্রুটির্যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্।

কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে,

জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাম্॥ —ভাঃ ১০।৩১।১৫

—'হে নাথ, দিবসে যখন তুমি কাননে গমন কর, তখন তোমার অদর্শনে ক্ষণার্ধ-কালও যুগের ন্যায় প্রতীয়মান হয় এবং দিবাবসানে তুমি প্রত্যাগত হইলে তোমার কুঞ্চিতকুন্তলাবৃত শ্রীমুখ দর্শন করিতে চক্ষুর নিমেষমাত্র ব্যবধানও অসহ্য বোধ হওয়ায় চক্ষুর পক্ষ্ম-নির্মাণকারী বিধাতাপুরুষ মন্দ (অবিবেচক) বলিয়া আমাদের কাছে গণ্য হন,—কেন বিধাতাপুরুষ তোমার রূপদর্শনের জন্য কোটি নেত্র দিলেন না, দিলেন শুধু দুই নয়ন, তাহাতে আবার নিমেষ দিলেন কেন?

কোটি নেত্র নাহি দিল, সবে দিল দুই,
তাহাতে নিমেষ, কৃষ্ণ কি দেখিব মুঞি।

—'হে কৃষ্ণ, হে করুণাসিন্ধু, কৃপা কর; তোমাব অদর্শন আব সহ্য হইতেছে না প্রভু! তোমার অদর্শনকালের প্রতিটি নিমেষ যেন আমাদের কাছে যুগের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে, নাথ!'

ব্রজগোপীগণের বিরহের এই সুতীব্র আর্তিই আজ মহাপ্রভুর অন্তরে আসিয়া আঘাত করিল, তাই প্রভু কৃষ্ণের ক্ষণমাত্র বিরহে অধীর হইয়া প্রলাপ কহিতে লাগিলেন—

যুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুষা প্রাবৃষায়িতম্।
শূন্যায়িতং জগৎ সর্বং গোবিন্দবিরহেণ মে॥ —মহাপ্রভুকৃত সপ্তম শ্লোক

(শ্রীরাধা বলিলেন)—'গোবিন্দ-বিরহে আমাব এক নিমেষ-কাল এক যুগের মতো বিলম্বিত হইয়াছে, আমার নয়ন বর্ষাধারায় পূর্ণ হইয়াছে, সমস্ত জগৎ শূন্য বলিয়া বোধ হইতেছে।' কৃষ্ণবিরহ-কাতরা শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রভু নিজেকে রাধা, রায় রামানন্দকে বিশাখা ও স্বরূপ-দামোদরকে ললিতা ভাবিয়া কাঁদিতে লাগিলেন—

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর॥
ঝম্পি ঘন গর- জন্তি সন্ততি
ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন কাম দারুণ
সঘনে খর শর হন্তিয়া॥

... ...

তিমির ভরি ভরি ঘোর যামিনী
নথির বিজুরিক পাঁতিয়া।
বিদ্যাপতি কহে— কৈছে গোঁঙায়বি
হরি বিনে দিন রাতিয়া॥ —বিদ্যাপতি

—'ওরে সখি! কৃষ্ণ বিনা অ-ধন্য এ দিন-রজনী আমি কেমন করিয়া কাটাই বল্? আমার এ দুঃখের যে অবধি নাই! এই ভাদ্র মাসের ভরাবাদরে সঘনে মেঘগর্জন হইতেছে, ভুবন ভরিয়া গিয়াছে ঘন বরিষণে, এখন আমার প্রিয়তম কোথায়? আমার বিশ্বভুবন যে শূন্য হইয়া গিয়াছে সখি!

ঐ দেখ্, দিগন্ত ভরিয়া গিয়াছে ঘন কৃষ্ণমেঘে, অথির-বিজুলী চমকিত হইতেছে বারবার। হায় রে অভাগিনী! হায় রে বিরহিণী শ্রীমতি! এই ভরাবাদরে তুই হরি বিনা কেমন করিয়া তোর দিবস-যামিনী কাটাইবি বল্?'

প্রভুর বাহ্যদশা একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া গেল, ভক্তভাবও সম্পূর্ণ অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে, এখন ভিতরে-বাহিরে শুধুই শ্রীরাধার ভাব, শুধুই কৃষ্ণবিরহ।

এইবার রূপকার শ্রীমতী রাধারাণী, আপন অঙ্গকান্তি হইতে স্বর্ণদ্যুতি লইয়া বিলেপন করিয়াছেন নিকষ কৃষ্ণপাথরে, আপন অন্তরের ভাব দিয়া প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন বিগ্রহের প্রাণ, তাই কৃষ্ণ হইয়াছেন রাধারস-জারিত-তনুমন গৌর।

ইহাই মহাপ্রভুর তত্ত্ব!

প্রভুর অন্তরঙ্গ রায় রামানন্দ একদিন মাত্র ক্ষণিক চপলাদ্যুতির মতো দর্শন করিয়াছিলেন: 'রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ।' আর বুঝিয়াছিলেন স্বরূপ-দামোদর, তাই স্বকৃত কড়চায় লিখিয়া গিয়াছেন—

রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হ্লাদিনী শক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ং চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতিসুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥ —চৈঃ চঃ

—শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের প্রণয়বিকারস্বরূপ (কৃষ্ণপ্রেমের গাঢ়তম অবস্থা—মহাভাব-স্বরূপা) শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি, (শক্তি ও শক্তিমান্ অভেদ, তাই) তাঁহারা একাত্মা; কিন্তু একাত্মস্বরূপ হইয়াও (লীলামানসে) অনাদিকাল হইতেই তাঁহারা দুই দেহ ধারণ করিয়া আছেন। এক্ষণে সেই দুই দেহই একত্রে 'শ্রীচৈতন্য' নামে প্রকট হইয়াছেন। এই রাধাভাব-কান্তিযুক্ত কৃষ্ণ-স্বরূপ চৈতন্যকে আমি নমস্কার করি।

মহাপ্রভুর আবির্ভাবের বহু পূর্বেই মুষ্টিমেয় দুই-একজন সাধক ও দ্রষ্টার ধ্যাননেত্রে রাধাকৃষ্ণের এই প্রেমের স্বরূপ ধরা পড়িয়াছিল। নতুবা তৎকালীন ভারতে ঐশ্বর্য ব্যতীত মাধুর্যের ভজন প্রায় কোথাও ছিল না। ষড়ৈশ্বর্যময় শ্রীবিষ্ণুর শক্তিরূপিণী লক্ষ্মীর পূজাই অধিকাংশ বৈষ্ণবের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। তাহা ছাড়া শাক্ত, শৈব, বৈষ্ণব ও অদ্বৈতমার্গী সম্প্রদায়ের মধ্যেও নানা বিকৃতি ঢুকিয়াছিল। দক্ষিণ-ভারতে কতিপয় সিদ্ধ সাধক ছিলেন, তাঁহাদের 'আলোয়ার' বলা হইত। তাঁহারা ঈশ্বরকে প্রেমাস্পদ-রূপেই ভজনা করিতেন। পরমসাধক দাদু, তপস্বিনী মীরাবাঈ প্রভৃতি কয়েকজনও প্রিয়তম-রূপেই ভগবান্‌কে লাভ করিবার মানসে সংসার, সুখ সমস্তই বিসর্জন দিয়াছিলেন।

কিন্তু তথাপি ঠিক শ্রীমতীর ভজনের অনুরূপ তাহা ছিল না। তাঁহাদের কৃষ্ণরতি 'সমঞ্জসা', 'সমর্থা' নহে। কৃষ্ণের জন্য কুল-শীল-মান-লজ্জা-ধর্ম ত্যাগ করা, এমন কি দেহ পর্যন্ত দান করা এবং সর্বোপরি কৃষ্ণসুখেই সুখী হওয়, এই প্রেমে একমাত্র শ্রীমতীরই অধিকার, জগতে অপর কাহারও তাহা নাই।

অন্যের কি কথা, গোপীপ্রেমের অনুরূপ অহৈতুকী প্রেম স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেও ছিল না। রাসস্থলী হইতে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্ধানের পর গোপীগণ যখন ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতেছিলেন, তখন কৃষ্ণ তাঁহাদের সম্মুখে পুনরাবির্ভূত হইলে গোপীগণ তাঁহার বিন্দুমাত্র দোষও দর্শন করিলেন না। তাই কৃষ্ণদর্শন পাইয়া সজলনেত্রা গোপীগণ যখন পুলকিতাঙ্গী হইয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণ ধারণ করিয়া বিরহতাপ শীতল করিতে লাগিলেন, তখন যেন লজ্জিত হইয়াই শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের বলিলেন—

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মা ভজন্ দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥ —ভাঃ ১০।৩২।২২

হে সুন্দরীগণ, আমার সহিত যে তোমাদের এই প্রেম-সংযোগ, তাহা শুদ্ধ, নির্মল এবং তোমরা যে দুর্জয় গৃহশৃঙ্খল, ঐহিক পারত্রিক সুখকর লোক-ধর্ম ও মর্যাদা ছেদন করিয়া আমাকে ভজনা করিয়াছে, আমি অমরগণের আয়ু পাইলেও তোমাদের সাধুকৃত্যের প্রত্যুপকার করিতে সমর্থ হইব না, অতএব তোমাদের সাধুকৃত্যের দ্বারাই তাহার প্রত্যুপকার হোক।

সমগ্র বিশ্বের অধীশ্বর স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের ভাণ্ডারেও গোপীপ্রেমের অনুরূপ সম্পদের অভাব, তাই দীনাতিদীন হইয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন: 'হে গোপীগণ!

তোমাদের এই নিষ্কাম প্রেমের ঋণ আমি পরিশোধ করিতে পারিলাম না, তাই আমি তোমাদের কাছে ঋণী হইয়াই রহিলাম।'

রসিক ভক্তগণ বলেন, এই ঋণ শোধ করিবার মানসেই শ্রীকৃষ্ণ রাধার ভাব ও অঙ্গকান্তি লইয়া কলিযুগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-রূপে এই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কিন্তু যাঁহারা আরও গভীরের বার্তা জানেন তাঁহারা বলেন—

শ্রীরাধায়াঃ প্রণয়মহিমা কীদৃশো বানয়ৈবা-
স্বাদ্যো যেনাদ্ভুতমধুরিমা কীদৃশো বা মদীয়ঃ।
সৌখ্যং চাস্যা মদনুভবতঃ কীদৃশং বেতি লোভা-
ত্তদ্ভাবাঢ্যঃ সমজনি শচীগর্ভসিন্ধৌ হরীন্দুঃ॥ —চৈঃ চঃ

—শ্রীরাধার প্রেমের মহিমা কিরূপ, ঐ প্রেমের দ্বারা শ্রীমতী আমার যে মাধুর্য আস্বাদন করেন, তাহাই বা কিরূপ এবং ঐ মাধুর্য আস্বাদন করিয়া শ্রীমতী যে আনন্দ ও সুখলাভ করেন, তাহাই বা কিরূপ, এই সমস্ত বিষয়ে লুব্ধ হইয়াই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র (রাধাভাব-কান্তি অঙ্গীকার করিয়া) শচীগর্ভ-সিন্ধুতে আবির্ভূত হইয়াছেন।

পরমসাধক, মহাকবি চণ্ডীদাস ধ্যানে যেন এইরূপ দর্শন করিয়াছিলেন, তাই গাহিয়াছেন—

আজু কে গো মুরলী বাজায়,
এতো কভু নহে শ্যামরায়।
ইহার গৌরবরণে করে আলো,
চূড়াটি বাঁধিয়া কেবা দিল?

* * *

চণ্ডীদাস মনে মনে হাসে,
এরূপ হইবে কোন্ দেশে?

ইহাই যেন গৌর-আবির্ভাবের সূচনা, কবির ধ্যানলব্ধ অস্ফুট ইঙ্গিত।

শ্রীমতীর প্রেমের মহিমা চণ্ডীদাস যেমন আপন অন্তরে উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন, তেমনই ধন্য হইয়াছিলেন লীলাশুক (বিল্বমঙ্গল), কবি জয়দেব ও মিথিলার কবি বিদ্যাপতি। তাঁহারাই যেন শ্রীমতীর নির্বাচিত পাত্র, গৌর-অবতারের আবির্ভাবের ক্ষেত্র তাঁহারাই প্রস্তুত করিয়া গিয়াছিলেন।

মহাপ্রভু দিব্যোন্মাদ অবস্থায় চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির পদাবলী, গীতগোবিন্দ ও কৃষ্ণকর্ণামৃতের শ্লোকই শুধু শ্রবণ করিতেন এবং আনন্দ পাইতেন। তাঁহার

ভাবানুযায়ী পদ নির্বাচন করিয়া সুকণ্ঠ স্বরূপদামোদর সঙ্গীত করিতেন এবং রায় রামানন্দ মধুর স্বরে আবৃত্তি করিতেন।

ব্রজে ছিল পূর্বরাগ, অনুরাগ, অভিসার, মিলন, মান, দান ও ক্ষণক-বিরহ। কিন্তু ব্রজের মাত্র কয়েকটি সুখের দিবস-রজনী মুহূর্তেই বিলীন হইয়া গেল, ঘনঘোর কুজ্ঝটিকায় আবৃত হইয়া গেল সমস্ত আনন্দ। কৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া গেলেন, স্তব্ধ হইয়া গেল মিলন-গীতি, রচিত হইল জগতের চরমতম বেদনার অশ্রুভারাক্রান্ত, বক্ষ-বিদীর্ণকারী মাথুর কাব্য।

মাধব! তুঁহু রহলি মধুপুর।
ব্রজপুর আকুল দুকুল কলরব,
কানু কানু কহি ঝুর!

—হে মাধব; হে ব্রজের জীবনধন! তুমি মথুরায় চলিয়া গিয়াছ, তোমার অদর্শনে আজ ব্রজপুর আকুল, সমস্ত কথাই আজ ব্রজে স্তব্ধ, কেবল 'কানু কানু' বলিয়াই অশ্রু ঝরিতেছে সকলের চোখে।

যশোমতী নন্দ, অন্ধসম বৈঠত,
সাহসে উঠই না পার;
সখাগণ বেণু, ধেনু সব ছোড়ল
ছোড়ল নগর-বাজার।
কুসুম ত্যজিয়া অলি ক্ষিতিতলে লুঠই,
তরুগণ মলিন সমান,
শারী-শুক পিক-ময়ূরী না নাচত
কোকিলা না করত গান।
বিরহিণী-বিরহ কি কহব মাধব,
দশদিশি বিরহ হুতাশ,
সহজ যমুনাজল হোয়ল অধিক ভেল
কহতহি গোবিন্দদাস। —গোবিন্দদাস

—আজ নয়নানন্দ গোবিন্দকে নয়ন আর দেখিতে পাইবে না, তাই মা যশোমতী আর পিতা নন্দ অন্ধসম হইয়া বসিয়া আছেন, সখাগণ বেণুরব করে না, গোষ্ঠে যায় না।

আজ ম্লান তরুগুলিতে আর ফুল ফোটে না, ভ্রমর কুসুম ত্যাগ করিয়া ধুলায় লুটাইতেছে, শারী শুক পিক আর গান গাহে না, ময়ূরী আর নাচে না।

আর বিরহিণী শ্রীমতীর সে নিদারুণ বিরহ-যন্ত্রণার কথা কেমন করিয়া বলিব, মাধব ? তাহার বিরহতাপে আজ দশদিশি দগ্ধ হইয়া যাইতেছে, সমস্ত দিক শূন্যময়, যেন মরুতৃষায় হাহাকার করিতেছে, কেবল যমুনার জলই বাড়িয়া গিয়াছে শুধু ব্রজবাসীর নয়নজলে !

এই যে বিরহের আর্তি, ইহাই মহাপ্রভুর আস্বাদ্য, ইহাই জগতে মহাপ্রভুর দান। অনাদিকাল হইতেই জীব কৃষ্ণ-বহির্মুখ, সে তাহার এই বিচ্ছেদের কথা জানে না, যদি জন্ম-জন্মান্তরের পরম সুকৃতিবলে গুরুকৃষ্ণপ্রসাদে জীবের চিত্তে এই বিরহের বিন্দুমাত্র স্ফুরণও হয়, তখনই জীব ভগবানের জন্য ব্যাকুল হয় এবং অন্ধতমসাবৃত স্বরূপকে জানার ব্যগ্র আকাঙ্ক্ষায় তখনই জীব প্রার্থনা করে—'অসতো মা সদ্গময়, তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যোর্মা অমৃতং গময় ।'

তখনই জীব প্রাণের প্রাণ প্রাণারামের সঙ্গে আত্যন্তিক মিলনের জন্য উন্মাদ হইয়া উঠে। জীবের কাম্যই এই বিরহের অনুভূতি এবং সাধনও ইহাই।

শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী এই বিরহের একবিন্দু অনুভব করিয়াই সারাজীবন কৃষ্ণান্বেষণে কাটাইয়াছেন, শ্রীমতীর গভীর দুঃখের অনুভূতিতে তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইত। শ্রীমতীর ভাবেই তাঁহার চিত্ত ভরিয়া থাকিত, তাই তিনিও মেঘদর্শন করিলেই কৃষ্ণজ্ঞানে অচেতন হইতেন।

মাধবেন্দ্রপুরীর কথা অকথ্য কথন,
মেঘ দরশন মাত্রে হন অচেতন।

সারাজীবন দিয়াও তিনি শ্রীমতীর বিরহ-দহন শীতল করিতে পারিলেন না, তাই অন্তিমকালে ধূলিতলে লুটাইয়া আর্তরবে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন—

অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে
মথুরানাথ কদাবলোক্যসে ?
হৃদয়ং ত্বদালোককাতরং
দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্।

—হে দীনদয়ার্দ্রনাথ, হে মথুরানাথ (আর তো তুমি ব্রজনাথ নও), তোমার দর্শন-লালসায় আমি বনে বনে ঘুরিতেছি, কবে তোমার দর্শন পাইব প্রভু ? ওগো ! তোমার অদর্শনে আমার অন্তর বিদীর্ণ হইতেছে, বলো—আমি কি করিব ?

দিব্যোন্মাদ অবস্থায় অন্যান্য পদাবলী ও শ্লোকের সঙ্গে এই শ্লোকও প্রভু আস্বাদন করিতেন। গম্ভীরার ভিতরে বিরহের অসহ্য দহনে যখন মহাপ্রভুর

বাহ্যজ্ঞান সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া যাইত, সমস্ত দেহে কদম্বকেশরের ন্যায় পুলকাবলী প্রকাশ পাইত, দন্ত হেলিয়া যাইত, প্রতি লোমকূপ হইতে রুধিরধারা প্রবাহিত হইত, হস্তপদাদি কখন দীর্ঘাকৃতি, কখন বা কূর্মাকৃতি হইয়া যেন শরীরের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া যাইত, জীবনের কোনও লক্ষণ, চেতনার এতটুকু সাড়া যখন থাকিত না, তখন সেই অসহ্য যন্ত্রণার সাক্ষী থাকিতেন মাত্র দুই তিন জন অন্তরঙ্গ।

অন্তরঙ্গ সনে করে রস আস্বাদন,
বহিরঙ্গ সনে করে নাম সংকীর্তন।

অসহ্য দুঃখের রাত্রি আর যেন প্রভাত হইতে চাহিত না, কানের কাছে অশ্রু-বিজড়িত কণ্ঠে কৃষ্ণনাম করিতেন রায় রামানন্দ আর স্বরূপদামোদর,—ব্রজের দুই ঘনিষ্ঠ সখী, ললিতা ও বিশাখা,—আর শ্রীমতীর ভাবে আবিষ্ট প্রভু অন্তর্লোকে পরমমিলনানন্দে পরমসমাধিরসে ডুবিয়া থাকিতেন।

বাহ্যে বিষজ্বালা হয়, অন্তরে আনন্দময়
কৃষ্ণপ্রেমের অদ্ভুত চরিত।

—হয়তো বা রাধারানীর অপরিমেয় ঋণভার এইভাবেই পরিশোধ করিতেন অন্তকৃষ্ণ বহির্গৌর!

হা হা সখি! কি করি উপায়,
কাঁহা করোঁ কাঁহা যাঙ, কাঁহা গেলে কৃষ্ণ পাঙ
কৃষ্ণ বিনু প্রাণ মোর যায়। —চৈঃ চঃ

ক্রন্দন করিতে করিতেই সহসা প্রভুর এক উপায়ের কথা মনে হইল—

দেখি এই উপায়ে কৃষ্ণের আশা ছাড়ি দিয়ে,
আশা ছাড়িলে সুখী হয় মন।
ছাড় কৃষ্ণকথা অধন্য, কহ অন্য কথা ধন্য
যাতে কৃষ্ণের হয় বিস্মরণ॥ —চৈঃ চঃ

কিন্তু কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতেই পুনরায় কৃষ্ণস্মৃতি উদিত হইল, তখনই 'কৃষ্ণকর্ণামৃতে'র শ্লোক পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন—

কিমিহ কৃণুমঃ কস্য ব্রুমঃ কৃতং কৃতমাশয়া
কথয়ত কথামন্যাং ধন্যামহো হৃদয়েশয়ঃ
মধুর মধুরস্মেরাকারে মনোনয়নোৎসবে
কৃপণকৃপণাকৃষ্ণে তৃষ্ণা চিরং বত লম্বতে।

—আমি এখন কি করিব ? কাহাকেই বা বলিব ? শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার আশা করাও বৃথা। অধন্য কৃষ্ণকথা ছাড়িয়া অন্য ভাল কথা বলো। হায়, হায়! যাঁহাকে ছাড়িব বলিয়া মনে করিতেছি, তিনি যে আমার হৃদয়ে শয়ন করিয়া আছেন, মধুর ঈষৎহাস্যযুক্ত যাঁহার আকার, যিনি মন ও নয়নের আনন্দদায়ক, সেই শ্রীকৃষ্ণে আমার উৎকণ্ঠার নিমিত্ত অতি দীনা তৃষ্ণা চিরকাল বর্ধিত হইতেছে।

'যাঁহাকে কিছুতেই হৃদয় হইতে সরাইতে পারা যায় না, অন্তর-বাহির যিনি পূর্ণ করিয়া আছেন, সখি! কেমন করিয়া তাঁহাকে ভুলিব বলো? সখি, যমুনার ঘাটে গিয়া কবে একদিন ঐ মোহন রূপ দর্শন করিয়াছিলাম, সেইদিন হইতে আমি যে আমার সমস্ত দেহ-মন-প্রাণ তিল-তুলসী দিয়া তাঁহার চরণে সমর্পণ করিয়াছি। তখন তো পরিণামের কথা চিন্তা করি নাই!

অল্প বয়স মোর, শ্যামরসে ভর ভব
কি জানি কি হবে পরিণামে,
(আমি) যদি নয়ন মুদে থাকি,
অন্তরে গোবিন্দ দেখি
নয়ন মেলিয়া দেখি শ্যামে!

* * *

কহি সখি তব আগে, দাগা পেলাম শ্যামদাগে,
এ ছার জীবনের নাহি দায়
আমি তিলতুলসী দিয়া সমর্পণ করিনু হিয়া
জনমের মতো রাঙ্গা পায়। —পদাবলী, যদুনন্দন দাস

যিনি ছিলেন আমার অন্তরের অন্তরতম, আজ কে তাঁহাকে বাহির করিল?

তোমায় হিয়ার ভিতর হইতে
কে কৈল বাহির?
তেঞি বলরামের পঁহু! চিত নহে থির। —বলরাম দাস

ছিলে হিয়ার রতন, আসিলে বাহিরে—পাতিলে ভুবনমোহন রূপের ফাঁদ। সেই রূপের ফাঁদে কাহার নয়ন-বিহঙ্গই না ধরা পড়িতে চায়?

কি রূপ হেরিনু মধুর মুরতি
পিরীতি-রসের সার।
আমার হেন লয় মনে, এ তিন ভুবনে
তুলনা নাহিক যার

বড়ি বিনোদিয়া চূড়ায় টালনি—
কপালে চন্দন চাঁদ,
জিনি বিধুবর বদন সুন্দর
ভুবনমোহন ফাঁদ। —পদাবলী, দ্বিজ ভীম

সেই ভুবনমোহন রূপের জন্য আমার নয়ন কাঁদে, হিয়ার ধনকে হিয়ার ভিতরে লুকাইয়া রাখিবার জন্য আমার হিয়া ব্যাকুল!

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পিরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥ —পদাবলী, জ্ঞানদাস

সখি! তোরা আমায় বৃথা গঞ্জনা দিস,—রাই! তুই ঐ রূপ দেখলি কেন, দেখেই বা মজলি কেন? কিন্তু সখি, যে কৃষ্ণরূপ দেখে নাই, কৃষ্ণগুণে যার মন মজে নাই, তার জন্মই তো বিফল সখি।

বংশীগানামৃত ধাম, লাবণ্যামৃত জন্মস্থান,
যে না হেরে সে চাঁদবদন,
সে নয়নে কিবা কাজ, পড়ু তার মুণ্ডে বাজ,
সে নয়ন রহে কি কারণ?
কৃষ্ণের মধুরবাণী অমৃতের তরঙ্গিণী
তার প্রবেশ নাহি যে শ্রবণে,
কাণাকড়ি ছিদ্রসম জানিহ সেই শ্রবণ
তার জন্ম হৈল অকারণে।
মৃগমদনীলোৎপল মিলনে সে পরিমল,
যেই হরে তার গর্ব মান,
হেন কৃষ্ণ-অঙ্গ-গন্ধ যার নাহি সে সম্বন্ধ
সেই নাশা ভস্ত্রার* সমান।
কৃষ্ণের অধরামৃত কৃষ্ণগুণরচরিত
সুধাসার স্বাদুবিনিন্দন,
তার স্বাদু যে না জানে, জন্মিয়া না মৈল কেনে,
সে রসনা ভেক-জিহ্বা সম।

* কামারের হাপর।

কৃষ্ণ-কর-পদতল কোটি-চন্দ্র শশীতল
তার স্পর্শ যেন স্পর্শমণি,
সে পরশ নাহি যার সে যাউক ছারখার,
সেই বপু লৌহ সম জানি। —চৈঃ চঃ

—সখি! আমার হতবিধিবল শুন, আমার দেহ-মন-চিত্ত কৃষ্ণকে না পাইয়া সমস্তই বিফল। তোরা আমার এই দুঃখ কেমন করিয়া বুঝিবি, কেই বা কাহার দুঃখ বুঝিতে পারে? আমি তো আনন্দ-লাভের জন্যই কৃষ্ণভজন করিয়াছিলাম—

সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয়-সায়রে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল॥ —চণ্ডীদাস

—আমার ভাগ্যে যখন সুধাই গরল হইয়া গেল, আমার কর্মে যখন এই লেখা ছিল, তখন তোরা আর কি করিবি সখি! শুধু দয়া করিয়া আমাকে আর ধৈর্য ধরিতে বলিস্ না, আর সেই নিষ্ঠুরকে ভুলিতে বলিস্ না। তাঁহাকে যদি ভুলি, তবে কি লইয়া কাটাইব বল? ঐ বিরহের জ্বালাই যে আজ আমার একমাত্র সম্বল! ঐ সম্বলটুকু নিয়া তোরা আমায় মরিতে দে।

সখি, তোরা কাঁদছিস কেন? আজ মরণই তো আমার একমাত্র বন্ধু, আমার শ্যাম-সমান।

প্রাণাধিকারে সখি! কাহে তোয়া রোয়সি
মরিলে করবি ইহ কাজে,
নীরে নাহি ডারবি, অনলে নাহি দাহবি
রাখবি তনু ইহ বরজ মাঝে। —শশিশেখর

—আমার অন্তিমকালের এই মিনতিটুকু তোরা রাখিস সখি! আমার মৃত্যু হলে আমার এই শ্যামময় তনু তোরা যমুনার জলে ভাসিয়ে দিস না, অনলে দাহ করিস না—আমায় তোরা ব্রজ-ছাড়া করিস না, ব্রজের রজে যেন আমার এ দেহাবশেষও মিশে যায়, এই আমার কামনা।

আর এক মিনতি, শোন্ সখি, তোরা আমার মরণকালে—আমার সর্ব অঙ্গে কৃষ্ণনাম লিখে দিস, আর আমার কর্ণে কৃষ্ণনাম জপ করিস, তবেই আমার সার্থক মরণ হবে। শেষ কথা আর একটি বলে যাই। তোরা বলিস—কৃষ্ণ পরনারীর

প্রতি আসক্ত হয়েছেন, তাই আমায় ত্যাগ করেছেন, এখন আমি কেন কৃষ্ণের জন্য প্রাণ ত্যাগ করি?

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মাম্
অদর্শনান্মর্মাহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥ —অষ্টম শ্লোক

—শ্রীরাধা কহিলেন, 'সখি! শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার পদদাসী আমাকে আলিঙ্গন দ্বারা বক্ষে নিষ্পেষিতই করুন অথবা দর্শন না দিয়া আমাকে মর্মাহতই করুন অথবা সেই বহুবল্লভ যেখানে-সেখানে (অন্য গোপীর সহিত) বিহারই করুন, তিনি যাহাই করুন না কেন, তিনিই আমার প্রাণনাথ, প্রাণনাথ ব্যতীত অপর কেহ নহেন। কখন আমার সৌভাগ্য প্রকট করিবার জন্য তিনি অন্য গোপীকে দুঃখ দিয়া আমার সঙ্গে মিলিত হন, কখন বা আমাকে মর্মপীড়া দিবার জন্য আমার সম্মুখেই অন্য রমণীর সঙ্গে মিলিত হন, কিন্তু তাহাতে আমি তো দুঃখ পাই না। কৃষ্ণসুখেই আমি সুখী—

না গণি আপন দুঃখ সবে বাঞ্ছি তাঁর সুখ,
তাঁর সুখে আমার তাৎপর্য।
মোরে যদি দিলে দুখ তাঁর হৈল মহাসুখ,
সেই দুখ মোর সুখবর্য।
যে নারীকে বাঞ্ছে কৃষ্ণ, তার রূপে সতৃষ্ণ
তারে না পাঞা কাহে হয় দুঃখী?
মুঞি তার পায়ে পড়ি লঞা যাঙ হাথে ধরি
ক্রীড়া করাঞা করো তারে সুখী। —চৈঃ চঃ

—যে নারীকে কৃষ্ণ বাঞ্ছা করেন, আমি তাঁহার পায়ে ধরিয়াও কৃষ্ণসঙ্গে মিলিতা করিব। যে রমণী আমার প্রতি দ্বেষ পোষণ করিয়াও কৃষ্ণের সেবা ও সন্তোষ বিধান করেন—

মুঞি তার ঘরে যাঞা তারে সেবোঁ দাসী হঞা
তবে মোর সুখের উল্লাস। —চৈঃ চঃ

আমি 'আমার দেহ-মন-প্রাণ সমস্তই কৃষ্ণে সমর্পণ করিয়াছি, আমার বলিতে তো কিছুই রাখি নাই—

তোমারি গরবে গরবিণী হাম
রূপসী তোমার রূপে।

—বঁধুর গরবে আমি গরবিণী, বঁধুর রূপেই যে আমি রূপসী! আমার কৃষ্ণ ছাড়া কিছু নাই, কেহ নাই।

অন্যের আছয়ে অনেক জন।
আমার কেবল তুমি? —বিদ্যাপতি

—কৃষ্ণই আমার জীবন, কৃষ্ণ-সেবাই আমার ধ্যান, কৃষ্ণ-সুখে আমার সুখ। কৃষ্ণ সুখী হন বলিয়াই আমার এই দেহের মার্জন, ভূষণ; ইহা যে আমার পরম প্রিয়তমের অধিষ্ঠান-মন্দির, ইহাতে আমার তো কোন অধিকার নাই!'

প্রভু রাধাভাবে সম্পূর্ণ আবিষ্ট হইয়া এই শ্লোক উচ্চারণ করিলেন। ইহার যে ভাব, তাহাই ব্রজপ্রেম—শুদ্ধ, অকৈতব, নিষ্কাম ভালবাসা।

ব্রজের বিশুদ্ধ প্রেম যেন জাম্বুনদ হেম
আত্মসুখের তাহে নাহি গন্ধ,
সে প্রেম জানাইতে লোকে প্রভু কৈল এই শ্লোকে
পদে কৈল অর্থের নিবন্ধ। —চৈঃ চঃ

দ্বাদশ বৎসর ব্যাপিয়া নীলাচলে কাশীমিশ্রের রুদ্ধদ্বার-ভবনে ক্ষুদ্র গম্ভীরা-প্রকোষ্ঠে শ্রীমন্মহাপ্রভু দিবারাত্রির অধিকাংশ সময়ই এইভাবে আবিষ্ট হইয়া থাকিতেন, দেহবোধ এতটুকুও থাকিত না। সেবক গোবিন্দ অতি কষ্টে কোনমতে স্নান করাইয়া, জোর করিয়া কোন দিন বা সামান্য কিছু আহার্য মুখে দিতে পারিতেন, কোন দিন তাহাও হইত না। নয়নে নিদ্রা ছিল না, ছিল শুধু অশ্রুধার! যখন অর্ধ-বাহ্য দশায় থাকিতেন, তখন এইরূপ দিব্যপ্রলাপ বলিতেন ও ভাবানুযায়ী পদ শুনিতেন অথবা দিব্যোন্মাদ-অবস্থায় তীব্র বিরহের আর্তিতে ভিত্তিগাত্রে মুখ ঘষিয়া, মাথা ঠুকিয়া ক্ষতবিক্ষত হইয়া যাইতেন, অঙ্গ হইতে রুধিরধারা ঝরিতে থাকিত, দেখিয়া অন্তরঙ্গগণের বক্ষ বিদীর্ণ হইয়া যাইত। আর যখন অন্তর্দশা হইত, তখন আর যে নয়ন মেলিবেন সে লক্ষণও থাকিত না, কত সন্তর্পণে, কত কৃষ্ণনাম-কীর্তনে দীর্ঘকাল পরে হয়তো বা চেতনা হইত, চেতনা হইলেই বিরহের আর্তিতে আবার কাঁদিতে থাকিতেন। কখন বা—

মূর্চ্ছায় হৈল সাক্ষাৎকার
উঠি করে হুহুঙ্কার
কহে, এই আইলা মহাশয়।

তখনই আবার শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণ-বর্ণনায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিতেন। রায় রামানন্দ রসিক, অন্তরঙ্গ ভক্ত; তাই সখীভাবে বলেন, 'শ্রীমতি! এই তোর ক্রোধ, এই

তোর হর্ষ। যে শঠ-চূড়ামণি তোকে এত দুঃখ দিতেন, যেই তিনি সম্মুখে আসিলেন, অমনি তুই সব ভুলিয়া গেলি। না না সখি। প্রেমের রীতি এমন-ধারা নয়, তুই প্রেমের মর্যাদা জানিস না।' রাধাভাবে ভাবিত প্রভু তখন আনন্দোদ্ভাসিত ফুল্ল-মুখে বলিয়া উঠেন, 'প্রেমের আমি কিছু জানি না ? শুনবি সে কথা ?—

সখি হে কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরিতি অনুরাগ বাখানিয়ে
অনুখন নৌতুন হোয়।
জনম অবধি হাম রূপ নেহারলু
নয়ন না তিরপিত ভেল।
সোই মধুর বোল শ্রবণ হি শুনলুঁ
শ্রুতিপথে পরশ না গেল!
কত মধুযামিনী রভসে গোঁয়ায়লুঁ
না বুঝলুঁ কৈছন কেলি।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ
তবু হিয়া জুড়ন না গেলি। —বিদ্যাপতি

—এই কৃষ্ণপ্রেম যে আমার পরশরতন সখি! এ যে তিলে তিলে নূতন হয়। জনম জনম ধরিয়া এই রূপে নয়ন লাগাইয়াই রাখিলাম, তবুও আমার নয়ন তৃপ্ত হইল না। ঐ মধুর বচন জনম ভরিয়া শুনিলাম, তবু কর্ণ যে আমার তৃষ্ণায় মরিয়া গেল ; লাখ লাখ যুগ ধরিয়া আমার হিয়ার মণিকোঠায় এই অরূপরতন আমি রাখিয়া দিলাম, তবু তো আমার হিয়া শীতল হইল না।'

বিরহের অতলস্পর্শ গভীরতার মধ্যে যখন কৃষ্ণদর্শন হইত, ভাবসম্মিলন হইত, তখন প্রভুর মুখ হইতে এইরূপ আনন্দোচ্ছ্বাস বাহির হইত।

বিচ্ছেদের মধ্যে মিলনের সুতীব্র আকাঙ্ক্ষা এত প্রগাঢ় হইত, কৃষ্ণভাবনা এত নিবিড় হইত যে, তখন শ্রীমতী কৃষ্ণে তাদাত্ম্য-প্রাপ্তা হইয়া নিজেই কৃষ্ণ হইয়া যাইতেন—

অনুখন মাধব মাধব সুমরইতে
সুন্দরী ভেলি মধাই।
ও নিজ ভাব স্বভাবহি বিসরল
আপন গুণ লুবধাই।

মাধব ! অপরূপ তোহারি সুলেহ,
আপন বিরহে আপন তনু জর জর
জীবইতে ভেলি সন্দেহ ।
রাধা সঞে যব পুন তহি মাধব,
মাধব সঞে যব রাধা,
দারুণ প্রেম তবহি নহি টুটত,
বাঢ়ত বিরহক বাধা । —বিদ্যাপতি

—অনুক্ষণ মাধব মাধব স্মরণ করিতে রহিতে শ্রীমতী নিজেই মাধব হইয়া গেলেন। রাধা নিজের নারীত্ব ভুলিয়া কৃষ্ণভাবে নিজেই নিজের গুণের প্রতি লুব্ধ হইয়া উঠিলেন।

মাধব! কি অপরূপ তোমার স্নেহ (প্রেম)! শ্রীমতী তোমার ভাবে ভাবিত হইয়া নিজের বিরহেই নিজে জর্জরিত হইয়া গেলেন। বিরহতাপে তাঁহার জীবনরক্ষাই অসম্ভব বোধ হইতে লাগিল।

শ্রীমতী যখন নিজেকে রাধাভাবে ভাবেন, তখন তাঁহার মনে হয় কৃষ্ণপ্রেমই পূর্ণ—আবার যখন কৃষ্ণভাবে ভাবিত থাকেন, তখন মনে হয় রাধাপ্রেমই পূর্ণ, অতএব প্রেমের ত্রুটি কখন হয় না, নিত্য যুগল-মিলনে বিরহেরও অবসর ঘটে না।

এই যে ভাবসম্মিলন, বিরহে মিলনের স্ফূর্তি অথবা মিলনে বিরহের স্ফূর্তি (দুঁহু কোরে দুঁহু কাঁদে বিচ্ছেদ ভরিয়া),—ইহা একমাত্র ভাবময়ী শ্রীমতীতেই সম্ভব। এই প্রেমবৈচিত্ত্য, ইহারই শেষ পরিণতি স্ত্রী-পুরুষের ভেদজ্ঞান-রাহিত্য ও নিবিড় একাত্মতা। প্রেমিক, প্রেম আর প্রেমাস্পদের ঐক্য—

'ন সো রমণ ন হাম রমণী।'

বিরহের গভীর অমানিশার মধ্যেও যখন মিলন-লগ্নের শুভ অভ্যুদয় হইত, তখন অন্তর্লোকের এই নিগূঢ় আনন্দের বার্তা প্রভুর দিব্য দেহে, স্মিত বদনে, অরুণিম নয়নে, শতধার অশ্রুর মধ্য দিয়া প্রকাশিত হইত, প্রভুর অন্তর্লোক হইতে তখন যেন শ্রীমতীই গাহিয়া উঠিতেন—

আজু রজনী হাম ভাগে পোহায়লুঁ
পেখলু পিয়া মুখ-চন্দা।
জীবন-যৌবন সফল করি মানলুঁ
দশদিশ ভেল নিরদ্বন্দা ॥

আজু মঝু গেহ গেহ করি মানলুঁ
আজু মঝু দেহ ভেল দেহা।
আজু বিহি মোহে অনুকূল হোয়ল ;
টুটল সবহুঁ সন্দেহা॥ —বিদ্যাপতি

'—সখি! আজ আমার সৌভাগ্যরজনীর উদয় হইয়াছে, ওরে! আজ আমি প্রিয়তমের মুখচন্দ্র দর্শন করিলাম। আজ আমার জীবন-যৌবন সফল, দশদিশি মধুময়, আর তো আজ আমার কোন দুঃখ, কোন দ্বন্দ্ব নাই। আজ আমার দেহ গেহ, সকলই সফল। আজ বিধাতা আমার প্রতি অনুকূল হইয়াছেন, আজ আর আমার কোন ব্যথা, কোন সংশয় নাই।'

শ্রীমন্মাহাপ্রভুর নির্দেশিত পথ আসিয়া মিশিয়া গিয়াছে ব্রজের এই বিরহমিলন যমুনাধারায় ; সে পথরেখা ধরিয়া চলিয়াছেন সুকৃতিমান্ পথিক, কে জানে কাহার উপরে বর্ষিত হইবে করুণাঘন গৌরসুন্দরের কৃপা? কাহার নিমজ্জন হইবে প্রেম-যমুনার গভীর কালো জলে?